বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
তালিকা সং ২৬০
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

কৃষি-তত্ত্ব।

(সচিত্র)

চতুর্থ খণ্ড।

"কৃষিধন্যা কৃষিমেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ।"

(১২৮৮ সালের মাঘ হইতে ১২৮৯ সালের পৌষ পর্য্যন্ত।)

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা
সম্পাদিত।

শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
কর্ত্তৃক

পাইকপাড়া নর্শরি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৮ নং হোগলকুঁড়িয়া গলি এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস রায় দ্বারা মুদ্রিত।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ভিক্টোরিয়া পদ্ম (Victorea Regea)	...	১০১
কৃষি ও বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ কি ?	...	১০২
আসাম জাত রবর	...	১০৭
লতী চালিতা	...	১১০
ভারতবর্ষে চার 'চাষ	...	১১২
নারিকেল বৃক্ষের উপকারিতা	...	১১৭
আম্রে কীট	...	১২০।১৫০
লবঙ্গ-বৃক্ষ	...	১২১
কৃষিকার্য্যের উন্নতি।	...	১২৫
ফুল ও ফল এবং শস্যাদি উন্নতি করিবার উপায়		১২৯।১৯৭।২১০
দুলাল চাঁপা	...	১৪২
কলার আদর	...	১৪৫
বাতাবী লেবুর কলম	...	১৫৩।১৬১
হার্টস্-ইজ্-পুষ্প (Hearts Ease)	...	১৫৭
ভারতবাসীর দরিদ্রতা	...	১৬৫
সেলারি (Celery)	...	১৭২
গেই-লার্ডিয়া (Gaillardia)	...	১৮১
কুলিবেগুণের চাষ	...	১৮৮
আদর্শ কৃষক	...	১৯৩
বাণিজ্য ও কৃষি	...	২০১
ময়দা	...	২০৫
দারুচিনি-বৃক্ষ (Cinnamon tree)	...	২১৫
কুনখুরা সূতা	...	২১৯
ভূমির উৎপাদিকাশক্তি হ্রাসের কারণ কি ?	...	২২৫
তামাক	...	২৩৩
ডায়ন্থস্ (Dianthus)	...	২৩৭

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
ব্রহ্মদেশীয় কৃষিজাত স্বর্ণ	...	১
ব্লুমস্‌ডেল ড্রম হেড কপি (Bloomsdale Early Drumhead Cabbage.)	...	৫
চোক কলম (Budding)	...	৭।২৩০
জেড়ুয়া ফুল (Season Flower)	...	১৫
জিনিয়া এলিগেন্স (Zinia elegans)	...	১৮
চাষ চাষার কাজ	...	২১
দেরাদুন লাউ	...	২৬
পল লিরণ গোলাপ	...	৩০
ধান্য চাষের পক্ষে বৃষ্টির জল কিরূপ প্রয়োজনীয়		৩৩
আমেরিকান লঙ্কা	...	৩৯
বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা এবং কৃষিবিদ্যা.		৪১
নাগেশ্বর পুষ্প	...	৪৫
য়্যাষ্টার (Aster)	...	৪৯
আম্রে পোকা লাগার ঔষধ	...	৫৪
অফলন্ত নারিকেল গাছ	...	৫৭
জাম	...	৬১
জামরুল (Jambasa Alba)	...	৬৫
কার্পাস	...	৬৮
ক্যাসো পমকিন (Cashaw Pumpking)	...	৭৭
মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ	...	৮১
টবে চারা রোপণের নিয়ম	...	৯২।১৭০
স্কোয়াস (Squash)	...	৯৮

শ্রীভবানীনাথ গুপ্ত

৪র্থ খণ্ড।] কলিকাতা। [১ম সংখ্যা।

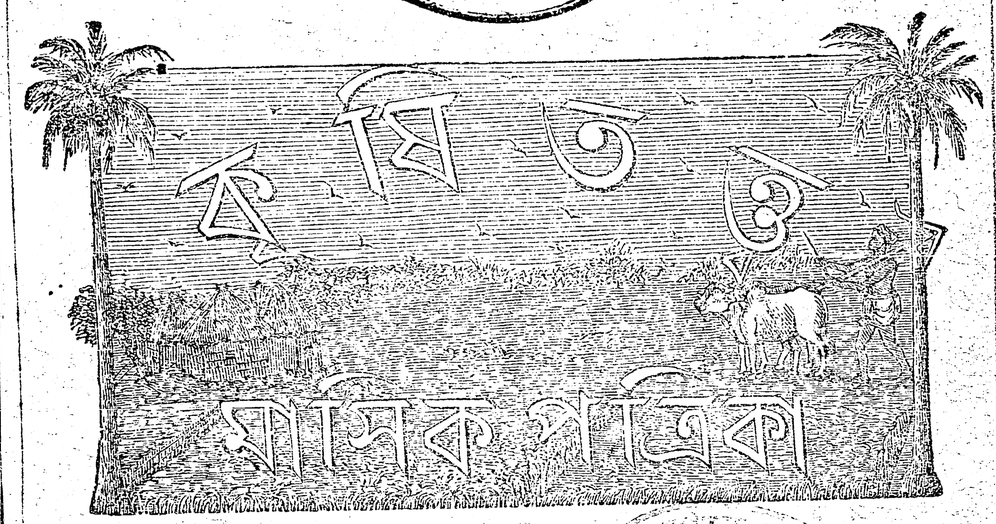

ব্রহ্মদেশীয় কৃষিজাত স্বর্ণ।

স্বর্ণ খনিজ পদার্থ। আকর হইতে স্বর্ণ উত্থিত হয়, ইহা চির প্রসিদ্ধ বাক্য। পদার্থতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা রসায়ণ প্রক্রিয়া বলে অঙ্গার হইতে হীরক, প্লাটিনম ধাতুর ক্ষার হইতে লৌহ, দস্তা ও সোরার মিশ্রণে রূপার আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু বোধ করি কোন কৃত্রিম উপায়ে এ পর্য্যন্ত কেহই বিশুদ্ধ স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ভারতবর্ষীয় অলঙ্কার-প্রিয় পূর্ব্বতন প্রাজ্ঞ কবিগণ অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী নরপতিদিগের উদ্যানস্থ তরু-রাজির স্বাভাবিক শোভা বর্ণনা করিবার সময়ে প্রায়ই প্রত্যেক "তরুর পত্রে পত্রে প্রবাল মণি, শাখায় শাখায় মুক্তার মালা, স্কন্ধদেশে অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড এবং শীর্ষ প্রদেশে সুবর্ণ স্তম্ভ" বিন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রাজ্ঞ কবিগণের কাব্য-সুধা পান করিতে করিতে প্রায়ই

এরূপ বর্ণনার জন্য তাঁহাদের জীবন্ত কল্পনা প্রতিভার প্রশংসা করিয়া থাকি, কিন্তু বর্ণনার সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হই। এখন দেখিতেছি, আর্য্য কবিগণের বর্ণনা নিতান্ত অলীক নহে!! ব্রহ্মদেশীয় কৃষকবৃন্দ ভারতীয় কবির মান রক্ষা করিয়াছেন!!

মহামতি বেদব্যাস বিরচিত মহাকাব্য মহাভারত পাঠকালে আমরা দেখিতে পাই যে, পাণ্ডবদিগের গোধন অনুসন্ধান করিবার জন্য যখন সুশর্মা শেখর বণ্ডিলারণ্যে প্রেরিত হয়েন, তখন সহদেব বলিয়াছিলেন যে "বৎস! প্রথমে তুমি অশেষ শোভাশালী বিহট্ট জনপদ অতিক্রম করিয়া নিমি অরণ্যে উপস্থিত হইবে। তথায় কেতু শেখর গুহার মধ্য দিয়া ধারব নগরে উপস্থিত হইলে মহামল্লের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এই মহামল্ল ঋষভ প্রদেশের অধিপতি। ঋষভ প্রদেশ ধরাধামে অতি মনোহর জনপদ। তথায় প্রত্যেক তরু লতা পর্য্যন্ত সুবর্ণ বর্ষণ করে। এদেশের ঐশ্বর্য্য পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতম জনপদের ঐশ্বর্য্যকে পরাস্ত করিয়াছে" * বাল্মিকীমুণি প্রণীত রামায়ণ পাঠে দেখা যায় যখন পতিব্রতা সীতার অনুসন্ধান জন্য হনুমানগণ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইয়াছেন সেই সময়ে সুগ্রীব প্রভৃতি নায়কগণ তাঁহাদিগকে বিদেশ গমনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবার ছলে অন্যতম দূতকে এমন একটি জনপদের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, "যথায় প্রবৃদ্ধ-মুণি শিষ্যগণ কষায় তরুর স্কন্ধদেশ হইতে সুবর্ণ রাশি উত্থান করিত এবং প্রবল বন্যা উপস্থিত হইলে ঐ সকল সুবর্ণরাশি শ্বেতাক্ষী নদীর স্রোতে রেণুরূপে ভাসিয়া যাইত।" এ সকল বাস্তবিক কবি-কল্পনা অথবা ইহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, কে বলিতে পারে? যদি এ সকল বর্ণনায় প্রবৃদ্ধ আর্য্য-পণ্ডিতগণ কোন সত্য নিহিত করিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বীকার হইবে পুরাকালে ভারতবর্ষে দ্রব্যগুণ বলে কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত হইত। যাহা হউক, সম্প্রতি ইংলণ্ডস্থ সেণ্ট্ জেমস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গেজেটে ব্রহ্মদেশীয় কৃষকগণ কর্ত্তৃক সুবর্ণ প্রস্তুত করণের যেরূপ ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতীব কৌতুকাবহ এবং সম্পূর্ণ নবীন। আমরা মূল সেণ্ট্ জেম্স্

* ৺ কালি প্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত দেখ।

গেজেটস্থ প্রবন্ধ পাঠ করি নাই, কিন্তু আলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান হেরাল্ড নামক প্রাত্যাহিক সংবাদ পত্রে ঐ উদ্ধৃত প্রবন্ধ আনুপূর্ব্বিক পাঠ করিয়াছি। ইণ্ডিয়ান্ হেরাল্ডের গ্রাহকেরা গত নবেম্বর মাসের ৩৫৬ সংখ্যায় বোধ করি ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকিবেন। "কৃষি-তত্ত্বের" পাঠক ও গ্রাহকদিগের কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সারাংশ গ্রহণ করিয়া এস্থলে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অতি পুরাকাল হইতে ব্রহ্মদেশ কৃষিকার্য্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এক সময়ে এখানকার ধনাঢ্য ব্যবসায়ীগণ পৃথিবীর অতি দূর প্রান্তস্থিত সভ্য জনপদ সমূহেও প্রচুর শস্য বিক্রয় করিয়া দেশীয় বাণিজ্য এবং জাতীয় মূলধনের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিল। পণ্ডিতপ্রবর হারিশন্ সাহেব অনুমান করেন, প্রচলিত শস্য বৃক্ষব্যতীত, কেবল পরীক্ষার (Experiment) জন্য ব্রহ্মদেশে ৫৭ সহস্র নূতন নূতন বৃক্ষের আবাদ হইয়া থাকে। কৃষি-বিদ্যায় যে জাতির কৌতূহল এতদূর প্রশস্ত, সে জাতি যে প্রকৃত ধনী এবং সুখী, তাহাতে সন্দেহ কি? তাহারা কৃষিবিদ্যার আলোচনা করিয়া গত তিনশত বৎসরের মধ্যে দেশের অবস্থা বিশেষ রূপে উন্নত করিয়া লইয়াছে। ব্রহ্মদেশের আচার্য্যদিগের নাম শায়া এবং তাঁহাদের প্রণীত জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম শেদা। সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হইলে অধিবাসীগণ শায়াকে আহ্বান করে এবং শাদা গ্রন্থের মতে মাসের মধ্যে যে দিনের তিথি সুফল-প্রসূ বলিয়া অনুমিত বা গণিত হয়, সেই দিনে সুবর্ণ প্রস্তুতের উদ্যোগের সূত্রপাত হইতে থাকে। বৎসরের মধ্যে ৬ বারের অধিক সুবর্ণ প্রস্তুত হয় না; দেশের রাজা প্রস্তুত-স্বর্ণের দ্বাদশাংশের এক ভাগ পাইয়া থাকেন। যিনি ষষ্ঠবারের অধিক স্বর্ণ প্রস্তুত করেন কিম্বা রাজাকে অংশ দিতে অসম্মত হয়েন অথবা রাজার অংশে স্বর্ণ কম দেন, তাঁহার আর রক্ষা নাই!! দেশশুদ্ধ লোক অনুরোধ করিলেও তাঁহার প্রাণ-দণ্ড অনিবার্য্য। বর্ণি সাহেব বলেন, এই সুবর্ণের জন্য সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৩।৪ শত লোকের প্রাণদণ্ড হয়। শতকরা প্রায়

৩,৫ (তিন দশমিক পাঁচ) লোক এই কৃত্রিম সুবর্ণ প্রস্তুত করিতে জানে। দেখা যাউক, ব্রহ্মদেশবাসীরা কি প্রকারে সুবর্ণ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

'কৈয়ক হো' নামক শৈল শ্রেণী মধ্যে তি নামক একটী বহুপ্রাচীন মন্দির আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই মন্দির প্রথম শাক্যসিংহের সমকালীন। এই মন্দিরের পার্শ্বস্থিত স্থানে শা জ্ঞা পী (Sâyhjnââ Péh) নামক লতা এবং জ্ঞাপী নামক তরু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। লতাগুলি অন্ গা পী মৎস্যের ন্যায়। বসন্তকালের প্রারম্ভে পরিশ্রমী কৃষকগণ এই লতা ও তরু চ্ছেদন করিয়া গৃহে আনে। বলা বাহুল্য, কৈয়ক হো পর্ব্বতারণ্য অতি ভয়ানক স্থান। যাহা হউক, লতাগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রকাণ্ড টবের মধ্যে জল মিশ্রিত করিয়া প্রায় ২১ দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। পাছে কোন কীট বা পতঙ্গ আসে, এজন্য উপরিভাগ শুভ্রবর্ণের পাতলা কাপড় আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। বৃক্ষগুলির পাতা ফেলিয়া দিয়া, কেবল মাত্র গুঁড়ীটি গ্রহণ করিতে হয়, ঐ গুঁড়ি শত সহস্র খণ্ডে কর্ত্তিত হইয়া প্রভূত মদিরাপূর্ণ প্রকাণ্ড লৌহ কলস মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এগুলিও ২১ দিন ভিজিতে থাকে। ঐ মদিরার নাম 'আয়ৎ হি খি।'

আর একটী পাত্রে 'জ্ঞা খুহুমা' নামক মৎস্য (আনুমানিক ৩৫ সের) পরিষ্কার তিলের তৈলের সহিত ৫ সের লৌহ চূর্ণ, ৫ ছটাক 'ইয়া ক্ষী' ধাতু চূর্ণ, ২ সের তামা, ২ সের সীসক এবং ১১ সের পারদ মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন রাখিতে হইবে। তদন্তর সমুদায় পাত্রের দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২১ দিন পরে কোন নদীমাতৃক ভূমির নিম্নে আনুমানিক ২।৩ হস্ত গভীর করিয়া প্রোথিত করিতে হইবে। এই স্থানে এগুলি ২১ দিন থাকিবে।

কৈয়ক হো শৈলে তরু লতা কাটিতে যাইবার পূর্ব্বে, কোন জমিতে বিৎ হি শিন্ নামক বৃক্ষের আবাদ করিতে হইবে। নদী মাতৃক ভূমিতে উপরিবর্ণিত পাত্রস্থিত পদার্থ প্রোথিত করিবার সময়ে এই বৃক্ষের রস প্রচুর পরিমাণে ঐ ভূমির উপরে এবং চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ২১ দিন পরে প্রোথিত পদার্থ তুলিয়া লইলে দেখা যায় যে উহার আকার

ঠিক্ আকর হইতে উত্থিত অপরিষ্কৃত স্বর্ণের ন্যায় হইয়াছে। সমুদায় পদার্থ ওজন করিয়া যত হইবে তাহার দ্বাদশ ভাগের একভাগ পরিমাণে উহাতে গন্ধক মিশাইয়া দিবে। তাহার পরে উহা বৃহদাকার লৌহ কটাহে ফেলিয়া উত্তপ্ত করিতে থাকিবে। এইরূপে দুই দিন ক্রমাগত উত্তপ্ত হইবার পরে উহাতে প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল মিশাইয়া পুনরায় আর একদিন উত্তপ্ত করিবে। দুই দিনের পরে দেখিবে যে, স্বর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে এই প্রকারে সুবর্ণ প্রস্তুত করিবার প্রথা সর্ব্ব প্রথমে (প্রায় দুইশত বৎসর হইল) হি থি আইহি নামক ধনবান কৃষক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহাঁর বংশধরগণ এক্ষণে স্বর্ণ প্রস্তুতকারীগণের গুরু বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

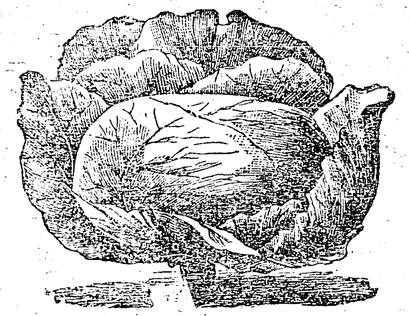

ব্লুমস্‌ডেল ড্রমহেড কপি।

(Bloomsdale Early Drumhead cabbage.)

কপি নানা জাতীয়; তন্মধ্যে বাঁধা ফুল ও ওল এই তিন জাতি প্রধান। বাঁধা কপি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এদেশে যে সকল কপির চাষ হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে ব্লুমস্‌ডেল ড্রম হেড এক প্রকার বাঁধা কপি। কপির তিন অংশ খাদ্যে ব্যবহার হয়, মূল, পত্র ও ফুল; ওল কপির মূল,

বাঁধা প্রভৃতি কপির পত্র এবং ফুল কপির কেবল মাত্র ফুল ব্যবহার হইয়া থাকে। বাঁধা কপির মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে বুমস্ ডেল বাঁধা জাতীয় কপি। ইহার পত্র ব্যবহার করিতে হয়। বাঁধা কপির মধ্যে কাহার কি নাম তাহা অনেকে অবগত নহেন। এজন্য এই প্রবন্ধের শিরো-দেশে বুমস্‌ডেল ড্রমহেড কপির চিত্র প্রকাশিত হইল। বুমস্‌ডেল্ আবার দুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায় আর্লি (Early) ড্রমহেড অর্থাৎ শীঘ্র হইবার, আর বুমস্‌ডেল লার্জ লেট ফ্লাট ডচ্ (Bloomsdel Large Late Flut Duch) অর্থাৎ এই জাতীয় কপি কিছু বিলম্বে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জল, বায়ু ও মৃত্তিকার দোষ এবং চাষ প্রণালীর অনিয়ম বশতঃ কপির আকার ছোট বড় হইয়া থাকে। এজন্য এক বীজ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আবাদ করিয়া সকল স্থানে এক আকারের কপি হইতে দেখা যায় না। কিজন্য ফসল ভাল হয় না, অনেকেই তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অসমর্থ হইয়া বীজের দোষ দিয়া থাকেন। আমরা এরূপ দেখিয়াছি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল কপিবীজ বপন করা গিয়াছে, তিন দিনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে, কিন্তু সেই বীজ আবার শীতের আধিক্য সময় বপন করিয়া ১০।১৫ এমন কি কুড়ি দিনে অঙ্কুরিত হইয়াছে। ফলতঃ উত্তম রূপ বীজ হইলেই যে কপি উৎকৃষ্ট হয় এরূপ নহে। কপির উন্নতি করিতে হইলে অগ্রে উহার চাষ প্রণালী শিক্ষা করা উচিত। কৃষিতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় কপি চাষের যেরূপ নিয়ম লিখিত হইয়াছে, বুমস্‌ডেল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন বাঁধা কপির পাতা সমূহ বাঁধিয়া দিতে হয়, বাস্তবিক তাহা নহে, গাছ যত বড় হইতে থাকে, সেই সঙ্গে পাতা সকল পরস্পর জড়িত হইয়া গোলাকার তাল বান্ধিয়া উঠে। এই তাল যত বড় ও শক্ত হয় ততই ভাল। কপির উপরিকার পাতা অপেক্ষা মধ্যবর্ত্তী তালের পাতা সাদা বর্ণের হয়। গোলাকার পত্র সমূহের মধ্যে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় বর্ণের এরূপ প্রভেদ হইতে দেখা যায়।

বুমস্‌ডেলের পক্ষে খৈলের সার অত্যন্ত উপকারী। কপি চাষের পক্ষে সার প্রদান ও জল সেচন এই দুইটীই প্রধান পাইট।

এদেশে সচরাচর পৌষ মাস হইতে বাঁধা কপি খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে। পৌষ ও মাঘ মাস পর্য্যন্ত বাঁধা কপি সুখাদ্য থাকে। তদন্তর রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে উহা তত সুস্বাদু বোধ হয়না। কপি শীত প্রধান দেশের উদ্ভিদ্ এজন্য এদেশে শীত কালেই চাষ হইয়া থাকে।

বুমস্‌ডেল ড্রমহেডের বীজ এদেশে জন্মে না, এজন্য প্রতি বৎসর আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং কেপ হইতে আসিয়া থাকে। যে কোন কপির চাষ করিতে হইলে অগ্রে ক্ষেত্রে সার দিয়া ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। অগ্রে মৃত্তিকা প্রস্তুত না হইলে উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিলেও কোন ফল হয় না।

চোক কলম।

(BUDDING.)

ভিন্ন ভিন্ন জাতি উদ্ভিদের প্রজনন শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এক নিয়মে সকল প্রকার উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয় না। বীজ, শাখা, পত্র, মূল (গেঁড়) প্রভৃতি বৃক্ষের বিভিন্ন অংশ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া বৃক্ষ ও লতাদি জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এক বৃক্ষের শাখা বা চোক অথবা ত্বচ অর্থাৎ ছাল অন্য বৃক্ষে সংযোগ করিয়াও অনেক প্রকার উদ্ভিদ্ উৎপাদন করার রীতি আছে। এই প্রণালী দ্বারা যে বৃক্ষাদি উৎপাদন করা হয়, তাহাকে কলম করা কহে। সকল জাতীয় উদ্ভিদে এক নিয়মে কলম হয় না, এজন্য উহাদিগের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ যে কএক প্রকার কলম বাঁধিবার উপায় প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ জনগণ তাহা অবগত হইলে অনায়াসেই নানা প্রকার ফুল ও ফলের বৃক্ষাদি উৎপাদন করিয়া সুখসচ্ছন্দে

কোন স্থানে হাপোর দিতে হয়। এই অবস্থায় মধ্যে মধ্যে এক একটু জল দিলে ভাল হয়। অন্যূন কুড়ি দিনের মধ্যে ঐ রোপিত ডালের গাঁইট হইতে অঙ্কুর নির্গত হইবে এবং মৃত্তিকাস্থ প্রোথিত অংশ হইতে শিকড় সঞ্চারিত হইয়া গাছ লাগিয়া যাইবে। অনন্তর কিছুদিন পরে ঐ গাছ হয়, এক একটী পৃথক পৃথক টবে কিম্বা অন্য স্থানে তুলিয়া পুঁতিতে হইবে। আগামী আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থায় থাকিলে আট দশ ফিট গাছ বড় হইয়া উঠিবে। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে উক্ত গাছের গোড়া তিন চারি অঙ্গুলি পরিমাণে রাখিয়া কাটিয়া দিতে হইবে। এই সময় কিছুদিন মধ্যে মধ্যে কাটা গাছের গোড়ায় জল সেচন এবং মূলের মৃত্তিকা সরু নিড়ানি দ্বারা খুসিয়া দিলে অল্প দিনের মধ্যেই এই কর্ত্তিত গাছ হইতে মোটা মোটা সরল তেজস্কর নূতন নূতন ডাল বাহির হইবে। অধিক ডাল বাহির হইলে তন্মধ্যে যেগুলি অত্যন্ত তেজস্কর এবং মোটা সেইগুলি রাখিয়া অবশিষ্ট ডাল বা ফেঁকড়ী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ডাল ভাঙ্গিয়া না দিলে বৃক্ষস্থ রস সকল ডালে গ্রহণ করিলে কোনটীই উপযুক্ত পুষ্টিকর হইতে পারে না। আর ডাল ভাঙ্গিয়া দিলে যে দুই একটী শাখা থাকে, তাহারা সমুদায় রস আকর্ষণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে বলবান ও পুরিপুষ্ট হইয়া উঠে। আমাদের শরীরস্থ রক্ত যেমন সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্ভিদ্‌গণ রস আকর্ষণ করিয়া শাখা প্রশাখা ও পল্লবাদিতে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এই রস গ্রহণ দ্বারা উদ্ভিদ্ জীবিত এবং শাখা পত্রাদি সতেজ থাকে। গাছের দুর্ব্বল শাখা ভাঙ্গিয়া দিলে যে কয়েকটী শাখা থাকে, তাহারা সমুদায় রস লইয়া অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। বলবান্ শাখা কলমের পক্ষে ভাল। চোক কলমের জন্য যে শাখা মনোনীত করিয়া রাখা হয় তাহা এক হাত পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে চোক কলমের উপযুক্ত হয়।

বৎসরের মধ্যে দুইবার চোক কলম করিবার প্রশস্ত সময়। প্রখর রৌদ্র, বর্ষা কিম্বা অত্যন্ত শীতের সময় চোক কলম করিলে উহা লাগে না প্রায় মরিয়া যায়। এজন্য অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে অথবা ফাল্গুন মাসের

শেষ পর্য্যন্ত এই দুই সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে চোক কলম করিলে কোন হানি হয় না। পৌষ ও মাঘ মাস কলমের পক্ষে অনুকূল নহে। যে কোন কার্য্যের এক একটী সময় নিরূপিত আছে, সেই নিরূপিত কালের মধ্যে তাহা সম্পন্ন করিলে যেমন ফল ভাল হইবে, অসময়ে তাহার অনুষ্ঠান করিলে কখনই তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না।

যোড় কিম্বা চোক যে কোন কলম করিবার সময় দেখা উচিত, যে দুইটী ডালের সহিত পরস্পর কলম বাঁধা হইবে তাহাদিগের আকারগত ও বয়সের কত তারতম্য। কারণ দুর্ব্বল ও সবলে, অল্প বয়স ও অধিক বয়স্ক ডালের কখনই সহজে মিলন হয় না। সমান অবস্থা ও সমান বয়স পরস্পর মিলনের উপযুক্ত স্থল। এজন্য এক বয়সের ডালের সহিত কলম করা কর্ত্তব্য।

এদেশে যে সকল গোলাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বিলাতী গোলাপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সকল গোলাপ দেখিতে যারপরনাই মনোহর, সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্যের জন্য লোকে উহাদিগকে কলম করিয়া থাকে। চোক ও যোড় কলমে যে সকল গাছ হইয়া থাকে, তাহাদিগের ফুলের আকার বড় এবং অত্যন্ত সুশ্রী হয়। যোড় কলম অপেক্ষা চোক কলমে একটী ডাল হইতে অনেকগুলি গাছ হইয়া থাকে; অর্থাৎ ডালের প্রত্যেক চোক হইতেই এক একটী স্বতন্ত্র গাছ হইতে পারে এবং অল্পদিনের মধ্যে ফুল ফুটিয়া থাকে। চোক কলম করিতে হইলে অন্য কোন গোলাপের চোক তুলিয়া জায়গেণ্টিয়ার ডালে বসাইতে হয়।

যে ডালের চোক তুলিতে হইবে চোক তুলিবার পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক সেই ডালের চোক কলম বসাইবার উপযুক্ত হইয়াছে কি না; কারণ সকল ডালের সকল চোক কলমের উপযুক্ত নহে, ডালের চোক কাহাকে কহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ডালের গা হইতে যে স্থানে পাতা বাহির হয় অর্থাৎ পত্রগ্রন্থির মূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোক বাহির হয়, তন্মধ্যে যে চোকটী ছালের উপর কিছু মাত্র বাহির হয় নাই, তাহা কলমের উপযুক্ত নহে, যেটী এক সূতা পরিমাণে প্রকাশ হইয়াছে,

তাহাও তত ভাল নহে, যে চোকটী আদ সূতা পরিমাণ মুসুরির ডালির ন্যায় একটু গোল ধরণে নির্গত হইয়াছে, তাহাই চোক কলমের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এইরূপ চোক বিশিষ্ট ডাল তীক্ষ্ণ ধারা অস্ত্র দ্বারা কর্ত্তন পূর্ব্বক ছায়াযুক্ত স্থানে বসিয়া তাহা হইতে চোক তুলিতে হইবে। চোক তুলিয়াই অন্য গাছের ডালে বসান উচিত। চোক তুলিয়াই যদি কলম করিতে বিলম্ব হয়, তবে অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা পরিষ্কার জলে উহা ভিজাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে। অধিকক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে চোক পচিয়া যাইবে, অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এজন্য যত শীঘ্র চোক বসান হয়, ততই ভাল।

চোক কলমে চোক তুলিয়া বসানই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, উহা এরূপ হিসাবে বসাইতে হইবে যেন গাছে অধিক আঘাত না লাগে। এজন্য ধারাল অস্ত্র ব্যবহার করা যুক্তি সিদ্ধ। অস্ত্র ব্যবহার দোষে অনেক সময় চোক নষ্ট হইয়া থাকে। যে ডালে চোক বসাইতে হইবে সেই ডালের ছাল, কি পরিমাণ পুরু তাহা পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লইতে হয়। তিনটী আঙ্গুল দিয়া ছুরির অগ্রভাগে এরূপ টিপিয়া ধরিতে হইবে, যে অস্ত্রের যে ভাগটুকু বাহির থাকিবে, অর্থাৎ ছালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তাহা যেন ছালের পুরু অপেক্ষা অধিক বাহির না হয়। ছাল যতটা পুরু অস্ত্রও যদি ঠিক ততটা ভেদ করিবার উপর্যক্ত আঙ্গুলের বাহিরে থাকে তাহা হইলে কাটে উহা প্রবিষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। কারণ আঙ্গুলের মাথায় অস্ত্র টিপিয়া ধরিলে এবং ছাল ভেদ পরিমাণ অস্ত্রের অগ্রভাগ বাহিরে থাকিলে, ডালে উহা বসাইলে ঠিক ছাল ভেদ করিয়া অস্ত্রের অগ্রভাগ থাকিবে। সুতরাং কাটে বা হাড়ে কোন আঘাত লাগিবার সম্ভবনা থাকিবে না। আর যদি অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা কাটের কিয়ৎ ভাগ চিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ উহা উল্টাই বাঁটের অগ্রভাগ দ্বারায় চিরা স্থান ঘসিয়া দিতে হইবে, কিছুক্ষণ এইরূপ ঘসিলে কাটের রসে উহা যোড় লাগিয়া যাইবে। বিলাতী বডিং নাইফ ব্যবহার করিবার কারণ এই যে উহা এই কার্য্যের পক্ষে যেমন উপযুক্ত আকারে নির্ম্মিত অন্য অস্ত্র সেরূপ নহে।

এই ছুরির বাঁট হাড় দ্বারায় প্রস্তুত এবং তাহাও আবার যেরূপ প্লেন চেপ্টা ভাবে গঠিত, যে তাহাতে এই সকল কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে।

চোক তুলিবার সময় যে স্থান হইতে উহা তুলিতে হইবে, তাহার কাঁটা ও পাতা অগ্রে কাটিয়া ফেলিবে, কারণ কাঁটা ও পাতা থাকিলে অস্ত্র চালনায় ও ডাল ধরিতে এবং ছুরি নাড়িতে বাধা লাগিতে পারে। অনন্তর যে চোকটী তুলিতে হইবে তাহার উপর ও নিম্নে আদ ইঞ্চি পরিমিত স্থান হইতে উহা এরূপ ভাবে কাটিয়া তুলিতে হইবে যে, চোকটী যেন ঠিক মধ্যস্থানে থাকে। চোক তুলিতে হইলে কেবল মাত্র যে ছাল কাটিয়া লইতে হইবে তাহা নহে; যে স্থানে চোক থাকে, তাহার নিম্নে কাষ্ঠের কিয়ৎ ভাগ অর্থাৎ সেই ডালের অর্দ্ধেক কাট কাটিয়া তুলিতে হইবে। চোকের আকারে উহা কাটা হয় এজন্যও উহাকে চোক কহে। এই চোক অর্থাৎ ছাল সমেত কাষ্ঠ কাটিয়াই পরিষ্কার জলে আন্দাজ পাঁচ ছয় মিনিট রাখিতে হইবে। জলে রাখিলে ছাল ও কাটের সংযোগ স্থলে জল প্রবেশ করিয়া তাহা নরম করিয়া দেয়। ছাল যেরূপ দৃঢ় আকারে কাষ্ঠ জড়াইয়া থাকে, তাহা শিথিল হইয়া যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঐ চোক জল হইতে তুলিয়া বাঁহাতে তিনটী আঙ্গুলের উপর চীৎ করিয়া ধরিতে হইবে, অর্থাৎ যেদিকে কাট থাকে সেই দিকটী যেন উপরে থাকে। এইরূপ ভাবে চোকটী ধরিয়া ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা চোকের মধ্যস্থ কাট টুকু তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যে ডাল হইতে চোক তুলিতে হইবে তাহাও জলে ফেলিবে এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে চোক ও ডাল উভয়ই জলে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ চোক হইতে কাট বাহির করিবার সময় ডালটী জলে রাখিতে হইবে এবং কাট তুলা হইলে সেই চোকটী জলে রাখিয়া আবার জল হইতে ডাল তুলিয়া তাহা হইতে চোক তুলিতে হইবে। এইরূপে ডাল হইতে সমুদায় চোক তোলা হইলে তাহা জায়গেণ্টিয়ার ডালে বসাইতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে ডাল হইতে চোক তোলা হইবে তাহার বয়ঃক্রম যে পরিমাণে সেই বয়সের ডালে চোক বসাইতে হয়। অতএব সেই বয়সের জায়গেণ্টিয়া ডাল ঠিক করিয়া লইয়া সেই ডালে যেস্থানে চোক

থাকে তাহা বাদ দিয়া চোকের কিছু নীচে লম্বভাবে চিরিতে হইবে অর্থাৎ যে চোকটী বসাইতে হইবে তাহা যেন চোকের উপর না বসে। এই চিরার সময় যেন কাটে অস্ত্রের অগ্রভাগ প্রবেশ না করে, যদি দৈবাৎ কিঞ্চিৎ চিরিয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত মত অস্ত্রের পশ্চাৎভাগ দিয়া তাহা ঘসিয়া দিতে হইবে। চোকের আকার যে পরিমাণে তাহা অপেক্ষা কিছু বড় করিয়া চিরা আবশ্যক। চিরা শেষ হইলে অস্ত্রের অগ্রভাগ দ্বারা চিরার উভয় মুখে বা পার্শ্বে ছাল উন্নত করিয়া তন্মধ্যে একটী চোক প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হয়। যে চোকটী বসাইতে হইবে তাহার পশ্চাৎ দিক অর্থাৎ যেদিকে কাট ছিল সেই দিকটা কাটের উপর থাকিবে। জায়গেণ্টিয়ার শাখাস্থ ছাল মধ্যে চোক প্রবিষ্ট হইলে সূতা দ্বারা সেই স্থানটী উত্তম করিয়া জড়াইয়া দিতে হইবে। যে গাছে চোক বসান হয় সেই গাছ যাহাতে তেজস্কর থাকে, তজ্জন্য তাহার মূলে সর্ব্বদা জল সেচন করিয়া তাহাকে বলবান রাখা আবশ্যক। মূল গাছের তেজ বৃদ্ধি হইলে শীঘ্র কলম লাগিয়া অঙ্কুর বাহির হয়। অঙ্কুর বাহির হইতে আরম্ভ হইলে ঐ সূতা আস্তে আস্তে খুলিয়া দেওয়া উচিত। কারণ বন্ধন মুক্ত হইলে অঙ্কুর সহজে নির্গত হইতে পারে, সূতা জড়ান থাকিলে উহা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হয়।

চোক বসাইতে হইলে আর একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক, জায়গেণ্টিয়ার যে ডালে চোক বসান হয়, উহা বসাইয়া সেই ডালের অগ্রভাগ কাটিয়া দেওয়া উচিত। কারণ ঐ ডাল কাটিয়া না দিলে ডালের অগ্রভাগ ও তদ্ সংযুক্ত পত্রাদি শাখাস্থ রস আকর্ষণ করিয়া হইলে চোক ফুটিয়া শীঘ্র অঙ্কুর নির্গত হইতে ও সেই অঙ্কুর তেজস্কর করিতে ব্যাঘাত জন্মে। এজন্য চোক বসাইয়া ডালের মাথা কাটিয়া দিতে হয়। আর সেই ডালে অন্যান্য যে সকল চোক হইতে অঙ্কুর বা ফেঁকড়ী নির্গত হইবে তদ্সমুদায় ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। ফলকথা বসান চোক হইতে যে অঙ্কুর বাহির হইবে, তাহা রাখিয়া আর ডাল কাটিয়া দিতে হইবে।

চোক বসান স্থান হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া শাখার আকারে পরিণত হইলে তাহাতে ফুলফুটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে একটী ডালে চারি

পাঁচ রকমের ভিন্ন ভিন্ন গোলাপের চোক বসাইলে তদ্সমুদায় স্থান হইতে যে সকল শাখা নির্গত হইবে, প্রত্যেক শাখায় পৃথক পৃথক ফুল ফুটিয়া গাছের যারপর নাই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বসান চোক সকল এরূপ ভাবে জায়গেণ্টিয়ার ডালের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায় যে তদুৎপন্ন শাখা পৃথক বোধ হয়। এইরূপ একটী গাছ হইতে নানা প্রকারের ফুল ফুটাইবার নিয়ম অবগত হইলে উদ্যানের অত্যন্ত শোভা হয়।

(ক্রমশঃ)

জেড়ুয়া ফুল।

(ANUAL OR SEASON FLOWER.)

ইহাদিগকে ঋতু পুষ্প কহে, কারণ উহারা বৎসরের সকল সময় প্রস্ফুটিত হয় না। কেবল মাত্র শীত ঋতুতে ফুটিয়া থাকে। শীত অতীত হইলে ফুল ফোটা বন্ধ হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গাছও মরিয়া যায়। এদেশে গাঁদা, দোপাটি, তরুলতা প্রভৃতি অনেক গাছ ও লতা এইরূপ এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া গাছ মরিয়া যায়। তবে ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন গাছ অত্যন্ত পাইট করিলে ও নিয়মিত রূপে জল দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া দুই একটী ফুলও ফুটিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা সময়ের ফুলের ন্যায় আকার বিশিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয় না। বেল ও মল্লিকা প্রভৃতি অধিকাংশ গাছের ফুল ফুটিবার নির্দ্দিষ্ট সময় আছে বটে, কিন্তু তদ্সমুদায়ের ফুল ফুটা শেষ হইলে গাছ মরিয়া যায় না।

শীতকালে এই সকল ফুল ফুটিয়া থাকে বলিয়া এদেশে সাধারণে উহাদিগকে জেড়ুয়া ফুল কহে। এই সকল ফুল দেখিতে যারপর নাই মনোহর। এক একটী ফুল দেখিলে মন বিমোহিত হয়, বিশ্বপতি পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্য প্রত্যেক ফুলের দলে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের গঠন প্রণালী, বর্ণের বিভিন্নতা ও সৌন্দর্য্য দেখিলে নিতান্ত যে পাষণ্ড তাহারও কঠিন হৃদয় ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোত ঈশ্বরের চরণের দিকে প্রবাহিত হয়। সংসার মধ্যে নির্ম্মল পবিত্র সৌন্দর্য্য ভাবের জীবন্ত দৃশ্য

পুষ্পে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা নির্ম্মল তাহা, সহজেই মানবমন আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এই জন্যই কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, সকলেরই চক্ষু পুষ্পের জন্য পিপাসিত। প্রস্ফুটিত পুষ্প দর্শন করিলে তাহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হয় এমন মনুষ্য প্রায় দেখা যায় না অশেষ সৌন্দর্য্যের আধার দয়ার সাগর জগদীশ্বর এই পবিত্র আনন্দজনক পুষ্প উপভোগ করিবার ক্ষমতা সকলকেই সমান অধিকার দিয়া অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক গৃহস্থই সামান্য যত্ন করিলে এই পবিত্র আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। আমাদের দেশে এক্ষণে পুষ্পের ভালরূপ আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে দেবার্চ্চনার নিমিত্ত সকল বাড়ীতে দুই একটি ফুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যাইত। ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখী তাহারও গৃহে অন্ততঃ দুই একটী ফুলের টব দেখিতে পাওয়া যায়। কি রাজা কি প্রজা কি পণ্ডিত কি মূর্খ চেষ্টা ও যত্ন করিলে সকলই এই আনন্দ লাভ করিতে পারেন। কিঞ্চিৎমাত্র শারীরিক পরিশ্রম করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

জেড়ুয়া বা মোরসমী ফুল যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন। এক এক জাতীয় ফুলের এক এক রকম আশ্চর্য্য গঠন, আশ্চর্য্য দল সাজান এবং আশ্চর্য্য বর্ণ। আমাদের এই বিশেষ অনুরোধ কৃষিতত্ত্বের পাঠকগণ এই সকল আশ্চর্য্য দর্শনীয় ফুলের রোপণ প্রণালী শিক্ষা করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রতি বৎসর উহা রোপণ করিবেন। সমস্ত দিবস কার্য্যক্ষেত্রে দগ্ধ হইয়া আসিয়া গৃহে মন সুস্থ করিবার কোন উপায় অবধারিত করা একটি প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। সাহেবদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেরূপ অবস্থার লোক হউক না কেন, স্ব স্ব গৃহে দুই একটি ফুলের গাছ সর্জ্জিত থাকে। সাংসারিক কার্য্যে যে সময় মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়, সেই সময় যদি প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যানে গমন করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় মনকষ্ট দূরে চলিয়া যায়। প্রকৃতি সতীর প্রফুল্ল মুখে নির্ম্মল হাসির ছটা দেখিলে কার না তাপিত প্রাণ শীতল হয়?

জেড়ুয়া ফুলের বীজ আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় ফুলের বীজ এদেশে ধরিলে তাহা হইতেও চারা হইয়া থাকে। এই সকল ফুলের গাছ করা কিছু কঠিন। অনেকে আদৌ গাছ বাহির করিতে পারে না। জেড়ুয়া ফুলের গাছ করিতে হইলে মাটির পাইট ও গাছে সর্ব্বদা যত্ন করিতে হয়। কোন কোন বৎসর আবার এরূপও দেখা যায়, উত্তম যত্ন করিয়াও গাছ ভাল হয় না। ভিন্ন দেশীয় উদ্ভিজ্জাদি ভিন্ন স্থানে রোপিত হইলে নানা কারণে তাহাদিগের বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে। জেড়ুয়া ফুলের মধ্যে কোন কোন জাতীয় ফুলের গাছ করিতে হইলে অত্যন্ত যত্ন করিতে হয়, আবার কোন কোন গাছে আদৌ যত্ন করিতে হয় না। সহজেই গাছ জন্মিয়া প্রচুর ফুল ফুটিয়া থাকে।

এই সকল ফুলের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এজন্য অতি যত্নের সহিত তদ্ সমুদয় বপন করিতে হয়। মাটী যত হাল্কা হয় বীজ তত সহজে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ অধিক মাটির নীচে চাপা পড়িলে তাহা হইতে প্রায় চারা বাহির হয় না। জল দেওয়া দোষেও অনেক বীজ নষ্ট হইয়া থাকে, এজন্য অত্যন্ত সাবধানের সহিত জল দেওয়া আবশ্যক। হাতে করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে অথবা সরুধার বোমায় করিয়া আস্তে আস্তে জল দিতে হয়। একেবারে অধিক পরিমাণে জল ঢালিয়া দিলে বীজ সমূহ অধিক মাটির নীচে প্রবিষ্ট হয় অথবা সকল স্থানের বীজ জলের সঙ্গে ভাসিয়া এক স্থানে জমা হইয়া থাকে। এজন্য অনেক স্থানেই দেখা যায় ক্ষেত্রস্থ কিম্বা টবের চারা সকল সর্ব্বত্র সমান বাহির না হইয়া একস্থানে অধিক অন্য স্থানে পাতলা হইয়া থাকে। বীজ বপনের পর অধিক পরিমাণে জল ঢালিয়া দিলে যেমন অনিষ্ট হইয়া থাকে, অঙ্কুর বাহির হইলেও ঐরূপ জল দিলে বিস্তর ক্ষতি হয়। জেড়ুয়া ফুলের বীজ হইতে যে সকল চারা নির্গত হয়, তদ্ সমুদয় অত্যন্ত সরু, এমন কি সামান্য সুতার ন্যায়। এজন্য জলের ধারায় চারা ভাঙ্গিয়া অথবা হেলিয়া কিম্বা শিকড় বাহির হইতে পারে। এই সকল কারণে জল দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

জিনিয়া এলিগেন্স।

(Zinnia elegans.)

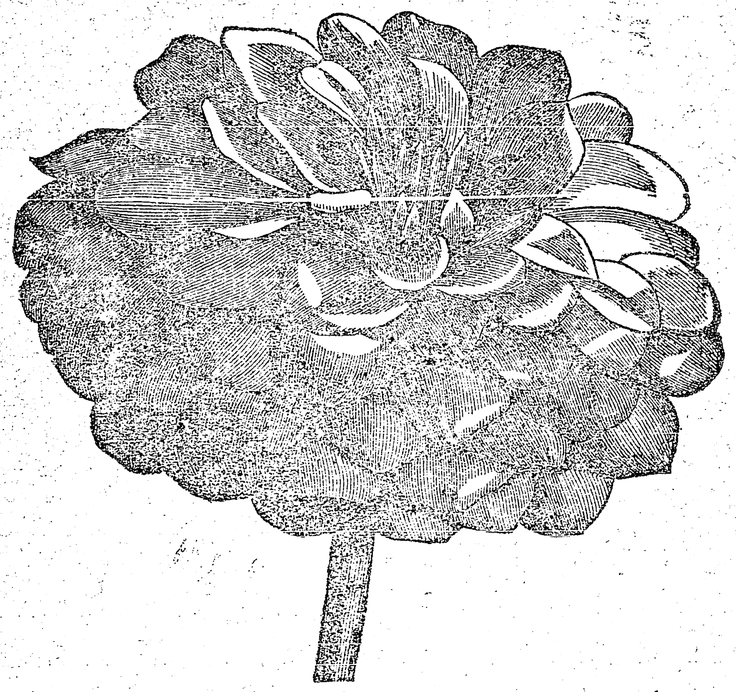

এই প্রস্তাবের শিরোদেশে যে মনোহর ফুলটী শোভা পাইতেছে, ইহার নাম জিনিয়া এলিগেন্স। জিনিয়া দেখিতে অতি মনোহর। এক একটী ফুলের সৌন্দর্য্যে বাগান আলো করিয়া থাকে। ফুলের প্রধান গুণ এই যে, একবার প্রস্ফুটিত হইলে অধিক দিন পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় থাকে। বাগান সুসজ্জিত করিতে হইলে জিনিয়ার গাছ রোপণ করা আবশ্যক। গাঁদা ফুলের সঙ্গে এই ফুলের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। গাঁদার গাছ যেমন সহজে মরে না, বিশেষ পাইট করিতে হয় না, ফুল ফুটিতে যেমন অধিক সময় লাগে অর্থাৎ পুষ্প সহসা বিকসিত না হইয়া ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইতে থাকে এবং ফুটিলেও যেমন শীঘ্র শুষ্ক হয় না, জিনিয়াও সেইরূপ। ইহাকে এক প্রকার জঙ্গলা প্রকৃতির গাছ বলিলেও হয়।

এদেশে বৎসরের মধ্যে দুই সময়ে জিনিয়া ফুটিয়া থাকে। এজন্য দুই-বার বীজ বপণ করা আবশ্যক। গাঁদা ফুলের ন্যায় জিনিয়ারও দলের গোড়া হইতে চারা হইয়া থাকে, ইহার বীজ ধানের চিটার ন্যায় চেপ্টা। ফলতঃ গাঁদা ফুলের যেরূপ বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, ইহার বীজ ধরিবার নিয়ম ঠিক সেইরূপ। পুষ্প গাছে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে তাহা বীজের জন্য রাখা উচিত। পৃথক পৃথক জাতীয় বীজ পৃথক পৃথক পাত্রে রাখা আবশ্যক, কারণ একস্থানে রাখিলে সমুদয় মিশিয়া যাইতে পারে।

নানা জাতীর জিনিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জাতীর বর্ণ পৃথক পৃথক। ডবল অর্থাৎ বহু দল বিশিষ্ট জিনিয়া দেখিতে অতি সুন্দর। এক একটী ফুলের আকার ডালিয়া ফুলের ন্যায় বৃহৎ। বহু দল স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া যখন পুষ্পটী সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়, তাহার সৌন্দর্য্যে উদ্যান আলো করিয়া থাকে। জিনিয়ারও প্রত্যেক গাছে প্রচুর ফুল ফুটিয়া থাকে। ডবল জিনিয়া দেখিতে যেরূপ রমণীয় সিঙ্গল সে-রূপ নহে।

জিনিয়ার গাছ করিতে হইলে জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে গাঁদা ও দোপাটী গাছের ন্যায় বীজ পাতো দিতে হয়। বীজ ছড়াইবার পর যদি বৃষ্টি না হয়, মাটী শুষ্ক হইয়া কঠিন হইতে আরম্ভ হয়, তবে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়। এইরূপ জল পাইলে অল্প দিনের মধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া উঠে। চারা সকল ১০। ১২ অঙ্গুলি পরিমাণে বড় হইলে তাহা শিকড় সমেত তুলিয়া বাগানে রোপণ করিতে হয়। বর্ষার সময় ফুটন্ত গাছ তুলিয়া স্থানান্তরে রোপিত হইলেও কোন ক্ষতি হয় না। গাছের পাইটের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।

জিনিয়ার এক একটী গাছ প্রায় গাঁদা ফুলের গাছের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। কিন্তু গাছের গঠন ও পত্রাদির আকারগত কোন মিল নাই। সচরাচর এদেশে যে সকল জিনিয়া দেখা যায় তন্মধ্যে হাইব্রিড (Hybrida) য়্যালবা (Alba) হেজিনা (Haageana) টেজিটিফ্লোরা (Tagetiflora) প্রভৃতিই প্রধান। হাইব্রিড জাতীয় জিনিয়ার এক একটী ফুলে নানাপ্রকার

বর্ণ মিশ্রিত থাকে। য়্যালবা সাদা বর্ণ বিশিষ্ট এবং হেজিনা দেখিতে কমলালেবুর বর্ণের ন্যায় সুন্দর। টেজিটিফ্লোরা বিলাতী গাঁদার (Marigold) ন্যায় মনোহর।

জিনিয়ার একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা প্রায় সকল দেশের জল বায়ু ও উত্তাপে জন্মিয়া থাকে। মাটিতে বীজ পড়িলে তাহা প্রায় বৃথা নষ্ট হয় না। অন্যান্য আগাছার বীজ যেমন মাটিতে পড়িয়া থাকে এবং বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে উহা অঙ্কুরিত হইয়া গাছ তেজ করিয়া উঠে, ইহারও বীজ সেইরূপ বর্ষার জল সংযোগে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। ফলতঃ ঋতু পুষ্পের মধ্যে জিনিয়া যেমন সহজে জন্মিয়া থাকে, অন্য কোন ফুল সেরূপ দেখা যায় না। মনে করিলে প্রত্যেক গৃহস্থই এই ফুলের সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে জিনিয়া বৎসরের মধ্যে দুই সময় রোপণ করিতে হয়। কিন্তু এক গাছের বীজ দুই সময় রোপণ করিলে ফুল ভাল হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যে সকল ফুল ফুটিয়া থাকে, সেই সেই ঋতুর জন্য ঐ সকল ফুল হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা বর্ষাকালে যে সকল জিনিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহার বীজ হইতে শীতকালে চারা করিলে ভাল ফুল হইবে না। এজন্য বর্ষা ও শীতের বীজ পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। যদিও শীত ও বর্ষা দুই সময়ে জিনিয়া ফুটিয়া থাকে, কিন্তু বর্ষাকালের জিনিয়ার সহিত শীতকালের জিনিয়ার তুলনা হইতে পারে না। বর্ষাকালে যে সময় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জিনিয়া প্রস্ফুটীত হইতে আরম্ভ হয়, তখন বাগানের যে কি পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় তাহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে সে আনন্দ অনুভব করিতে পারা যায় না।

উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে দুই নিয়মে জিনিয়া রোপণ করিলে ভাল হয়। প্রথমতঃ বাগানে প্রবেশের পথের দুই ধারে সরল লাইন করিয়া রোপণ করিতে হয়। গাদা, দোপাটী, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলের গাছ যে পরিমাণে অন্তর অন্তর পুতিতে হয়, জিনিয়ার গাছও সেই পরিমাণে অন্তর করিয়া রোপণ করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

চাষ চাষার কাজ।

[illegible] পাইবে। বর্ত্তমান ভারতক্ষেত্র আর্য্যজাতির ভারত বলিয়া বোধ হয় না, ভারত সন্তানদিগকে সেই উন্নতমনা আর্য্য-বংশীয় বলিয়া বিশ্বাস হয় না; ভারত এখন পর-প্রসাদ লোভে উন্মত্ত—ভারতের মেরুদণ্ড দাসত্বের পদাঘাতে ভগ্ন, ভারতের জীবন বিজাতীয় দয়ায় প্রতিপালিত। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় দাসত্বোপার্জ্জিত অর্থের জন্য লালায়িত ছিলেন না, জাতীয় ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসঙ্গতি হইলে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এখন আর সে রীতি নাই, এখন ভারত উন্নত—সভ্য, বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত, সেই অভিমানে ভারত সন্তান কৃষিকার্য্য করিতে অপমান জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু অপমানের মূল যে দাসত্ব, তাহা ভারত বাসী-দিগের মনে আদৌ বিশ্বাস নাই। চাষ চাষার কাজ বলিয়া সকলেই তাহাতে তাচ্ছল্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ দেশে কৃষক শব্দে বর্ণজ্ঞানশূন্য এক প্রকার শ্রমশীল জীব বুঝায়। কিন্তু সভ্যদেশ সমূহে কৃষক শব্দে অন্য অর্থ বুঝায়। বিলাতে অনেক কৃষক পার্লিয়ামেণ্ট মহা সভার সভ্য হইয়া থাকেন; তথাকার কৃষকগণ বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং প্রভূত ধনশালী। আমাদের দেশের কৃষকদিগের ন্যায় তাঁহারা দুই চারি বিঘা জমি চাষ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না। ইংলণ্ডে এক একজন কৃষকের অধীনে অন্যূন দুই হাজার বিঘা ভূমির চাস হইয়া থাকে। এ দেশ অপেক্ষা বিলাতে চাষে খরচ অধিক পড়ে। সুতরাং ন্যূনকল্পে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার কমে তথায় এক একজন চাষার চাষ-কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না।

পাঠকগণ এখন সহজে বুঝিতে পারিতেছেন, রীতিমত চাষ করিতে হইলে কিরূপ আয়োজন করিতে হয়। চাষ চাষার কাজ বলিয়া যাঁহারা

উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি ইয়ুরোপ ও আমেরিকার চাষ প্রণালী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, গণ্ডুস প্রমাণ জলের সহিত মহাসমুদ্রের যে রূপ প্রভেদ, দেশীয় চাসের সহিত ইয়ুরোপ ও আমেরিকার কৃষিপ্রণালীরও সেই রূপ প্রভেদ। আমেরিকাস্থ ফিলেডেল্‌ফিয়া নগরে লেণ্ড্রেথ্‌ নামক একদল কৃষক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদিগের চাষ প্রণালী শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা কৃষিকার্য্যে যারপর নাই উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কৃষি-ক্ষেত্রে গমন করিলে, কার্য্যের ব্যবস্থা দেখিলে এবং যে পরিমাণে কৃষি-জগতে শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা অবগত হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, কৃষিকার্য্যে সমান্য চাষার কাজ নহে, ইহার উন্নতি করিতে পারিলে সংসারের বিশেষ উপকার করা হয়, দেশের অন্নসংস্থান, ধনবৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার একমাত্র কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

সমুদায় পৃথিবীর সহিত তুলনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, এ দেশে চাষে যেরূপ লাভ হয়, অন্য কোন দেশে কোন ক্রমেই সেরূপ লাভ হইতে পারে না। এদেশের ভূমি স্বভাবতঃই উর্ব্বরা, সেই উর্ব্বরতা নিবন্ধন চাষে অধিক ব্যয় পড়ে না, খরচ অল্প এবং উৎপন্ন অধিক, অথচ এদেশে লোকের পেটে ভাত নাই। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, এ দেশে যে একটী কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে হইয়া আসিতেছে, তদ্‌সমুদায়গুলি হইতেই প্রচুর লাভ হইয়াছে। অনেকদিন হইতে ইংরাজগণ ভারতে নীলের চাষ আরম্ভ করিয়াছেন, এই নীল হইতে কত ইংরাজ যে ধনকুবের হইয়াছেন, তাহা ভারতবাসী অনেকেই অবগত আছেন।

কয়েক বৎসর হইতে আসাম অঞ্চলে প্রচুর রূপে চা আবাদ হইতেছে। তত্রত্য চা পৃথিবীর মধ্যে অধিক আদরের দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চাষে যে প্রভূত লাভ হইতেছে, তাহা শিক্ষিত-শ্রেণী সমুদায়ই অবগত আছেন। আমাদের বক্তব্য, এইদুইটী লাভ-জনক কৃষিকার্য্য যেরূপ নিয়মে চাষ হইতেছে, সামান্য চাষার দ্বারা তাহা অনুষ্ঠিত হইলে কখনই এরূপ আয়জনক হইত না। চাষ যে চাষার কাজ নহে, তাহা বোধ হয়

সকলে বুঝিতে পারিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই, দেশীয় ধনীগণ এইরূপ দেশ মধ্যে সহস্র সহস্র স্বাধীন আয়ের পথ থাকিতে তাঁহারা সে দিকে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছেন।

চাষ চাষার কাজ নহে; চাষ বিদ্বানের কাজ, চাষ ধনীর কাজ। যতদিন না শিক্ষিতগণ, ধনীগণ ইহাতে মনোযোগী হইবেন, ততদিন ভারতীয় চাষ-প্রণালীর উন্নতি কিম্বা দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দেশীয় কৃষকশ্রেণী যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং উহার দিন দিন অবনতি হইতেছে। দেশীয় কৃষকগণ চিরকাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পরমায়ু শেষ করিতেছে, অথচ তাহাদিগের অবস্থা সেইরূপ শোচনীয় ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চাষের উন্নতি করিতে হইলে যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। তাহাদিগের জড় মস্তিষ্ক কোন বিষয়ে পরিচালিত হইতে পারে না, চির-প্রচলিত রীতিই তাহাদিগের একমাত্র শিক্ষা-গুরু। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে আর যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, তাহাদিগের ভাগ্যে সে শিক্ষার দ্বার এ পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইল না। দেশীয় গবর্ণমেণ্টেরও এ বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি নাই। আমারা সকল বিষয়ে ইংরাজজাতির মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহারা যদি দয়া করিয়া আমাদের কৃষি-প্রণালীর উন্নতি করিয়া দেন, তবেই ভারতীয় চাষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। নতুবা ভারতবাসীরা সে বিষয়ে আদৌ মনোযোগী হইবে না।

আমাদের আবাস গৃহের চারিদিকে জীবনোপায়ের সহস্র সহস্র উপায় বর্ত্তমানরহিয়াছে, পদ-দলিত মৃত্তিকা আমাদের দুঃখ-মোচন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে, জলবায়ু অনুকূল হইয়া কৃষিকার্য্য আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তে আহ্বান করিতেছে, তত্রাপি আমাদের চৈতন্য হইবে না, কৃষিকার্য্যে অনুরাগ হইবে না, এবং দেশের উপকার করিতে কেহই অগ্রসর হইবে না। আমরা দাসত্ব-প্রিয় জাতি, দাসত্বোপার্জ্জিত অর্থ আমাদের অতি ভাল বাসার সামগ্রী, সেই জন্যই আমরা হাজার দেখিয়া, হাজার শুনিয়া, হাজার জ্ঞান লাভ করিয়া বিশুদ্ধ লাভ-জনক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না।

আমাদের স্কন্ধে যেন দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া বলিয়া দিতেছে, ভারত সন্তান! তোমরা দাসত্বের পদাঘাত ভুলিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের পথে ভ্রমক্রমেও পদার্পণ করিও না; উদারন্নের জন্য আজীবন নানা লাঞ্ছনা ভোগ কর, তোমার সম্মুখে সহস্র সহস্র বিদেশীয়গণ উপস্থিত হইয়া কৃষি-কার্য্য দ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করুন, তুমি সে বিষয়ে একটুও চেষ্টা করিও না। দাসত্ব তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি, অতএব সেই ধন বুকে করিয়া বসিয়া থাক! কি ঘৃণার কথা! ভারতবাসীর গৃহে অন্ন নাই, ভারত ক্ষেত্রে চির-দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান, ভারতের জীবন দাসত্বোপার্জ্জিত অর্থে প্রতিপালিত। ভারতের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনই চিন্তা করেন নাই, তাঁহাদিগের কুলাঙ্গার বংশধরগণ এই নীচ জঘন্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

ভারতে কিসের অভাব? যদিও চিরদিন ভারত-ভাণ্ডার বিলুণ্ঠিত হইতেছে, ভারতের অর্থরাশি দেশ বিদেশে গমন করিতেছে, ভারতের শস্যাদিতে সমুদায় পৃথিবী প্রতিপালিত হইতেছে, তত্রাপি ভারতের কিছুই করিতে পারে নাই এবং করিতে পারিবেও না। ভারত মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি কোন রাজা, কোন শত্রু, কোন দস্যু অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। ভারত চিরকাল সমুদায় জগতের অন্নদাতা বলিয়া যে গৌরব করিয়া থাকে, সেই গৌরব এখনও বর্ত্তমান থাকিবে। ভারতের গৃহে গৃহে আবার অন্নের স্বচ্ছলতা সঞ্চারিত হইবে, ভারত আবার অবনত মস্তক উন্নত করিয়া উত্থিত হইবে। এখনও যদি ভারত-সন্তান আবার কৃষিকার্য্যে মন দেন, পূর্ব্বের ন্যায় আবার যদি কৃষির অনুশীলন করেন, তবে নিশ্চয়ই ভারতের মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার হইবে।

কি সভ্যাবস্থা কি অসভ্যাবস্থা সকল সময়েই কৃষি প্রচলিত আছে, অসভ্যাবস্থায় উহার কিছুই উন্নতি ছিল না, সামান্যাকারে অনুষ্ঠান হইয়া থাকিত, সভ্যাবস্থায় নানা কৌশল, নানা উপায়ে উহার উন্নতি হইয়া থাকে। পৃথিবীর ইতিহাস দেখ, যে দেশে যে সময় হইতে সভ্যতার আলোক প্রকাশ হইয়াছে, সেই দেশে সেই সময় হইতে কৃষির উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারত যখন সভ্যতার উচ্চ সিংহাসনে আরূঢ়, সেই সময় ভারতের চারিদিকে

কৃষির বিশেষ আদর ছিল। রাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে মুনিঋষি পর্য্যন্ত কেহ স্বহস্তে হল-চালনা করিতে কোন প্রকার আপত্তি কিম্বা অপমান জ্ঞান করিতেন না। এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় সভ্যজগৎ দেখ, সকল দেশেই মহামহা পণ্ডিতগণ অতি গৌরব জ্ঞান করিয়া পরম আহ্লাদের সহিত কৃষিকার্য্য করিতে কত উৎসাহ ও কত যত্ন করিতেছেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় কৃষি-যন্ত্র প্রভৃতি কৃষিকার্য্যোপযোগী নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্দেশীয়-দিগের ন্যায় বর্ণ-জ্ঞান-শূন্য সামান্য কৃষক শ্রেণীর উপর উক্ত কার্য্য অর্পিত থাকিলে কখনই তাহা এতদূর উন্নতি পথে অগ্রসর হইত না। কৃষি একটী গুরুতর বিজ্ঞান, এই গুরুতর বিষয় সম্যক প্রকারে অনুশীলন না হইলে কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না। ভারতে যে কৃষির এত অবনতি হইয়াছে, শিক্ষিতগণ ইহাতে প্রবেশ না করাই এক মাত্র কারণ। চাষ চাষার কাজ, দেশীয় লোকের মনে যত দিন এই অমূলক বিশ্বাস থাকিবে, তত দিন সহস্র চেষ্টা করিলেও উহার উন্নতি হইবে না।

ভারতের অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, দারিদ্র-দশা দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লোকের কষ্ট-স্রোত শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় কেবলমাত্র চাকুরীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। চাকরী দ্বারা কস্মিন কালে ভারতের দুঃখরাশি বিদূরিত হইবে না। ইতিহাস দেখ, কেবল চাকুরী দ্বারা কোন দেশ উন্নতি-পথে গমন করে নাই। ঐ সকল কার্য্য দেশমধ্যে যাহাতে বহুল রূপে প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ আবশ্যক। এতদ্দেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীরমধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিবার নানাবিধ প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সর্ব্বাগ্রে উহা বিমোচন করা কর্ত্তব্য। কখনও ভারত সন্তানগণ কৃষিকার্য্যে মনো-নিবেশ করিলে, চাষ চাষার কাজ এই কুসংস্কার হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিলে, ভারত আবার নবজীবন লাভ করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

দেরাদুন লাউ।

লাউ কুমড়া প্রভৃতি তরকারী কি নিয়মে রোপণ করিতে হয়, এ দেশের অনেকেই তাহা অবগত আছেন। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জেলাতেই লাউ জন্মিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই তরকারী এদেশে প্রচলিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রে হবিষ্যে, নবমী তিথিতে এবং ভাদ্র মাসে ভক্ষণ নিষেধ। ইহা দ্বারা উত্তম তরকারী ও পায়স প্রস্তুত হইয়া থাকে। এদেশে নানা বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন আকার-বিশিষ্ট লাউ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি পাইক-পাড়া নর্শরিতে দেরাদুন হইতে এক প্রকার লাউ বীজ আনীত হইয়াছে, এই লাউ অতি বৃহৎ আকারে হইয়া থাকে।

দেরাদুন লাউ কেবল মাত্র যে আহারে ব্যবহৃত হয়, এরূপ নহে। ইহা দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট তানপুরা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। তানপুরার জন্য এক একটী লাউ অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এমন কি ভালরূপ সুডৌল লাউ হইলে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত এক একটীর মূল্য হইতে পারে। দেশ মধ্যে এই বৃহজ্জাতীয় লাউ চাষ করিতে পারিলে বিস্তর লাভ হইতে পারে। যে নিয়মে এই লাউ রোপণ করিয়া তানপুরার উপযুক্ত করিতে হয়, নিম্নে তদ্বৃত্তান্ত লিখিত হইল।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস পর্য্যন্ত দেরাদুন লাউ রোপণের প্রশস্ত সময়। অত্যন্ত শীতের সময় বীজ রোপণ করিলে যদিও চারা বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্য ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। প্রতিদিন অপরাহ্নে অল্প পরিমাণে জল সেচন করিলে চারা বাহির হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে এরূপও দেখা গিয়াছে যে, কুড়ি পঁচিশ দিন পরে অঙ্কুর নির্গত হইয়াছে। শীতের সময় তিন চারি দিন বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রোপণ করিলে ভাল হয়; কখন কখন ঈষদুষ্ণ জলে বীজ ভিজাইয়া উপকার দেখা গিয়াছে। কিন্তু সচরাচর গরম জলে না ভিজাইলেও কোন অপকার হয় না। অনেকে বীজ আদৌ না ভিজাইয়াও রোপণ করিয়া থাকেন।

লাউ কুমড়া প্রভৃতি মাদা করিয়া রোপণ করা ভাল। মাদা করিবার নিয়ম এই, যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, এরূপ স্থান নিরূপিত করিয়া সেই স্থানের মৃত্তিকা অন্যূন এক হস্ত পরিমাণ গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে। গর্ত্ত হইতে খনিত মৃত্তিকা তুলিয়া তাহাতে উপযুক্ত মত গোবর-সার মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত পূর্ণ করিতে হইবে। অনন্তর পাঁচ সাত দিন অধিক পরিমাণে জল দ্বারা ঐ সারযুক্ত মৃত্তিকা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে জল দ্বারা সার ও মৃত্তিকা উত্তম কর্দ্দমিত হইলে, তাহাতে আর জল না দিয়া উহা শুষ্ক করিতে হইবে। রৌদ্রে উত্তমরূপে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, তাহা খুঁড়িয়া ভাল করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। এই গুঁড়া মাটী সমতল ভাবে মাদায় আস্তে আস্তে চাপিয়া দিতে হইবে। মাদা প্রস্তুত শেষ হইলে তাহাতে বীজ রোপণ করিতে হয়। রোপণান্তে প্রতিদিন অপরাহ্নে অল্প পরিমাণে উহাতে জল দিলে শীঘ্র অঙ্কুর নির্গত হইয়া থাকে। এ স্থলে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, বীজ অধিক মৃত্তিকার নিম্নে রোপিত হইলে গাছ বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এজন্য অন্ততঃ আদ ইঞ্চি মাটির মধ্যে উহা রোপণ করা ভাল।

চাষার অবস্থায় অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে গাছের অপকার করিয়া থাকে। এমন কি অনেক চারা মরিয়া যায়; এজন্য চারার অবস্থায় অধিক বৃষ্টিপাত হইলে উহা কোন আচ্ছাদান দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হয়। মাটির অবস্থা বুঝিয়া গাছে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাটি নীরস বোধ হইলে পাঁচ ছয় হাত গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ভাল। প্রতি মাদাতে অন্যূন তিন চারিটী বীজ রোপণ করা উচিত; এক মাদায় অধিক পরিমাণে বীজ রোপিত হইলে গাছ সকল ভালরূপ তেজস্কর হয় না। বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া ডগা বাড়িতে থাকিলে তাহা কোঞ্চি কিম্বা সামান্য ডালে তুলিয়া দিতে হয়। অপর ডগা সকল মাটিতে লতাইতে দিলেও কোন অনিষ্ট হয় না। যে সকল লাউ তানপুরার জন্য প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা থাকে, সেই সকল গাছ কোঠার ছাদে কিম্বা মাটিতে লতাইয়া দিলে ভাল হয়, তাহা মাচায় তুলিবার কোন

আবশ্যকতা নাই। যদি মাচায় তোলা হয়, তবে অন্য উপায় অবলম্বন করা উচিত। লাউ যে স্থানে ঝুলিবে, তাহার নিম্নে মাচা করিয়া তক্তা পাতিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকে এরূপও করিয়া থাকে, তাহা বড় করিবার জন্য গামলা কিম্বা অন্য কোন পাত্রে করিয়া ফলের নিম্নে জল ঝুলাইয়া রাখে। ঐ জল এরূপ হিসাবে রাখিতে হইবে, যেন ফলের [illegible] স্পর্শ না হয়। কারণ তাহাতে জল লাগিলে পচিয়া যাইবে। [illegible] উপর যেন ফল চারি পাঁচ আঙ্গুল ফাক থাকে, এরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। লাউ যত বাড়িতে থাকিবে, জল ততই নিম্নে নামাইতে হইবে। যখন দেখিবে উহা রীতিমত বাড়িয়াছে, এবং বড় হইয়া ভারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তখন আর জল তাহার নীচে রাখিবার প্রয়োজন থাকে না। জল সরাইয়া সেই স্থানে তক্তা পাতিয়া তাহার উপর লাউ বসাইলে ভাল হয়। তক্তার উপর তুলার গদি কিম্বা অন্য কোন নরম দ্রব্য পাতিয়া তাহার উপর লাউ বসাইলে উহা সুগোল হইয়া থাকে।

মাচায় কিছুদিন থাকিলে গাছ বাড়িয়া ফল ধরিবার উপযুক্ত হয়। গাছ বাড়িতে থাকিলে তাহার গোড়ায় অন্য সার না দিয়া ভাতের শীতল ফেন বা মাড় দিলে অত্যন্ত উপকার হয়, এই সার ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী। অনন্তর গাছে লাউ ধরিলে, যে লাউটী সুগোল এবং বৃদ্ধিশীল বোধ হইবে, তাহাই তানপুরার জন্য রাখা আবশ্যক। যে ডগায় সেই লাউটী থাকে, সেই ডগায় আর আর লাউ ফলিলে তদ্‌সমুদায় কাটিয়া ফেলিতে হইবে। কারণ একটী ডগায় অধিক ফল থাকিলে গাছের রস প্রত্যেক ফলে গ্রহণ করাতে সকলগুলি সমান বড় হয় না। অপর একটী ফল রাখিলে ডগার সমুদার রস তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যে তাহাকে পরিপুষ্ট করিয়া দেয়। ফল ধরিলে আর একটী বিষয়ে মন দিতে হয়। ফলটী মাটীতে কিম্বা কোন কঠিন দ্রব্যের উপর থাকিলে ফলের কচি অবস্থায় সেই পাশটী সুগোল হইতে পারে না। যেমন শিশু সন্তানদিগের মস্তক নরম বালিসে রাখিতে হয়, সেইরূপ উত্তম (ধুনা) তুলা দ্বারা নরম অথচ পুরু গোছের একটী গদি প্রস্তুত করিয়া

তদুপরি ঐ লাউ রাখিতে হইবে। গদির আকার একটু বড় হওয়া আবশ্যক, কারণ ফল বড় হইলে উহা যেন গদি ছাড়িয়া মাটিতে আসিয়া না পড়ে। যত দিন পর্য্যন্ত লাউ গাছে থাকিবে, ততদিন গাছের তেজ বৃদ্ধির পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গাছ জীবিত থাকা পর্য্যন্ত লাউ তুলিবে না। কারণ গাছে সম্পূর্ণ ফল পক্ক না হইলে, তদ্দ্বারা উত্তমরূপ তানপুরা হয় না। অসার গাছের কাষ্ঠে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, তাহা যেমন স্থায়ী ও মজবুত হয় না, সেইরূপ অপরিপুষ্ট লাউ দ্বারা তানপুরা প্রস্তুত হইলে সেই খোল অধিক দিন থাকে না অল্প আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এজন্য শীঘ্র ফল না তুলিয়া গাছ একেবারে সম্পূর্ণ শুকাইয়া মরিয়া গেলে, তখন উহা তুলিতে হয়। সুপক্ক লাউ মুখ কাটিয়া তন্মধ্যে গোবর পুরিয়া রাখিলে মধ্যস্থ শস্য প্রভৃতি সমুদায় অংশ পচিয়া যাইবে। অনন্তর তাহা পরিস্কার করিয়া তদ্দ্বারা তানপুরা প্রস্তুত করা উচিত।

বিশেষ যত্ন করিয়া লাউ প্রস্তুত না করিলে উহা সুগোল হইতে নানা প্রকার ব্যাঘাত জন্মে। সুগোল অলাবু দ্বারা উৎকৃষ্ট তানপুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে লাউ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কোন্ সময় হইতে যে লাউ এদেশে ব্যবহার হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন; লাউ নির্ম্মিত বীণা যন্ত্র সরস্বতী ব্যবহার করিতেন। এরূপ প্রবাদ আছে তুম্বু মুনি প্রথমে লাউ দ্বারা তানপুরা প্রস্তুত করেন। তানপুরা যে অতি প্রাচীন যন্ত্র, তাহা কে না স্বীকার করিবেন। তানপুরা লাউ দ্বারা যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, অন্য কোন দ্রব্যে সেরূপ হয় না। ইহাতে সুর উত্তমরূপ বাহির হয়। সুগোল লাউ দ্বারা প্রস্তুত হইলে তানপুরা, এস্‌রাজ্, বীণ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকল দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী হয়। স্বভাবতঃ যে সকল অলাবু জন্মিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ যত্ন না করিলে, উহা প্রায় সুশ্রী হয় না; হয়ত সমুদায় অঙ্গ উত্তম আকার বিশিষ্ট হইয়া এক অংশ বা একস্থান কিছু উন্নত অথবা নিম্ন হইয়া সৌন্দর্য্যের হানি করে। এই জন্য সচরাচর ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র অর্থাৎ তানপুরা প্রভৃতি সুডৌল দেখা যায় না। সার উইলিয়ম জোন্স

সাহেব দেশীয় বাদ্য যন্ত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, সঙ্গীত ও বাদ্য বিষয়ে হিন্দু জাতি বিস্তর উন্নতি করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু যন্ত্রগুলি যেরূপ আকারে গঠিত, তাহা সভ্য সমাজের উপযুক্ত নহে। উহার গঠন প্রণালী আরও উন্নত হওয়া আবশ্যক। বাস্তবিক যতদিন পর্য্যন্ত অলাবু সকল স্বাভাবিক গঠনের উপর নির্ভর করিবে, ততদিন আকারগত সৌষ্ঠব হওয়া কঠিন। এজন্য পূর্ব্বোক্তরূপ নিয়মানুসারে গদির উপর লাউ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে তাহার আকার সম্পূর্ণ গোল ও সুডৌল হইবে। এদেশে এই জাতীয় লাউ অধিক পরিমাণে চাষ হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা। লোকের প্রয়োজন বুঝিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

পল লিরণ গোলাপ।

(Paul Leron.)

সৌন্দর্য্য, বৃহৎ আকার এবং সৌগন্ধ নিমিত্ত পল লিরণ একটী মনোহর গোলাপ। সম্পূর্ণ বিকশিত পল লিরণ দেখিলে স্বভাবতঃই মনে এক প্রকার আনন্দ সঞ্চার হয়। ইতি পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্বে যে সকল গোলাপের বিষয় লিখিত হইয়াছে, পল লিরণও সেই সকল গোলাপের ন্যায় উৎকৃষ্ট; বিশেষ যত্ন করিয়া ফুল ফুটাইতে পারিলে এক একটী ফুল পদ্মের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। পললিরণের যেমন বৃহৎ আকার, সেইরূপ আবার বহুদল উপরি উপরি সাজান থাকায় পুষ্পের সৌন্দর্য্য শতগুণে অধিক দেখায়। এক একটী ফুলে অনেক দল থাকে, সকল দলের আকার ও গঠন এক রূপ নহে। ফুলের মাথায় যে সকল দল থাকে, সেই সকল দল অপেক্ষা গোড়ার দল অনেক বড়। বহুদল-বিশিষ্ট ফুল মাত্রেই প্রায় দেখা যায়, উপরিকার দল অপেক্ষা গোড়ার দল সমূহ বৃহৎ হইয়া থাকে। পল লিরণের গোড়ার দলও অত্যন্ত বড় আয়তনের এই বৃহৎ আকারের দল সমূহ প্রস্ফুটিত হইলে, পুষ্পের অসাধারণ শোভা হইয়া থাকে। বাস্তবিক বাগানে ভাল ভাল গোলাপ ফুটিয়া থাকিলে, সকলেরই চক্ষু তাহাতে আকৃষ্ট হয়। পললিরণের যেমন আকার ও শোভা

সেইরূপ বর্ণেরও চমৎকারিত্ব দেখা যায়। ইহার বর্ণ সম্পূর্ণ লাল, কিম্বা গাঢ় গোলাপী নহে, পাতলা গোলাপী বর্ণ। পললিরণ যে সময় ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন এক প্রকার শোভা এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে অন্যরূপ হইয়া থাকে। রূপবতী যুবতীর অধরপ্রান্তে মধুর হাসির রেখা-বিকাশের ন্যায়, ইহার কলিকা যে সময় বিকাশোন্মুখ হয়, সেই সময় যেন রূপ উথলিয়া পড়িতে থাকে। এই বিকাশের সঙ্গে সুগন্ধ বিস্তার হওয়াতে পললিরণ আরও আদরের, আরও গৌরবের হইয়া উঠে। ফুল ফুটিবার সময় যে রূপ সুগন্ধ থাকে, সম্পূর্ণ বিকাশ হইলে সে রূপ থাকে না। বায়ুতে উহার পরিমল উড়িয়া যায়, এজন্য বাসী ফুলে গন্ধ পাওয়া যায় না। পল লিরণ সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইতে তিন চারি দিন সময় লাগে এবং ফুল ফুটিয়াও চারি পাঁচ দিন গাছে থাকে।

ফুলের উন্নতি করিতে হইলে গাছের যে বিশেষ রূপ পাইট করিতে হয়, তাহা মনে রাখা উচিত। ভালরূপ পাইট করিলে এক একটী ফুলের বেড় প্রায় ১৩ ইঞ্চ হইয়া থাকে। গোলাপ মাত্রেই দেখা যায়, নূতন গাছে যেরূপ উৎকৃষ্ট ফুল হয়, গাছ পুরাতন হইলে সেরূপ ফুল হয় না। এজন্য দুই তিন বৎসর পরে পুরাতন গাছ মারিয়া সেইস্থানে নূতন নূতন কলম রোপণ করা আবশ্যক। অনেকগুলি কারণে ফুল ছোট হইয়া থাকে। পাইটের ত্রুটি, ও গাছ অধিক দিনের হইলে এবং এক ডালে অনেক কলিকা ধরিলে ফুলের অবনতি হইয়া থাকে। গোলাপের সকল ডালে সমান আকারের ফুল হয় না। যে সকল ডাল নূতন এবং তেজস্কর তাহাতে ভাল ফুল হইয়া থাকে। এক ডালের মাথায় অধিক কলিকা ধরিলে তন্মধ্যে ভাল রকমের দুই একটী কলিকা রাখিয়া অবশিষ্টগুলি ভাঙ্গিয়া দিলে ভাল হয়। কারণ এক ডালে অনেক ফুল হইলে, শাখাস্থ রস সমুদায় ফুলে আকর্ষণ করিয়া লওয়াতে, কেহই অধিক পরিমাণে পুষ্টি উপযোগী রস বা আহার পায় না, গর্ভস্থ শিশু যেমন জননীর দেহ হইতে স্বীয় দেহ-পুষ্টি-উপযোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ শাখাস্থ ফুল ও ফল সকল বৃক্ষের শরীর হইতে স্ব স্ব দেহ পরিপোষণ

দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। ডালে অধিক ফুল কিম্বা ফল হইলে তাহারা অধিক পরিমাণে রস না পাইয়া সম্যক রূপ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। এজন্য সকল কলিকা রাখা উচিত নহে। কতক কলিকা ভাঙ্গিয়া দিলে ডালে যে দুই একটী ফুল থাকে, তাহা অতি বৃহৎ আকারের হইয়া থাকে। ফুল ও ফল বড় করিবার এই নিয়মটী উদ্যান-প্রিয় ব্যক্তিদিগের জানা কর্ত্তব্য।

পল লিরণ টবের উপযোগী গাছ নহে, কারণ গাছ বড় হইয়া থাকে। তবে যদি অত্যন্ত বড় টব প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রোপণ করা হয়, তাহা হইলে চলিতে পারে। ফলতঃ এই গোলাপ মাটিতে রোপণ করাই উত্তম। অল্প বেলে মাটি ইহার পক্ষে ভাল। যোড় কলমের চারায় উত্তম ফুল হইয়া থাকে। অন্যান্য গোলাপের কলম বাঁধিবার যে নিয়ম, পল লিরণেরও সেই নিয়মে কলম প্রস্তুত করিতে হয়। কার্ত্তিক মাস যে গোলাপ গাছ পাইটের পক্ষে উপযুক্ত সময়, তাহা রাখা আবশ্যক। গোবর ও পুঁটি মাছের সার ইহার পক্ষে প্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, জল সেচন করা উচিত। গাছের পুরাতন ডাল কাটিয়া দিলে, সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে যে সকল নূতন নূতন শাখা নির্গত হয়, সেই সকল শাখাতে উত্তম ফুল ফুটিয়া থাকে।

বর্ষাকালে বাগানের যে স্থানে জল দাঁড়ায়, সেরূপ স্থানে গোলাপ গাছ রোপণ করা উচিত নহে। কারণ বর্ষার জল বসিলে অনেক গাছ পচিয়া মরিয়া যায়। এদেশে বর্ষাকালেই গোলাপ গাছ মরিয়া থাকে। এজন্য গোলাপ ক্ষেত একটু উঁচু করিয়া দিলে ভাল হয়। পল লিরণের এক একটী গাছ সচরাচর ৪। ৫ ফিট বড় হইয়া থাকে। গাছের পাতা কিছু বড় ডালে কাঁটা অল্প। পুষ্প-প্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে পললিরণ একটী আদরের গোলাপ। উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এই গোলাপ রোপণ করা বিধেয়।

ধান্য চাষের পক্ষে বৃষ্টির জল কিরূপ প্রয়োজনীয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর; ৩য় খণ্ড কৃষিতত্ত্বের ১৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

বৃষ্টির জল ধান্য চাসের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ব্বেই এক প্রকার বলা হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসই ধান্য বীজ রোপনের প্রশস্ত সময়। যে সকল জমিতে ধান্যবীজ রোপণ করিতে হয়, তাহাতে অধিক পরিমাণে সার দিয়া, বৈশাখ মাসে বৃষ্টির পর বাভ (যো) হইলে, ঐ জমিতে উপরি উপরি ২। ৩ বার লাঙ্গল দিয়া রাখিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে, ঐ জমীতে পুনরায় ২। ১ টা চাষ দিয়া, ধান্য বীজ বপন করা আবশ্যক। বৃষ্টির জল পাইয়া, উক্ত ধান্য অঙ্কুরিত হইয়া, চারা বহির্গত হয়। ধান্য বপনের পর অধিক দিন বৃষ্টি না হইলে, অথবা অল্প পরিমাণে বৃষ্টি হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে উক্ত ধান্যের আর তাদৃশ উৎপাদিকা শক্তি থাকে না। তখন পুনরায় ধান্যবীজ বপন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। একারণে সমস্ত জমিতে এক সময়ে ধান্যবীজ বপন না করিয়া, পৃথক পৃথক জমীতে পৃথক পৃথক সময়ে (৫। ৭ দিন অন্তর করিয়া) ধান্য বীজ রপণ করা আবশ্যক। তাহাতে সমস্ত জমীর বীজ ধান্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারে ধান্যের চারা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহাকে আমাদের এখানে "নিয়াজ (জলজ) বীজ" কহে। এস্থলে আমরা ধান্যের আবাদ সম্বন্ধে অধিক কথা লিখিব না, বারান্তরে তাহা বিস্তারিত রূপে লিখিবার বাসনা রহিল।

আষাঢ় মাসই ধান্য চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। ঐ সময়ে ধান্য চারা রোপিত হইলে, এবং কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত জলের কষ্ট না হইলে, প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিতে পারে। কিন্তু বর্ষে বর্ষে সার দিয়া জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। শ্রাবণ মাসে জমীর আবাদ করিলেও চারি পোয়ার স্থলে তিন পোয়া ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। আষাঢ় মাসে বর্ষারম্ভ হইয়া জমীতে আবাদোপযোগী জল দাঁড়ান বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ জল সিঞ্চনের দ্বারা তদ্রূপ ফল লাভের

সম্ভাবনা নাই। আষাঢ় মাসেও অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া ভাল নহে। তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে; অধিক বৃষ্টি হইলে মাঠ প্লাবিত হইয়া যায়, জমীতে হল চালন কিম্বা ধান্য চারা রোপণ করিতে পারা যায় না। ধান্য চারা রোপণ করিতে গেলে, চারা গুলি জল মগ্ন হইয়া যায়, এবং রোপিত ধান্যের চারা গুলি অধিক জলে পচিয়া যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা; একারণ আষাঢ় মাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া ভাল নহে। এমত বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, যাহাতে আবাদও চলিতে পারে, এবং ধান্য চারা পচিয়া নষ্ট হইয়া না যায়।

শ্রাবণ মাসে ধান্য চারা রোপিত হইলে পর, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া, মাঠ প্লাবিত হইলে অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিতে জমীর রোপিত ধান্য যত জল মগ্ন হইতে থাকে, ধান্যের গাছ গুলি সতেজে উর্দ্ধদিকে ততই উত্থিত হইতে থাকে- এবং হরিদ্বর্ণ পত্র সকল নিগত হইয়া কৃষকের আনন্দ বর্দ্ধন করে! ফলতঃ শ্রাবণ মাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে ধান্যের বিলক্ষণ উপকার হয়।

ভাদ্রমাসে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াও ভাল নহে। তাহাতে ধান্য গাছের মূল হইতে আর অন্য চারা বাহির হইতে পারে না। ভাদ্র মাসের রৌদ্র ধান্য চাসের পক্ষে বিলক্ষণ উপকারী। এই মাসে সর্ব্বদা মেঘাবৃত না থাকিলে, ২। ৪ টী রোপিত ধান্যের মূল হইতে বহুসংখ্যক ধান্য চারা উত্থিত হইয়া থাকে। ভাদ্র মাসেও মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সর্ব্বদা বৃষ্টি হওয়া ভাল নহে। সর্ব্বদা মেঘাবৃত থাকিয়া, পুনঃ পুনঃ বৃষ্টি হইলে, গাছ হইতে ধান্য প্রসবিত হইতে পারে না। ধান্য চারা রোপণের পর হইতে, ধান্য পক্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত জমীতে জল থাকা বিশেষ আবশ্যক। জমীর জল শুষ্ক হইলে, সুচারুরূপে ধান্য জন্মে না। ভাদ্র মাসে অল্প পরিমাণে জমীর জল শুষ্ক হইলেও তাদৃশ ক্ষতিজনক হয় না।

আশ্বিন মাসে মধ্যে মধ্যে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া, জমি জল পূর্ণ থাকা বিশেষ আবশ্যক। নচেৎ ভাদ্র মাসে ধান্য গাছের মূল হইতে

যে চারা গুলি বাহির হয়, সে গুলি সতেজে উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হইতে পারে না এবং তাহা হইতে ধান্যের শীষ বাহির হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আশ্বিন মাসে ধান্যের থোড় অর্থাৎ ধান্যের শীষ গর্ভস্থ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জল পাইলে ধান্যের থোড় হয় না এবং গর্ভস্থ শীষ গুলি ভবিষ্যতে আগড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

কার্ত্তিক মাসে মধ্যে মধ্যে বিনা বায়ুতে বৃষ্টি হওয়া বিশেষ আবশ্যক। কার্ত্তিক মাসেই প্রায় সমস্ত ধান্যের শীষ সতেজে নির্গত হইয়া থাকে। এই সময়ে মাঠের শোভা সন্দর্শন করিলে মোহিত হইতে হয়। কার্ত্তিক মাসে অন্ততঃ ২। ১ বার বৃষ্টি না হইলে ধান্যের শীষগুলি সতেজে নির্গত ও বড় হইতে পারে না এবং অধিকাংশ ধান্যই আগড়া হইয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি হইলে অনেক সময়েই প্রায় প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়। এই সময়ে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, ধান্যের কোমল শীষ গুলি ছিন্ন ভিন্ন ও তৎকর্ত্তৃক প্রায় অধিকাংশ ধান্যই আগড়া হইয়া যায়। এই সময়ে কোন কোন ধান্য পক্ক হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "কার্ত্তিক সা'ল" কহে। আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিব।

ধান্য চাসের পক্ষে কোন্ মাসে কি পরিমাণে বৃষ্টির জল আবশ্যক, তাহা এক প্রকার লিখিত হইল। এই প্রণালীতে বৃষ্টি হইলে চারি পোয়া ধান্য জন্মিতে পারে। কিন্তু প্রতি বৎসর এরূপ হওয়া অসম্ভব। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের এখানকার বিজ্ঞকৃষকদিগের নিকট যে বচনটী শ্রুত হওয়া যায় তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমরা এই প্রবন্ধে যে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিব, তাহা খোনার বচন বলিয়া আমাদের এখানকার অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু তাহা কত দূর সত্য বলা যায় না।

বচনটী এই;—"মিথুনে লট পট; কর্কটে ছলপট। সিংহে চটকা, কন্যা কানে কান; বিনা বা'য়ে তূর্যে তুলা কোথা থোব ধান॥ *

এই বচনটী হৈমন্তিক ধান্যের চাষ সম্বান্ধই ব্যবহৃত হইতে পারে! আশু ধান্য সম্বন্ধে এই বচন খাটিবার সম্ভাবনা নাই। এই বচন অনুযায়ী কার্য্য হইলে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আষাঢ়

শ্রাবণ এই দুই মাসেই অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়া ধান্য চাসের বিলক্ষণ অনুকূল হয়। এই এই মাসে যদি কোন বৎসর আবাদোপযোগী বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কখনই প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিতে পারে না। তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, অনেক মনুষ্যের অকালে মৃত্যু উপস্থিত হয়। ঐ দুই মাস ধান্য—আবাদের উপযুক্ত সময়। ঐ সময়ে যদি আবাদোপযোগী বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কৃষকের ধান্য বীজ রোপণাদি কিছুই করিতে পারে না।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে পূর্ব্ব ও অগ্নি কোন হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, প্রায়ই কুজ্‌ঝটিকার ন্যায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহা ও এত সামান্য যে সমস্ত দিন বর্ষণ হইলে ও মৃত্তিকা আর্দ্র হয় কি না সন্দেহ;—একারণ তাহা বৃষ্টি হওয়ার মধ্যে ধর্ত্তব্যই নহে। ইহা প্রমাণ স্বরূপে আমরা নিম্নে একটী বচন উদ্ধৃত করিলাম। বচনটী এই;——

"আষাঢ় শ্রাবণে পূবে বাও (বায়ু)
পাল তুলে দিয়ে বাণিজ্যে যাও ॥ "

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অগ্নিকোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলেও প্রায় বৃষ্টি হয় না;—যদিও কখন কখন বৃষ্টি হইতে দেখা যায়—তাহা অতি সামান্য স্থানেই হইয়া থাকে—তদ্দ্বারা আবার আবাদোপযোগী কার্য্য হয় না। একারণ আমাদের এখানকার কৃষকেরা ঐ কোণকে "হেলে (হল চালন সক্ষম বলদ) বেচা কোণ" কহে। এই সময়ে পশ্চিম, উত্তর, উত্তর পূর্ব্ব, ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়া থাকে।

আবার ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব্ব ও অগ্নি কোণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, মধ্যে মধ্যে মূষল ধারে বৃষ্টি হইয়া, মাঠ প্লাবিত করিয়া দেয়।

*আষাঢ় শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বদিকহইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, আবাদোপযোগী বৃষ্টি হইবে না;—বৃষ্টি না হইলে, এ দেশে আবাদের উপায় নাই, সুতরাং এমত স্থলে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য।

প্রমাণ স্বরূপে এস্থলেও আমরা একটী বচন উদ্ধৃত করিলাম। বচনটী এই;—

"ভাদ্র আশ্বিনে পূবে বাও (বায়ু)।
আ'ল কেটে দিয়ে ঘরে যাও ॥ "

ভাদ্র আশ্বিন মাসে পূর্ব্ব দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, প্রতি দিনই প্রায় অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন জমিতে জল আবদ্ধ রাখিবার জন্য আইল বান্ধিয়া রাখিবার আবশ্যকতা নাই। বরঞ্চ আইল কাটিয়া দিয়া, জমীর জল বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য;—সে সময় প্রতি দিন বৃষ্টি হওয়ার জন্য কৃষকেরা আইল কাটিয়া দিয়া থাকে।

কোন্‌দিকে বিদ্যুৎ হইলে, কোন্‌দিকে মেঘ ডাকিলে, কোন্‌দিকে মেঘ হইলে ও কোন্‌ দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে বৃষ্টি হইয়া থাকে; তৎসম্বন্ধের একটী বচনও নিম্নে লিখিত হইতেছে। এই বচনটী যে সকল সময়ে কার্য্যে পরিণত হয় এইরূপ নহে; তবে অনেক স্থলে কার্য্যকারক হইয়া থাকে। বচনটী এই;——

"অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ।
অমোঘা উত্তরে ধ্বনিঃ ॥
অমোঘা পশ্চিমে মেঘাঃ।
অমোঘা পূর্ব্ব বায়সা ॥ "

তুলা রাশি উপর্য্যুপরি স্থাপিত আকারের ন্যায় যে সকল শ্বেতবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাকে আমাদের এখানে কোদালে কুড়ালে মেঘ কহে। সেই মেঘ দৃষ্টি করিলেই আমাদের অনেক পাঠকই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। কোদালে কুড়ালে মেঘ উঠিলে ও উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহিত হইলে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে আমরা একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ঐ বচনটি খোনার বচন বলিয়া, আমাদের এখানকার অনেকেরই বিশ্বাস। খোনা স্বীয় শ্বশুরকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বচনটি বলিয়াছিলেন বলিয়া, আমাদের এখানকার অনেকেরই সংস্কার আছে। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য বলা যায় না। সে যাহা হউক বচনটি এই;—

"কোদালে কুড়ালে মেঘে গায়।
এলো মেলো দিচ্ছে বায়॥
শ্বশুরকে ব'ল বাঁধ্‌তে আ'ল।
আজ না হয় ত, হবে কা'ল॥"

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষীয় নবমীতে খোনা যে বচনটি স্বীয় শ্বশুরকে বলিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

"আষাঢ় নবমী শুকল পাখা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
সকালে শুকা বিকালে বাণ।
মধ্যে বর্ষে সকলি ধান॥
যদি বর্ষে কণা,
পর্ব্বতে ফলে কেলে মনা।*
যদি বর্ষে রুণি ঝুনি,
শস্যের ভরে কাঁপে মেদিনী॥
যদি বর্ষে মুষল ধারে,
সমুদ্রতে বগা চরে।
যদি বর্ষে পাটে,
চাষীর গরু বিকয় হাটে॥"

আষাঢ় নবমীর দিন বৃষ্টি হইলে ভাবী ধান্যের বিষয়ে অনেকটা জানিতে পারা যায়। আষাঢ় নবমীর দিনে কৃষিকার্য্যের মঙ্গলোদ্দেশে ও সুবৃষ্টির জন্য অনেক স্থানেই ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

ধান্য শীষে ফল হইবার একমাস পরে, শীষের ফুলগুলি স্খলিত হইবার কুড়িদিন পরে, এবং শীর্ষের ধানে দুগ্ধবৎ পদার্থের (কোমল চাউল)

* এক প্রকার ধান্য বিশেষ। জলাশয়ে অথবা অধিক জলে ঐ ধান্য জন্মিয়া থাকে।

সঞ্চার হইবার তের দিন পরে ধান্য পক্ক হইয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে খোনার একটি বচন আছে।

"ফুলে তিরিশে, শীষে বিশে।
ঘোঁড়া মুখে * তের,
এই বুঝে শ্বশুর ঠাকুর লেখা পড়া কর॥"

আমেরিকান লঙ্কা।

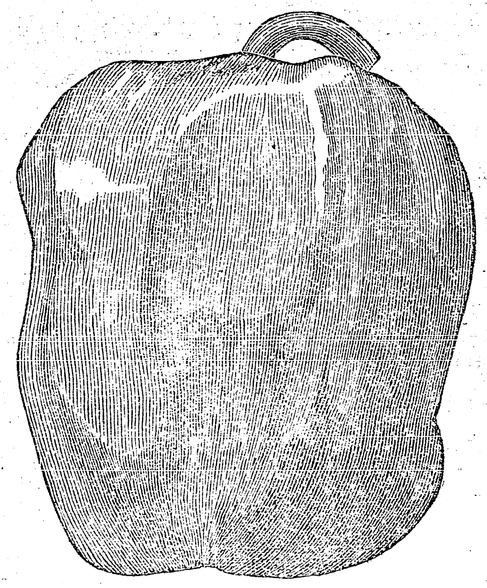

লঙ্কার ব্যবহার ও রোপণ প্রণালী এদেশে অনেকেই জ্ঞাত আছেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই লঙ্কা জন্মিয়া থাকে। উহা নিত্য ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। দেশী লঙ্কা রোপণ প্রণালী কৃষিতত্ত্বে লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে কেবল আমেরিকান লঙ্কার বিবরণ পাঠক বর্গের গোচরার্থে তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল। এদেশে যে সকল লঙ্কার আবাদ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে উপরি চিত্রিত লঙ্কার ন্যায় বড় আকারের লঙ্কা দেখা যায় না। আমেরিকান

* ধান্য দুগ্ধবৎ ভার বিশিষ্ট পদার্থের সঞ্চার হইলে, শীষগুলি নত হইয়া, ঘোঁড়ার মুখের ন্যায় হয়। শীষগুলি নত হইবার তের দিন পরেই ধান্য পক্ক হইয়া থাকে।

লেণ্ডেথ্ নামক কোম্পানির নিকট হইতে এই লঙ্কার বীজ পাইক পাড়া নর্শরিতে আনীত হইয়া থাকে। দেশ মধ্যে ইহার চাষ বৃদ্ধি হইলে বিস্তর উপকার হইতে পারে। দেশীয় অন্যান্য লঙ্কার ন্যায় উহা তীব্র ঝাল বিশিষ্ট নহে। এই লঙ্কা দেখিতে অতি সুশ্রী, দেশীয় লঙ্কার ন্যায় ইহার গঠন নহে। বাডস্আইচিলি চেরিসেপড্চিলি লংরেডচিলি প্রভৃতি নানাবিধ লঙ্কা বিদেশ হইতে আনীত হইয়া দেশমধ্যে চাষ হইতেছে। আমেরিকা ও ইয়ুরোপে অনেক প্রকার লঙ্কা জন্মিয়া থাকে। দেশীয় লঙ্কার চাষ প্রণালী যেরূপ নিয়মে করিতে হয়, এই বৃহজ্জাতীয় লঙ্কাও সেই রূপ নিয়মে আবাদ করিতে হয়। এক জমিতে অধিক দিন ধরিয়া লঙ্কা চাষ করিলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। এজন্য প্রতি বৎসর এক জমিতে ইহার চাষ করা অনুচিত। লঙ্কার জমিতে এই উর্ব্বরতা শক্তি বজায় রাখিবার জন্য বৎসর বৎসর উহাতে সার দিলে ভাল হয়। যে কোন শস্যাদির চাষ হউক না কেন, ভূমিতে সার দিয়া রোপণ করিলে যে ফসল অধিক হয়, ইটী কৃষকের সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সচরাচর গোবরের সার দিলে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে একটী স্থানে বীজ পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই স্থানে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প জল সেচন করা আবশ্যক। পাতো দিয়া চারা ৪।৫ অঙ্গুল বড় হইলে উহা তুলিয়া ক্ষেত্রে রোপণকরা উচিত। অন্যূন কুড়ি দিবেন মধ্যে বীজ হইতে চারা রোপণের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

ক্ষেত্রে লঙ্কার চারা এক হাত অন্তর লাইন করিয়া রোপণ করিলে ভাল হয়। চারা ঘন ঘন করিয়া পুঁতিলে পরস্পর গাছে ঠেকা ঠেকি হইয়া থাকে, এবং সকল গাছে ভালরূপ বাতাস লাগিতে পায় না। সুতরাং ফসল অধিক হইতে ব্যাঘাত জন্মে। গাছে পোকা লাগিলে ছাই দিতে হয়। এক একটী গাছ প্রায় এক হাত দেড় হাত পরিমাণে বড় হইয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে গাছে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। কাঁচা অবস্থায় সবুজ বর্ণ রং থাকে, সুপক্ক হইলে গাঢ় লাল বর্ণ বিশিষ্ট হয়। ক্ষেত্রের পাইট প্রভৃতি দেশী লঙ্কার চাষের ন্যায়।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা এবং কৃষি-বিদ্যা।

আজি কালি আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়, কৃষি-বিদ্যা লইয়া আন্দোলন ও আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি এই আন্দোলন বাস্তবিক অন্তঃসার শূন্য না হয়, তাহা হইলে ইহা দেশের পক্ষে শুভকর বলিতে হইবে।

সংবাদ পত্রে, সাময়িক পত্রে, প্রকাশ্য সভা মধ্যে, কৃষি বিদ্যার উপকারীতা লইয়া বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহা দেখিয়া কোন বৈদেশিক পণ্ডিত সহসা মনে করিতে পারেন, বুঝি বঙ্গীয় প্রাজ্ঞ সমাজ কৃষিতত্ত্বের পবিত্র এবং প্রশস্ত উন্নতি-বর্ত্মের চরম সীমায় পাদর্পণ করিতেছে !! কিন্তু পল্লব-গ্রাহী শাখা মৃগদিগের কথা, কিম্বা যৌতুক অংস্কারকদিগের নিরবচ্ছিন্ন কচ্ছে নিঃসারিণী ব্যক্তৃতা পরিত্যাগ করিয়া, যদি নিরপেক্ষ এবং চতুরস্ত্র ভাবে দেখা যায়, তাহাহইলে স্বতঃই প্রতীত হইবে যে, বঙ্গদেশে কৃষি-বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থা গজ-ভুক্ত-কপিত্থফলবৎ হইয়া রহিয়াছে।

মহাত্মা লর্ড হালিফক্স্ সাহেবের যত্নে, ইং ১৮৫৪ অব্দে এদেশের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে দয়ালু বৃটিস্ গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। ইহার ঠিক দশ বৎসর পরে (অর্থাৎ ১৮৬৩ অব্দে) ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষি-বিদ্যার আলোচনা ও উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করেন। তখন লর্ড এল্গিণ সাহেব এদেশের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। এল্গিণ সাহেব সার্দ্ধেক বর্ষ মাত্র প্রতিনিধিত্ব করিয়া লর্ড লরেন্স সাহেবের হস্তে ভারতের শাসন দণ্ড সমর্পণ করতঃ ইউরোপ গমন করেন। এল্গিণ সাহেবের অব্যবহিত পূর্ব্বে লর্ড ক্যানিং এদেশের গবর্ণর জেনরল ছিলেন। এই তিন জন ইউরোপীয় মহাপুরুষের অপ্রতিহত

পরিশ্রমে ও নিঃস্বার্থ হিতৈষণায় ইউরোপীয় পুরুষ কর্ত্তৃক এদেশের অন্ধতমসাময়ী কৃষি-বিদ্যা সর্ব্বপ্রথমে আলোক দর্শন করে। এক্ষণে দেখা যাউক, এই বিংশতি বৎসর মধ্যে কৃষি-বিদ্যার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে।

আমরা স্বীকার করি, এই বিংশতি বৎসর মধ্যে দেশের ধন (Wealth of Nation) বৃদ্ধি পাইয়াছে; স্বীকার করি, কৃষি কার্য্যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে; স্বীকার করি, উন্নতা ও পরিমার্জ্জিতা রীতিতে কৃষি কার্য্য চালাইবার সংকল্প হইতেছে; কিন্তু এত গুলি উন্নতি সত্ত্বেও দেশের উন্নতি হয় নাই।

দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ধন ধনীদিগের মধ্যে নিবদ্ধ আছে। সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে শতকরা ৩।১ (তিন দশমিক এক) ধনী লোক। তোমাকে আমাকে লইয়া দেশ নহে, কিম্বা কলিকাতার ঠাকুর—মল্লিক্-শীল—দেব বাহাদুর প্রভৃতি ধনবান উচ্চ বংশের পরিবারবর্গকে লইয়া দেশ নহে; যাহাদিগকে লইয়া দেশ, এই ধনে তাহাদের ভোগ বা ভাগ নাই। স্বীকার করি, এই ধনে অনরেবল গোকুল কিশোর মহোদয়ের ন্যায় শতকরা দুই একটি জমিদারের উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু যাহাদের সমষ্টিতে দেশের ভিত্তি রহিয়াছে—যাহারা বার মাস তের দিন ভূতের মত খাটিয়া জাতীয় অর্থের ও অস্তিত্বের উপায় করিয়া দেয়—এধনে তাহাদের ভোগ বা ভাগ নাই!! সুতরাং আমি বলিব, এদেশের উন্নতি হয় নাই।

এদেশের শিক্ষিত যুবকেরা এক্ষণে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় লোক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে কিরূপে উৎসাহ দিয়াছেন বা দিতেছেন। বাবু শ্রীনাথ দত্ত এবং আর দুই একটি ভদ্রলোক ইউরোপে কৃষিতত্ত্ব—উদ্ভিদবিদ্যা-শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন, এদিকে দেশীয় সম্পাদকদিগের কিছুকালের জন্য খোরাক যুটিল। ক্রমে প্রভূত আস্ফালনের সহিত "ব্যবসায়ী" জন্ম গ্রহণ করিল, আসামে কুঠী ভাড়া লওয়া হইল, এবং গৌহাটীতে কমিটি বসিল। ফল কি হইল! কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া, শেষে সমুদয় উদ্যম চতুর্দ্দশ দিবসের সূর্য্যাস্তের সহিত ভারতাকাশে অনন্ত কালের জন্য মিলিয়া গেল। শ্রীনাথ বাবু চাকুরীর জন্য লালায়িত হইলেন, "ব্যবসায়ী" আর দেখা দিল না। এই যে প্রতি বৎসর

অসংখ্যাসংখ্য বঙ্গীয় যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ্-বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পালে পালে বাহির হইতেছেন, তাঁহারা দেশের—জাতির—সমাজের কি করিয়াছেন; কোন্ কুঠী, কোন্ কৃষিবিদ্যালয়, কোন্ ক্ষেত্র আবাদ, কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন্ সাময়িক পত্র, তাঁহাদের কীর্ত্তি! বিলাত হইতে প্রত্যাগত কোন্ যুবক কৃষিকার্য্যে মন দিয়াছেন? অহো! যে দেশের শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক, কোন চাষার ছায়া স্পর্শ করিলে, সূর্য্য দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত দেন, সে দেশের আবার উন্নতি কোথায়? কৃষিবিদ্যার উন্নতি হইয়াছে একথা একগলা গঙ্গা জলে দাঁড়াইয়া বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না।

হিতৈষী মার্কুইশ অব হার্টিংটন্ (আমাদের বর্ত্তমান ষ্টেট্সেক্রেটারি) সম্প্রতি এক খানি প্রয়োজনীয় সার্কুলার (প্রচারণী) দ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য প্রতিবৎসর বঙ্গদেশ হইতে দুইটী ছাত্র ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে, এবং বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই দুইটী ছাত্রকে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইবেন। এ বৎসর কটক কলেজের উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের অধ্যাপক বাবু গিরিশচন্দ্র বসু এবং হাবড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অন্যতম অধ্যাপক বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বয় ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা তথায় অন্যান্য বিষয়ের সহিত কৃষিতত্ত্বও শিক্ষা করিবেন। দেখা যাউক, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া কি করেন। নিশ্চয়ই সারতঃ (Practically) কোন কার্য্যই হইবে না।

ইণ্ডিয়ান এগ্রি হর্টী কলচুরেল সোসাইটি দ্বারা যে বিশেষ কোন কার্য্য হইতেছে, এমন বোধ হয় না। ফুলের মেলা (Flower Show) কপি ও ফুল বিক্রয়, বীজের পরীক্ষা, নীলের আবাদ—এই পর্য্যন্তই তাঁহাদের অন্ত! ইউরোপীয় মহলেই তাঁহাদের পসার এবং কারবার; গরিব কৃষক মহলে তাঁহাদের সংবাদ পৌঁছে নাই।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, কৃষিতত্ত্বের কোন ধার ধারে না। তথায় উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান কিম্বা কৃষি বিজ্ঞান আদৌ স্থান পায় নাই। শব্দ, উত্তাপ, তাড়িত এবং আলোক, এই লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ ব্যস্ত। তবে এখন দেখা যাউক, কি উপায়ে এদেশে

কৃষিতত্ত্বের প্রকৃতরূপে আলোচনা হইতে পারে—কিরূপে সাধারণে ইহার শিক্ষা প্রচারিত হইতে পারে।

আমার বিবেচনায়, এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়। কৃষিতত্ত্ববিশারদ এবং কৃষিতত্ত্বানুরাগী প্রাজ্ঞদিগকে লইয়া, বাঙ্গালীর একটি সভা স্থাপিত হউক। সেই সভায় কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আলোচিত হইবে এবং এক খানি সাময়িক পত্র (যেমন "কৃষিতত্ত্ব") সেই সভার মুখ পত্র (Organ) থাকিবে। ঐ পত্রে কৃষি বিদ্যা বিশেষ রূপে আন্দোলিত হইবে। সভার অধীনে ক্ষেত্র থাকিবে তথায় নানাজাতীয় বীজের রোপণ ও পরীক্ষা হইবে, এবং সেই ক্ষেত্রের দ্বার সাধারণ্যে অবারিত থাকিবে। এই সভার অধীনে বিদ্যালয় থাকা উচিত, এই বিদ্যালয়ে কৃষিতত্ত্বে—উদ্ভিদবিদ্যা এবং রসায়ণ শিক্ষা দেওয়া হইবে। সভার সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে মফস্বল ভ্রমণ করিয়া কৃষকদিগের সম্মুখে কৃষিতত্ত্ব শিক্ষা দিবেন এবং নানা স্থানের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সভায় রিপোর্ট করিবেন। মফস্বলে মধ্যে মধ্যে শাখা সভা থাকিবে।

আমি যাহা প্রস্তাব করিলাম, বোধ হয় সাধারণের নিকটে ইহা অসঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইবে না। "কৃষিতত্ত্বের" মান্যবর সম্পাদক এবং সুযোগ্য প্রকাশক নৃত্য বাবুকে এজন্য বিশেষ যত্নবান্ হইবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি। এ কার্য্যটি যদি তাঁহাদের দ্বারা সুসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে জগতে তাঁহারা অমর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইতে পারিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

নাগেশ্বর পুষ্প।

এই অবনী মণ্ডলে কত সৌন্দর্য্যরাশি জগতপিতা জগদীশ্বর স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কে ইয়ত্তা করিবে। প্রকৃতির যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করি সেই দিকেই বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া মন প্রাণ পুলকিত হয়। প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে প্রকৃতির হাস্যময়ী মুখারবিন্দ, কলপ্রবাহিনী স্রোতস্বিনীর নয়ন মনোহর দৃশ্য, গগনভেদী গিরিশৃঙ্গ, নীলনৈশাকাশের তারকাময় বেষ্টিত অপরূপ শ্রী,জ্যোৎস্নাময়ী পূর্ণশশীর বিচিত্র শোভা, বৃক্ষবনস্পতির তৃপ্তিকর দৃশ্য কাহার মন না মোহিত করে! আবার সর্ব্বোপরি কুসুমের কি বিচিত্র সৌন্দর্য্য কি আশ্চর্য্য শক্তি! যখন প্রভাত সমীরণ সেবন মানসে ফল পুষ্প শোভিত উদ্যানে পদ চারণা করি, তখন একদিকে যেমন সুখসেবিত বিহঙ্গমকুলের মধুর কণ্ঠ নিনাদে কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয়—মলয় মারুত সেবনে শরীর স্নিগ্ধ হয়, অপর দিকে সেইরূপ নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পের প্রফুল্ল আনন সন্দর্শনে মন প্রাণ মুগ্ধ হয়। তাহাদের মধুর সৌরভে হৃদয় মোহিত হয়। এই পৃথিবী মধ্যে নানা জাতীয় কুসুমরাজি দৃষ্টি পথে পতিত হয় কিন্তু কোনটীই অকারণে নহে। কোন কোনটী সৌন্দর্য্য মন ভুলায়, কোনটী বা সৌরভামোদে প্রাণ কাড়িয়া লয়, কোনটী বা আশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন, উৎকট ব্যাধিনিবারক, মৃতজীবনে প্রাণ সঞ্চারক, জীবন রক্ষক। ভূমণ্ডলে এরূপ ব্যক্তি কি কেহ আছেন, যিনি কুসুমের সৌন্দর্য্য দর্শনে বা বিমল সৌরভ আঘ্রাণে পুলকিত না হন, আমরা ত ইহা বিশ্বাস করি না। আমরা যদিও আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধিতে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, নিতান্ত দুঃখের আবস্থায় নিপতিত হইয়া কুসুমের শোভা সন্দর্শনে মন সুস্থ হয়, কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণে বিষাদ হৃদয় শীতল হয়। অদ্য আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পুষ্প জাতি বা যাবতীয় পুষ্প সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি; শীর্ষোল্লিখিত পুষ্প সম্বন্ধে দুই একটী কথার উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বেল, মল্লিকা, জুঁই, চাঁপা, গাঁদা দোপাটী, রজনীগন্ধক প্রভৃতি কুসুম নিচয় যেমন এক এক বিশেষ ঋতুতে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে, অদ্যকার আলোচ্য পুষ্পও সেইরূপ এক ঋতুতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহার প্রস্ফুটনের কাল বসন্ত ঋতুর অবসানে শীতবিশীর্ণ কুসুম লতিকা সকল যখন নব পল্লবাদিতে সুশোভিত হইতে থাকে, তৎকালে এই শ্রীভ্রষ্ট নাগেশ্বর বৃক্ষ অভিনব পত্রে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়। যখন এই বৃক্ষ নব পল্লবাদিতে সুশোভিত হইতে থাকে, তখন ইহা দেখিতে বড় মনোহর হয়। প্রথমে শাখাগ্রভাগ হইতে এক পত্র বহির্গত হয় তাহা রক্তিমা বর্ণের, তাহা শীতের অবসান সময়ে মাঘ মাসের শেষে, তৎপরে এই সমস্ত পত্র যত সূর্য্য কিরণ সম্ভোগ করিতে থাকে সেইরূপে ক্রমশঃ ক্রমশঃ এবং অবশেষে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তাহার পর সাধারণ সবুজবর্ণ এক কালে যখন এই বৃক্ষে এই ত্রিবিধবর্ণের পত্র শোভা পায়, তখন যে কি সুন্দর বোধ হয় তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুমান করা সহজ সম্পাদ্য। এই বৃক্ষ অম্র, জাম, নিচু প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় বৃহৎ হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধদিকে যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, শাখা প্রশাখা সেরূপ হয় না। ইহার পত্র সমূহ ঘন সন্নিবিষ্ট, ইহার পত্রের সহিত নিচু পত্রের অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তবে রঙটী তত ঘোরাল নহে।

এইরূপে পত্রাদি মুকুলিত ও পল্লবিত হইলে ইহার শাখাগ্রভাগ হইতে এইরূপ এক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন দুইটী পত্র একেবারে জোড়াভাবে মুকুলিত হইতেছে, স্থূলতঃ ইহা দেখিতে ঠিক কুঁড়ির মত। এই কুঁড়ি যখন প্রস্ফুটিত হয় তখন তাহার অভ্যন্তর হইতে পুষ্পের কুঁড়ি বিনির্গত হয়। তদনন্তর কখন উপরোক্ত প্রস্ফুটিত কুঁড়ির পাপড়ী দুইটী বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়, কখন পুষ্পের কুঁড়ি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কুঁড়ি সম্পূর্ণরূপে গোলাকার-কুঁড়ি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া প্রস্ফুটিত হয়। আমরা দেখিয়াছি কুঁড়ি বিনির্গমনের কাল হইতে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে অন্যূন ২২।২৩ দিন লাগিয়া থাকে। পুষ্পের অবয়ব খুব বৃহৎ নহে, বেল, জুঁই প্রভৃতির ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রও নহে। একটী রৌপ্য মুদ্রা পরিমাণ অপেক্ষা কিছু বড়। প্রস্ফুটিত পুষ্প মুদ্রার ন্যায় গোল চারিদিকে দিব্য শ্বেত

বর্ণের পাঁচটী পাপড়ী মধ্যস্থলে গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের কেশরী দেখিতে সুন্দর নয়নের তৃপ্তিসাধক; কিন্তু পুষ্প গুলি এক দিবসের অধিক সজীবিত অবস্থায় থাকে না।

এই পুষ্পের গন্ধ তীক্ষ্ণ অথচ সুমিষ্ট, চাঁপা ফুলের সুতীক্ষ্ণ গন্ধে যেরূপ শিরারোগ আনয়ন করে, ইহা সে প্রকারের নহে। ইহার আঘ্রাণে মস্তিষ্কের কোন অনিষ্ট সম্পাদক করে না, বরং বারম্বার আঘ্রাণ লইলে শিরঃরোগ তিরোহিত হয় এবং হৃদয় মনের প্রফুল্লতা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই পুষ্পের আঘ্রাণে নানা প্রকার উৎকট ব্যাধির শান্তি হয়, তন্মধ্যে নাসার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিতে আমরা কএকজনকে দেখিয়াছি। অনবরত নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার আঘ্রাণ দ্বারা মহদুপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সরবতের সহিত ইহার পাপড়ী বাঁটিয়া খাইলে প্রমেহ পীড়ায় উপকার দর্শে, ইহার তৈলে শিরঃরোগ আরোগ্য হয়, মস্তিষ্ক শীতল হয়, মস্তক ঘূর্ণন নিবারণ করে এবং নিয়মিত ব্যবহার করিলে মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য বিদূরিত করে, কেশরাজির শোভা সম্পাদন করে; কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় ইহার তৈল আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই না। শুষ্ক পুষ্প আয়ুর্ব্বেদ বিহিত অনেক ঔষধে প্রয়োগ হইয়া থাকে, এই জন্য আয়ুর্ব্বেদের স্থানে স্থানে এই পুষ্পের নাম দৃষ্ট হয়। এতদ্দেশীয় অনেক স্ত্রীলোক ইহার শুষ্ক কেশরী নারিকেলতৈলে প্রয়োগ করিয়া তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন; যখন পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখন প্রাতঃসন্ধ্যা এই বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আমরা অনেক সময়ে এই প্রকারে জ্যোৎস্নাময়ী সায়ং সময় ও সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে ইহার নিম্নে উপবেশনকরতঃ বিশ্বপিতার উপাসনা করিয়া পুলকিত হইয়াছি।

এই কুসুম বিদেশ জাত নহে, ভারতের নিজস্ব, নতুবা প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিবে কেন? আমাদের স্মরণ হয়, মহাভারতের দুই এক স্থানে এই কুসুমের উল্লেখ দেখিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ বা মহাভারতের পৃষ্ঠা উলটাইবার যদি আমাদের প্রচুর সময় থাকিত, তাহা হইলে ঐ ঐ গ্রন্থ হইতে আমাদের কথার যথার্থ্য প্রতি পাদক প্রমাণ সংগ্রহ করিতাম। কিন্তু বোধ হয় আমাদের প্রমাণের আবশ্যকতা নাই,

আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিতগণ ইহার সত্যতা বহুকাল হইতে অবগত আছেন। পার্ব্বতীয় ও অরণ্য প্রদেশে এই বৃক্ষের বহুল জন্ম হইয়া থাকে। বৈশাখের শেষে কিম্বা জ্যৈষ্টের প্রারম্ভে এই পুষ্পের বীজ পরিপক্ক হইয়া ভূপতিত হয়, আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হইলে বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। বীজ হইতে বৃক্ষ সহজে ও অল্পায়াসে জন্মিয়া থাকে কিন্তু প্রায়ই মরিয়া যায়, বর্দ্ধিত হয় না। ফলতঃ সুযোগ ক্রমে যদি ইহার শৈশব সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় তবে এ বৃক্ষ প্রায় মরে না, বহুকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। এই বৃক্ষ প্রস্তুত করা অতীব কঠিন, নিতান্ত সূর্য্যোত্তাপে বা সেঁতা স্থানে এ বৃক্ষ জন্মে না। ইহার বর্দ্ধন শক্তি ও অতি সামান্য ১০।১৫ বৎসরে ৩।৪ হাত পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, ১০।১১ বৎসরে পরে ফুল ধরে, তবে স্থান বিশেষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। আমরা এই বৃক্ষের কলম হইতে দেখি নাই ও শুনি নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল সিংহ।

য়্যাষ্টার।

(Aster)

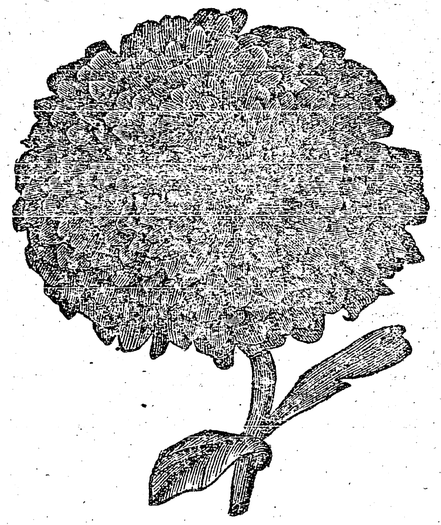

ঋতু পুষ্পের (Seasonflowers) মধ্যে য়্যাষ্টার দেখিতে অতি সুন্দর। উহার সৌন্দর্য্য দেখিলে সকলেরই ইচ্ছা হয়, এই পুষ্প স্ব স্ব আবাসে প্রস্তুত করিয়া শোভা সন্দর্শন করি। অতি সহজ উপায়ে এই ফুলের গাছ তৈয়ার করিতে পারা যায়। য়্যাষ্টার গাছ বার মাস জন্মে না, কেবল শীতের সময় ইহার গাছ ও ফুল হইয়া থাকে। ফুলের যেরূপ আকার তাহার চিত্র উপরে প্রদর্শিত হইল। চিত্র দেখিয়া পাঠকগণ উহার সৌন্দর্য্যের কতক অনুভব করিতে পারিবেন। গাছে যে সময় য়্যাষ্টার ফুটিয়া থাকে, তখন দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী হয়। য়্যাষ্টারের মধ্যে নানা প্রকার জাতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি য়্যাষ্টার এক স্থানে রোপণ করিলে বাগানের যারপরনাই বাহার হইয়া থাকে, এজন্য অনেকে যত্ন করিয়া য়্যাষ্টারের চারা প্রস্তুত করিয়া বাগান সাজাইয়া থাকেন।

ঋতু পুষ্পের গাছ করিতে হইলে একটু বিশেষ যত্ন করিতে হয়। কারণ

এই সকল ফুলের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহাতে আবার এদেশীয় নহে। ভিন্ন দেশের জল বায়ুতে যে সকল গাছ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে অন্য দেশের জল বায়ুতে উৎপন্ন করিতে হইলে ভাল রকম পাইট করিতে হয়। শিশু-দিগের জন্য জননী যেমন সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, অনেক যত্নে অনেক ক্লেশে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়, সেইরূপ মালিদিগের উচিত প্রত্যেক গাছের চাষে সর্ব্বদা মনোযোগী থাকে। গোড়া খুসা জল ও সার দেওয়া এই গুলি উদ্ভদ্ প্রতিপালন সম্বন্ধে প্রধান কার্য্য। কোন্ প্রকার গাছে কি নিয়মে জল সেচন ও সার দিতে হয়, এবং কোন গাছ কি প্রকার মাটিতে পুঁতিতে হয় তাহা না জানিয়া কোন চাষে প্রবৃত্ত হইলে কোন ফল লাভ হয় না, এজন্য কোন প্রকার গাছ রোপণ করিতে হইলে, অগ্রে তাহার প্রকৃতি জানা আবশ্যক।

য়্যাষ্টার বীজ হইতে গাছ হইয়া থাকে। ইহার বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এদেশে সচরাচর যেসকল য়্যাষ্টার আসিয়া থাকে, তদসমুদায় জর্ম্মাণ ও চাইনা য়্যাষ্টার নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন আরও কএক জাতীর য়্যাষ্টার আছে। য়্যাষ্টারের একএকটী গাছ প্রায় এক হাত বড় হইয়া থাকে। এদেশে আশ্বিনের শেষে য়্যাষ্টারের বীজ রোপণ করিতে হয়। টবে উহার বীজ রোপণ করা আবশ্যক। দোআঁশ মাটিতে য়্যাষ্টার ভাল হইয়া থাকে, একটী টবে তিন ভাগ দোআঁশ মাটি ও এক ভাগ পাতার সার দিয়া টবপূর্ণ করিতে হইবে। টবের উপরি-কার মাটি উত্তমরূপ গুঁড় করা আবশ্যক। মাটি গুঁড় করিয়া ধুলার ন্যায় হইলে তাহাতে বীজ পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর অল্পপরিমাণে পূর্ব্বোক্ত মাটি ছড়াইয়া দিতে হইবে। মাটি এরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন বীজ সকল বেশী চাপা না পড়ে। কারণ বীজ অধিক মাটির নীচে পড়িলে অঙ্কুর বাহির হইতে বিলম্ব হয়। টবে এই নিয়মে বীজ বপণ করিয়া উহা বারেণ্ডায় অথবা এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে যেন অধিক রৌদ্র না লাগিতে পায়। বীজ বপণের দুই দিন পরে একদিন অন্তর অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। জল যেন একেবারে ঢালিয়া না দেওয়া হয়। একেবারে অধিক পরিমাণে জল ঢালিয়া দিলে বীজ সমূহ অধিক মাটির নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উহা

অধিক মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে চারা জন্মাইতে ব্যাঘাত জন্মে। টব রাত্রি কালে বাহিরে ও দিবসে ঘরে বা বারেণ্ডায় তুলিয়া রাখিতে হইবে। আট দিন হইতে কুড়িদিনের মধ্যে প্রায় চারা বাহির হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, অনেকে চারা বাহির করিবার নিয়ম না জানাতে বীজের দোষ দিয়া থাকেন। কাহারও কাহার ও মনে এরূপ ভুল বিশ্বাস আছে যে বীজ বপণ করিয়া জল ও সার দিলেই চারা বাহির হইবে, যদি নির্গত না হয় তবে বীজের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। যে সকল উদ্ভিদের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র তাহাদিগের সম্বন্ধে একটী বিশেষ কথা আছে। সাধারণতঃ সকলে শুষ্ক মৃত্তিকায় বীজ বপণ করিয়া জল সেচন করিয়া থাকেন। এইরূপ নিয়মে বীজ বপণ করিলে চারা বাহির হইতে একটী বিঘ্ন ঘটে কেহ তাহা লক্ষ্য করেন না। শুষ্ক মৃত্তিকায় বীজ বপণ করিয়া তাহাতে জল সেচন করিলে জল পড়িয়া বীজ সকল নড়িয়া থাকে। মনে কর যে স্থানে বীজ আছে, জল পড়িয়া সে স্থান হইতে উহা একটু সরিয়া যায়। এইরূপ প্রতি দিন জল পড়িয়া একটু একটু নড়াচড়াতে চারা হইতে বিশেষ ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এজন্য নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে রোপণ করিলে গাছের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

দোআঁশ মাটি উত্তমরূপে গুঁড় করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে তাহা জল দিয়া কর্দ্দম করিতে হইবে। লোকে দেওয়াল দিতে যেরূপ কাদা করিয়া থাকে, সেইরূপ কাদা হইলেই চলিতে পারে। অনন্তর ঐ কাদায় টবের তিনভাগ পূর্ণ করতঃ, তাহার উপর পাতার সার মিশ্রিত পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক মৃত্তিকা চূর্ণ ৫।৭ আঙ্গুল আন্দাজ দিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। যে পরিমাণে মাটি কাদায় মিশাইয়া যাইতে পারে, তাহা মিশিয়া গেলে, উপরিকার মাটির উপর খুব পাতলা করিয়া বীজ বপণ করিতে হইবে। বীজ বপণ করিয়া তাহার উপর আবার পাতলা করিয়া মাটির গুঁড় দিতে হইবে। পাতার সার অভাবে গোবরের সার অল্প পরিমাণে দিলেও উপকার হইতে পারে। জেড়ুয়া ফুল সমূহের পক্ষে পাতা-সার বিশেষ উপকারী। পাতা-সারের একটী গুণ এই যে উহা অত্যন্ত হালকা, অল্প জলে সমুদায় মাটি ভিজিয়া থাকে। জল শুষ্ক হইলে মাটি এরূপ কঠিন হয় না যে গাছের অনিষ্ট

হইতে পারে। জেড়ুয়া ফুলের চারার অবস্থায় শিকড় সকল অত্যন্ত সূক্ষ্ম থাকে, এমন কি অত্যন্ত সরু সূতা কিম্বা আঁশের ন্যায় দেখা যায়। তজ্জন্য মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া কঠিন হইতে আরম্ভ হইলে শিকড়সমূহ কষিয়া ধরে যে ভাহা আর বাড়িতে পারে না। পাতার সার দিয়া গাছ রোপণ করিলে ঐ অনিষ্ট হর না। টবে বীজ রোপিত হইলে তাহার উপর অল্প করিয়া উলুখড় ছড়াইয়া দিতে হয়। খড়গুলি যেন মাটির উপর পড়িয়া থাকে। এই রূপ ভাবে টব প্রস্তুত হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে দিবসে ও রাত্রে রৌদ্র ও শিশিরে রাখিতে হইবে। এই নিয়মে বীজ বপণ করিলে প্রায় জল দিতে হয় না, কারণ টবের নিম্নস্থ আর্দ্র মৃত্তিকার রস উপরে সঞ্চারিত হইয়া বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গমের সহায়তা করিয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে আস্তে আস্তে উলুখড় সরাইয়া দেখা উচিত, মাটির অবস্থা কি প্রকার, যদি উহা অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হয়, তবে খড়ের উপর অল্প অল্প জল দিলে খড় হইতে সেই জল এরূপ ভাবে পড়িবে তাহা বীজের পক্ষে কোন অনিষ্টজনক হইবে না। উলুখড় ভিজিয়া যে জল পতিত হয় তাহা উহার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।

টবে চারা বাহির হইলে খড় তুলিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর চারা সকল পাঁচটী করিয়া পাতা ধরিলে, তখন উহা তুলিয়া পৃথক পৃথক স্থানে রোপণ করিতে হয়। মাটিতে য়্যাষ্টার ভালরূপ হয় না; এজন্য টবে রোপণ করাই সুনিয়ম। একফুট পরিমাণ টবে একটী চারা, দেড়ফুট টবে দুইটী চারা রোপণ করিলে চলিতে পারে। এক টবে ঘন করিয়া চারা পুঁতিলে ফুল ভাল হইবে না। চারা পাঁচটী করিয়া পাতা ধরিলে সাবধানের সহিত এক একটী চারা তুলিয়া অন্য টবে পুঁতিবে। যে টবে চারা পুঁতিবে, তাহা দোআঁশ মাটি তিন ভাগ এবং এক ভাগ পাতা-সার দ্বারা পূর্ণ করা উচিত। চারা রোপণ করিয়া মাটি ও গাছের অবস্থা দেখিয়া দুই এক দিন অন্তর জল দিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে টবের মাটি পাতলা অস্ত্র দিয়া আস্তে আস্তে খুসিয়া দিতে হইবে। বিশেষ সাবধানের সহিত খুসিয়া না দিলে শিকড় কাটিয়া যাইতে পারে।

সচরাচর চারা পুঁতিবার প্রায়দেড় মাসের মধ্যেই ফুল হইয়া থাকে।

যদি এই সময়ের মধ্যে ফুল না ফুটে, তবে অন্য একটী পাত্রে জল রাখিয়া সেই জলে গাছ সমেত টব বসাইয়া দিতে হইবে। উক্তপাত্রে এরূপ জল থাকা আবশ্যক, তদ্বারা যেন টবের অন্ততঃ তিন ভাগ ডুবিয়া থাকিতে পারে। এই রূপ অবস্থায় তিন চারি দিন রাখিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে। তাহার পর টবটী তুলিয়া স্থানান্তরে রাখিতে হইবে। চারা বড় হইলে তখন উহা সমস্ত দিন রৌদ্রে থাকিলে কোন অপকার হয় না।

য়্যাষ্টারের ফুল হইতে বীজ হইয়া থাকে, কিন্তু এদেশে যে সকল ফুল হয়, তাহার বীজে চারা করিলে ফুল ভাল হয় না। এজন্য বিদেশীয় বীজই ফুলের পক্ষে উপকারী। বিশেষ যত্ন করিয়া ফুল ও ফল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা যদি উপযুক্ত আকারের উৎপন্ন না হয়, তবে মনে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। এজন্য উৎকৃষ্ট বীজ সংগ্রহ করিয়া গাছ করা উচিত।

য়্যাষ্টারের একটী বিশেষ গুণ এই যে উহা ফুটিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত গাছে শোভা করিয়া থাকে। এক একটী গাছে ফুলও অনেক হয়। য়্যাষ্টারের গঠন চন্দ্রমল্লিকার সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে। চন্দ্রমল্লিকার ন্যায় উহার দল সমূহ ঘন সন্নিবেশিত এবং ক্ষুদ্র পরিসর বিশিষ্ট। ফুলের আকার গোলাকার, শীত কালে ফুলের যেরূপ সৌন্দর্য্য থাকে, শীত বিগমে সেরূপ থাকে না। গ্রীষ্ম কালে রৌদ্র প্রবল হইতে আরম্ভ হইলে গাছ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। সুগন্ধের জন্য য়্যাষ্টারের কোন আদর নাই, জেড়ুয়া ফুল মাত্রেরই গন্ধ নাই, কেবল শোভার জন্য উহার সমধিক আদর। বাগান ও বারেণ্ডা সাজাইতে এই সকল ফুল লোকের নিকট বিশেষ আদর পাইয়া থাকে।

আম্রে পোকা লাগার ঔষধ।

কৃষিতত্ত্বের বিজ্ঞাপনে দেখিলাম আম্রের পোকা নিবারণের অব্যার্থ উপায় কেহ আবিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে, সুগঙ্গ দুর্গাপুরের মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হইবেন।

এই পুরস্কারের প্রলোভনে অদ্যকার প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি না; কৃষিতত্ত্বের সম্মান রক্ষাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা, এক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, তাহাকে অব্যার্থ মহৌষধ বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ খানা সার্টিফিকিট দিয়া লোকের ভ্রম জন্মাইয়া, ব্যবসা সাধন করিতেছেন। আমরা সেইরূপ ব্যবসা করিতে বসি নাই। কোন অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট বিষয়, জানিতে হইলে নানারূপ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়। সেই নানাপ্রকার অনুসন্ধান দ্বারা যেটি অধিক ফলবতী হইয়াছে, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আধুনিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি এই যে, "যে কারণ হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, সেই কারণের ধ্বংশোপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করা" মূলোৎপাটন করিলে আর শাখা পল্লব থাকিতে পারে না। আমরা ইহাকে উত্তমযুক্তি বলিয়া স্বীকার করি। অথবা সকল চিকিৎসা শাস্ত্রেরমূলেই রোগের কারণ নির্দ্দেশকরা এবং তদোপযোগী ঔষধ প্রয়োগ করা বিধি রহিয়াছে। এই কারণ নির্দ্দেশ করা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বহুদর্শী সুশিক্ষিত লোকের কাজ। এই চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়মানুসারে "আম্রে পোকাধরার কারণ কি?" এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানবিশিষ্ট লোকের দ্বারায় বিশদরূপে হওয়া সম্ভবপর নহে, আম্রে পোকাধরা যদি সাধারণ নিয়ম হইত, তাহা হইলে সকল দেশেই উহা দেখা যাইত। কেবল পূর্ব্ববঙ্গ ভিন্ন আর কোথাও আম্রে পোকা দৃষ্টিগোচর হয় না, সুতরাং ইহার দ্বারায় একটী সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জল বায়ু মৃত্তিকার দোষে ঘাটিয়া থাকে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু এতো সন্তোষজনক উত্তর হইল না, ইহার দ্বারায় কার্য্য কারিতার উত্তর হয় না। জল বায়ু মৃত্তিকার, গুণাগুণের তারতম্য অবশ্য আমরা

অনেক সময় দেখিতে পাই বটে; যদি মনে করা যায় যে লবণাক্ত জল বায়ুর দোষে হয়, তবে কলিকাতা হুগলি প্রভৃতি স্থানের সহিত লবণাক্ত জল বায়ুর যতদূর নিকট সম্বন্ধ ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতির সঙ্গে ত সেরূপ সম্বন্ধ নাই। সেই সকল (কলিকাতা প্রভৃতি) স্থানে পোকা হয় না। ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানসমূহে পোকা হয় কেন? "যদি জলপ্লাবিত স্থানে পোকাধরে" তাহা হইলে পার্ব্বত্যস্থানের আম্রে পোকা ধরে কেন" বায়ুর উষ্ণতা যদি পোকা ধরার কারণ হইত, তাহা হইলে পার্ব্বত্য স্থানসমূহের নিকটস্থ স্থানেই সম্ভব, ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের অম্রে পোকা কেন? ইত্যাদি বহুবিধ আলোচনা করা যাইতে পারে।

এ সকল ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যেও এমনস্থান আছে যে, কেবল সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের অম্রে পোকা নাই। যথা—বিক্রমপুরের মধ্যে শোল অব নামক গ্রামের অম্রে পোকা হয় না অথচ তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের আম্রে পোকা হয়। হইতে পারে, কেহ বলিতে পারেন, সেই স্থানেও মৃত্তিকার ত এমন কোন উপকরণ আছে, যাহাতে পোকা জন্মিতে পারে না, এ সকল অল্পতর্ক, কিন্তু সে কারণ যে কি, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না সুতরাং এ অল্পতর্কের দ্বারায় কোন কাজ হয় না, তারপর আরও দেখুন একটি বৃক্ষে একই বৃন্তে এক সময় দুটী ফল ধরিয়া সুপক্ক হইয়াছে তাহার একটীতে কীট প্রবেশ করিয়াছে অন্যটীতে প্রবেশ করে নাই, ইহার কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, এ গুরুতর সমস্যার মীমাংসা আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানের আয়ত্ত নহে, প্রকৃতির কোন্ উপকরণের কোন্ সময় কি কারণে ন্যূনাতিরেকতা ঘটিয়া থাকে, কোন্ বস্তুর রূপান্তর কি বিকৃতি ঘটায় এ সমস্যার শেষ মীমাংসায় বিজ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন আজও সর্ব্বস্থলে প্রশ্নের উত্তর করিতে স্বক্ষম হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না; একজন উত্তম রসায়ণ-বিদ সুপণ্ডিতেরও এই গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিতে বহুকালের বহুযত্নে সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন।

অনেক মতে কারণ নির্দ্দেশ না হইলেও কেবলমাত্র রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আমরাও সেই মতাবলম্বনে আম্রের পোকা নিবারণের ব্যবস্থা বলিতেছি। পূর্ব্বে কৃষিতত্ত্বে আম্রনামক

প্রবন্ধে, আমরা ইহার আংশিক আলোচনা করিয়াছিলাম, অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়াছে যে সকল বৃক্ষের বাল্যাবস্থায় ফলে পোকা ধরে নাই, ক্রমে বার্দ্ধক্য অনুসারে পোকার আধিক্য হইয়া থাকে; বোধ হয়, ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এজন্য বৃক্ষের নূতনত্ব রক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। প্রতিবৎসর ফল পাকিয়া নিঃশেষ হওয়ার পরই বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা পল্লব সকল তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারায় কাটিয়া দিতে হয়। প্রতি বৎসর না হউক, অন্ততঃ একবৎসর পর একবৎসর দিলেও ক্ষতি নাই, প্রতি বৎসর কর্ত্তন করিলে বৃক্ষে অপেক্ষাকৃত ফল কম হয়; কিন্তু কম হইলেও স্বাদ উত্তম হয় এবং আকার ছোট হয় না। আশ্বিন মাসে বৃক্ষমূলের মৃত্তিকা খনন করিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়, (বৃক্ষমূল শব্দে) কেবল মূল শিকড়ের নিকটবর্ত্তী স্থান বুঝিতে হইবে না, বৃক্ষ শিকড়ের অগ্রভাগ সকল যতদূর বিস্তৃত হইয়া থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। বৃক্ষ শিকড়ের দৃঢ় অংশ দ্বারায় রস আকর্ষিত হয় না, কোমলাংশ দ্বারায় রস আকর্ষিত হয়, সুতরাং সেই কোমলাংশ পর্য্যন্তের মৃত্তিকা খনন করিয়া দূরে দেওয়া উচিত, যেন পুনরায় এই মৃত্তিকা বৃক্ষমূলে না দেওয়া হয়। এইরূপে মৃত্তিকা তুলিয়া প্রথমতঃ তিন দিন জল দিতে হয়, পরে বৃক্ষমূল অনাবৃতভাবে অন্যূন এক সপ্তাহ অনধিক দুই সপ্তাহ রাখিয়া রৌদ্র এবং বায়ু লাগিতে দিতে হয়, এই অবকাশে অতি উত্তম পরিস্কার হাল্‌কা পলি মাটী চূর্ণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এই নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে এই চূর্ণীকৃত মৃত্তিকার দ্বারায় গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিয়া একভাগ কারবলিক এসিডের সঙ্গে দশভাগ জল মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষমূলে দিতে হয়। এই সময় হইতে মুকুল হইবার সময় পর্য্যন্তের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এক বার এবং মুকুলিত হইবার প্রাক্‌কালে একবার, এইরূপে জল দিতে হয়, বৃক্ষের মুকুল সকল প্রস্ফুটিত হইলে একভাগ কারবলিক এসিডের সঙ্গে বিশভাগ জল মিশ্রিত করিয়া, পিচকারির দ্বারায় এই মুকুলে ছিটাইয়া দিতে হয়, অম্রের গুটি সকল একটু বড় হইলে আর একবার এবং সুপক্ক হইবার পূর্ব্বে একবার ঐ রূপে দিতে হয় তাহা হইলে পোকা নিবারণ হইবে।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর বিধির্মত যত্ন করিলে, তদপরে মুকুলের সময় এবং সুপক্ক হইবার সময়, এই দুইবার পিচকারি দিলেই হইবে।

তাহার পর তিন বৎসরান্তে কেবল শাখাপল্লব ছাটিয়া দেওয়া, আর মৃত্তিকা পরিবর্ত্তন করা, তবে আর কখনও সে বৃক্ষের ফলে পোকা ধরিবে না। যেমন কোন স্থানে ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিলে সহসা দূরীভূত হয় না এবং নানাবিধ উপায় দ্বারা জল বায়ুর দোষ দূর করিতে হয়, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আম্রের পোকাও ম্যালেরিয়ার ন্যায় হইয়াছে। ইহা একটু দীর্ঘকালের যত্নের আবশ্যক, যদিও আমাদের এই চিকিৎসা প্রণালীর ফল দীর্ঘকাল পরীক্ষা না করিলে নিশ্চয় হইতেছে না, কিন্তু তত্রাপি প্রথম বৎসরেও অনেক সপ্রমাণ হইবার কথা, যদি প্রথম বৎসরের চেষ্টায় (যে বৃক্ষের অর্দ্ধেক অম্র পোকা ধরিত সেইস্থলে একচতুর্থাংশ পোকা ধরে) একশত বৃক্ষের মধ্যে যদি পঞ্চাশটিও এইরূপ হয় তত্রাচ হতাশ না হইয়া সফল মনে করা উচিত, পর বৎসর অধিক যত্নসহকারে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

উপসংহার কালে রাজাবাহাদুরকে আমরা এরূপ অনুরোধ করিলে বোধ হয় অনুচিত হয় না যে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রমাণীত হইলেও পূর্ণ না হৌক পুরস্কারের কতকাংশ কৃষিতত্ত্বের সাহার্য্যার্থে প্রদান করা উচিত।—

শ্রীশশীভূষণ গুহ

সিঃ কঃ বেঃ কোঃ

ইনেস্পেক্টর

অফলন্ত নারকেল গাছ।

নারিকেল রোগণ প্রণালী ইতিপূর্ব্বে কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু অফলন্ত অর্থাৎ বাঁজা গাছে কি প্রকারে ফল জন্মাইতে পারা যায়, তদ্‌সম্বন্ধে আমাদের জনৈক পত্র প্রেরক যে নিয়ম লিখিয়াছেন, পাঠক বর্গের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা লিখিত হইল। নিয়মটী আমরা পরীক্ষা করি নাই, যাঁহাদিগের অফলন্ত নারিকেল গাছ আছে, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন ইহা আমাদের একান্ত অনুরোধ।

মৃত্তিকা ও জল বায়ুর প্রকৃতি অনুসারে যে গাছে ফল ধরিয়া থাকে তাহা

বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এক জাতীয় ফল সকল দেশে সমান জন্মায় না। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ নারিকেল জন্মিয়া থাকে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সেরূপ হয় না। অনেক স্থানে গাছ পুঁতিলে তাহা বাড়িয়া উঠে না। পাতা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া গাছ নিস্তেজ অবস্থায় থাকে। যদিও দীর্ঘকাল বিশেষ যত্ন করিলে গাছ বড় হইয়া উঠে, তাহা আবার ফলিতে দেখা যায় না। লোনা স্থানে নারিকেল ভাল হইয়া থাকে। স্থান ভেদে উহার আস্বাদও ভিন্ন প্রকার হয়।

নারিকেল সচরাচর তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সাদা, লাল এবং সবুজ বর্ণের। ইহাদের মধ্যে সবুজ বর্ণের নারিকেলই অধিক দেখা যায়। সাদা ও লাল বর্ণের নারিকেলের সংখ্যা অল্প। এদেশে ইহাদিগকে সাদা বামন ও লাল বামন কহিয়া থাকে। নারিকেল কেবল যে খাদ্যে ব্যবহার হয় এরূপ নহে। উহা দ্বারা বহুবিধ দৈবকার্য্য হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্রে নারিকেল অতি পবিত্র ফল। কুশ পুত্র প্রভৃতি কার্য্যে সাদা নারিকেল লাগিয়া থাকে। এজন্য উহার আদর অধিক। নারিকেলের বর্ণভেদে উহার গুণেরও প্রভেদ আছে। বৈদ্য শাস্ত্রে নারিকেল অতি উপকারী ফল, উহা অনেক ঔষধে লাগিয়া থাকে। নারিকেলের এক এক অবস্থায় এক এক গুণ। নারিকেলের প্রথম অবস্থাকে ডাব ও শেষ অবস্থাকে ঝুনা কহে। খাদ্যের পক্ষে প্রথমবস্থা উত্তম। ঝুনাবস্থা অধিক আহার করিলে উদরের পীড়া হইয়া থাকে, কারণ তখন উহাতে তৈলের সঞ্চার হয়, তৈল অতিশয় দুষ্পাচ্য পদার্থ। এজন্য ঝুনা নারিকেল অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে।

নারিকেলের বিশেষ গুণ এই যে উহা বার মাসই ফলিয়া থাকে। গৃহস্থের পক্ষে নারিকেল অতি উপাদেয় ফল। নারিকেল দ্বারা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। খাদ্য ভিন্ন উহার তৈলে বিস্তর আয় হইয়া থাকে। নারিকেলের কোন অংশ বৃথা নষ্ট হয় না। সকল অংশই কাজে লাগিয়া থাকে। নারিকেলের ছোবড়া অর্থাৎ আঁশে দড়ী, গদি, পাপোশ, খোলে হুঁকা এবং শস্যে খাদ্য ও তৈলে আয় হইয়া থাকে। এদেশে যত প্রকার ফল আছে, তন্মধ্যে নারিকেল অতি উপকারী। ঝুনা নারিকেলের শস্য হইতে

দুগ্ধের ন্যায় যে এক প্রকার দ্রব্য বাহির হয়, তাহা জ্বাল দিলে উৎকৃষ্ট নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সচরাচর বাজারে যে নারিকেল তৈল বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাতে নানাবিধ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে, এজন্য ঔষধ প্রস্তুতের পক্ষে তাহা তত সুবিধাজনক নহে। কোন ঔষধে নারিকেল তৈলের আবশ্যক হইলে তাহা স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া লইলে ভাল হয়। ঘরে প্রস্তুত তৈলে কোন প্রকার দুর্গন্ধ থাকে না।

তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে সুপক্ক অর্থাৎ উত্তম ঝুনা নারিকেলের শস্য কুরিয়া পরিস্কার কাপড়ে তাহা নিংড়াইয়া লইতে হয়। নিংড়াইলে যে দুগ্ধবৎতরল পদার্থ বাহির হইবে, তাহা কটাহে কিম্বা অন্য কোন পাত্রে রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। শস্যে যতক্ষণ দুগ্ধ বাহির হইতে পারে তাহা লওয়া আবশ্যক, সহজে যদি দুগ্ধবাহির না হয় তবে উহাতে অল্প পরিমাণে জল দিয়া চটকাইয়া পুনর্ব্বার কাপড়ে নিংড়াইলে দুগ্ধ বাহির হইতে পারে, যখন দেখিবে আর দুগ্ধ বাহির হয় না, তখন ঐ সিটি ফেলিয়া দিতে হয়। নারিকেল কুরিয়া অধিক বিলম্বে তাহা নিংড়াইলে ভাল দুগ্ধ বারি হয় না, বিশেষ শীত কালের প্রাতে কিম্বা অপরাহ্নে অধিক্ষণ নারিকেল কুরিয়া রাখিলে দুগ্ধ তাহার গায়ে জমিয়া যায়। এজন্য উহা শীঘ্র নিংড়াইয়া লওয়া ভাল। এই দুগ্ধ অল্পে অল্পে জ্বাল দিতে হয়। জ্বাল দিতে আরম্ভ হইলে, উহার জলীয় ভাগ ফেনার আকারে উপরে ভাসিতে থাকে, এবং কিয়ৎক্ষণ উত্তাপে থাকিলে সেই জলীয় অংশে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। জলীয় অংশ পৃথক হইলে, কটাহে তৈল দেখাযায়। মাখন ও দুগ্ধের সর যেমন হিসাবে জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়, নারিকেল তৈলও সেই নিয়মে প্রস্তুত করিতে হয়। অধিকক্ষণ তৈল জ্বালে থাকিলে খরিয়া যায়। কোন প্রকার সুগন্ধ বিশিষ্ট করিতে হইলে, এই অবস্থায় গন্ধ দ্রব্য তৈলে দিতে হয়। অধিক তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে তাহা স্বতন্ত্র নিয়মে করিতে হয় নারিকেল তৈল অত্যন্ত উপকারী, উহা দ্বারা সাবান বাতি এবং নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল যেরূপ উপকারী গাছ, তাহা অফলন্ত হইলে মনে বড় কষ্ট হয়। কোন কোন গাছে আদবে ফল হয় না। অবার কোন কোন গাছ

অধিক দিন অন্তর ফলিয়া থাকে। কোন্ গাছ কি কারণে যে অফলা হয় তাহা স্থির করা বড় কঠিন।

যে সকল গাছ অফলা বা বাঁজা হয়, সেই গাছের গোড়ার মাটি তুলিয়া সমুদায় শিকড় বাহির করিতে হয়। গোড়ার চারি পাশের শিকড় বাহির হইলে মূল শিকড় সমূহ মাটির মধ্যে থাকে, গাছ তাহার উপর দঁড়াইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় দুই একদিন আলগা শিকড় বাতাস খাইলে শেওলা (গাঁজ) দ্বারা উহার কিয়দংশ ঢাকিয়া দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায়। কিছুদিন থাকিলে গাঁজ সকল মাটির সঙ্গে মিশিয়া রূপান্তরিত হইবে, গাছের গোড়ায় গাঁজ সকল কতক অংশ মাটির আকারে রূপান্তরিত হইলে পুনর্ব্বার তাহার উপর গাঁজ দিতে হইবে। এই নিয়মে তিন চারি মাস গাছের গোড়ায় গাঁজ দিলে তাহার অফলন্ত দোষ ঘুচিয়া যাইবে। তখন তাহাতে নারিকেল ধরিতে আরম্ভ হইবে।

এই নিয়মটী দ্বারা নারিকেল ও তালজাতীয় গাছের পক্ষেই উপকার হইতে পারে। অন্যান্য অফলন্ত গাছের পক্ষে কতদূর উপকারী কি না তাহা পরীক্ষা করা হয় নাই। আমাদের সংবাদ দাতা বলেন তিনি কেবল নারিকেল গাছে এই প্রক্রিয়া দ্বারা ফল লাভ করিয়াছেন।

জাম।

এদেশে দুই প্রকার জাম দেখিতে পাওয়া যায়, গোলাপ জাম ও কাল জাম। গোলাপ জাম অপেক্ষা এদেশে কাল জামের গাছ অধিক। জাম অতি সুখাদ্য ফল। উহার আস্বাদন অনেকেই অবগত আছেন। এক একটী গাছে প্রচুর ফল ধরিয়া থাকে। গোলাপ জাম অপেক্ষা কাল জামের আস্বাদন পৃথক। জামের গাছ আম কাঁঠালের গাছের ন্যায় অতি বৃহৎ হইয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠদ্বারা অনেক কার্য্য হয়, এজন্য ফল বিক্রয় ব্যতীত জামের কাটেও বিস্তর আয় হইতে পারে।

জাম অতি পাচক ফল। জামের পাতাদ্বারা অনেক ঔষধের কার্য্য হইয়া থাকে। রক্তামাশায় জামের পাতার রস, ছাগ দুগ্ধদ্বারা সেবন করিলে আরাম হইয়া থাকে।

জাম বৎসরের মধ্যে একবার ফলিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে জাম পাকিতে আরম্ভ হয়। বীজ রোপণ করিলে জামের চারা হইয়া থাকে, যেরূপ মাটিতে আম্র জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ মৃত্তিকা জামের পক্ষে উপকারী। অন্যূন পাঁচ ছয় বৎসরে জামের ফল হইয়া থাকে। আম, জাম, নিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষ সমূহের রোপণ ও পাইট প্রায় একরূপ। বীজ ভিন্ন কলমেও জামের চারা হইয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর লোকে বীজের চারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। বীজ হইতে চারা করিতে হইলে, বাগানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিলে চলিতে পারে। চারার অবস্থায় ভাল করিয়া ঘিরিয়া রাখা উচিত; কারণ পশ্বাদিতে চারার পাতা খাইলে, গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে। চারার গোড়া খুঁড়িয়া বৎসরান্তে এক একবার সার দিলে বিস্তর উপকার হয়। যে কোন উদ্ভিদের পক্ষে সার প্রদান অতীব আবশ্যক। সার উদ্ভিদ্‌গণের পুষ্টিকর খাদ্য। প্রাণিগণ যেমন পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলে হৃষ্টপুষ্ট এবং তেজস্কর হইয়া উঠে, সেই রূপ সার উদ্ভিদদিগের পক্ষে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। আমাদের দেশে জাম প্রভৃতি অনেক ফল বৃক্ষের মূলে সার দেওয়ার রীতি নাই। সচরাচর যেরূপ আকারে ফল হইয়া থাকে,

নিয়মিতরূপ সার এবং উপযুক্ত পাইট করিলে ফলের যে আকার বড় হইয়া থাকে তাহা বলা বাহুল্য। এদেশে বৃক্ষাদির উন্নতি সম্বন্ধে কোন উপায় অবলম্বন করা হয় না। মাটির গুণে যাহা ফলিয়া থাকে, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি। কিন্তু পাইটাদির সুবন্দোবস্ত করিলে যে কৃষিজাত দ্রব্যের উন্নতি হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করা উচিত। আমাদের দেশ অপেক্ষা ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় এই সকল বিষয়ে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এদেশেও ফল বৃক্ষ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

জামের গুটি কলম হইতে পারে। যে নিয়মে লিচুর কলম প্রস্তুত করিতে হয়, এবং কৃষিতত্ত্বে তদ্‌সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, সেই প্রণালী অনুসারে জামের গুটি কলম করিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এদেশে কাল জাম ও গোলাপ জাম দুই জাতীয় জাম জন্মিয়া থাকে। কাল জাম যে নিয়মে রোপণাদি করিতে হয়, গোলাপ জাম সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গোলাপ জামের ফল ধরিয়া থাকে। কাল জামের গাছ অপেক্ষা গোলাপ জামের গাছ ছোট এবং ফলের আস্বাদন সম্পূর্ণ পৃথক। গোলাপ জাম একটী সুখাদ্য ফল। এক একটী গাছে ফল যথেষ্ট হইয়া থাকে। মাটির দোষে অনেক স্থানের ফল মন্দ হয়, কাল জামের যে নিয়মে পাইট করিতে হয়, ইহারও পাইট সম্বন্ধে সেইরূপ নিয়ম।

বীজ ও কলম দুই উপায়েই গোলাপ জামের চারা হইতে পারে। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারায় শীঘ্র ফল ধরিয়া থাকে। সুপক্ক ফলের টাটকা বীজ চারার পক্ষে ভাল। বীজের দোষে যে বৃক্ষাদি মন্দ হইয়া থাকে তাহা অনেকে লক্ষ্য করেন না। বীজই উদ্ভিদ্‌দিগের জীবন, উহা যে পরিমাণে সুপক্ক ও পরিপুষ্ট হইবে সেই পরিমাণে তজ্জাত বৃক্ষাদিও তেজস্কর হইয়া উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিবে। উদ্যানকারী ব্যক্তিদিগের ইহা জানা আবশ্যক যে চারার ভালরূপ পাইট হইলে অল্প দিনের মধ্যেই ফল ধরিয়া থাকে, এমন কি অনেক গাছ তিন চারি বৎসরের মধ্যে ফলিতে দেখা গিয়াছে। দোঁআশ মাটিতে গোলাপ জাম ভাল হইয়া থাকে। চারার অবস্থায় গ্রীষ্মকালে প্রতি

দিন গাছে জল দিলে উপকার হয়। বৎসরান্তে এক একবার গাছে সার দিলে চারা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে।

আম্র যেমন এক সময়ে পাকে না, বৈশাখ মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত পাকিয়া থাকে। সেইরূপ ফাল্‌গুন মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ফল পাকিতে আরম্ভ হয়। গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ হইলে দশ বার দিনের মধ্যেই প্রায় শেষ হয়ইা যায়। তবে গাছ বিশেষে ফল পাকিতে অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। আম যেমন কাঁচা খাওয়া যায়, জাম সেরূপ অপক্ক অবস্থায় খাইবার উপযুক্ত হয় না। সকল বৎসর জাম সমান ফলে না। গাছের বয়স অধিক হইলে ফল অল্প ধরিতে আরম্ভ হয় এবং ফলের স্বাদ অন্যরূপ হইয়া থাকে। এজন্য প্রাচীন গাছ কাটিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে নূতন চারা রোপণ করা ভাল।

কাল জাম ও গোলাপ জামের গাছ দেখিতে একরূপ নহে। কাল জামের গাছ যেমন দেখিতে উচ্চে বড় হইয়া থাকে, গোলাপ জামের গাছ সেইরূপ উর্দ্ধে অধিক না বাড়িয়া চারিদিকে বিস্তৃত হওয়ায় দেখিতে অত্যন্ত সুশ্রী হয়।

কি কাল জাম কি গোলাপ জামের বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে একটী স্থানে অন্যূন দেড় কিম্বা দুই হাত একটী গর্ত্ত করিয়া সেই পরিমাণে পরিসর করিতে হইবে। গর্ত্তের সমুদায় মাটি তুলিয়া গোবর কিম্বা অন্য কোন রকম সার, মাটির সহিত মিশাইয়া পুনর্ব্বার উহা পূর্ণ করিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে গর্ত্তের মাটি শুকাইলে, তাহা জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। বীজ রোপণে অন্ততঃ তিন চারি মাস পূর্ব্বে এইরূপ নিয়মে মাটি প্রস্তুত করিতে হইবে।

অনন্তর গাছ—পাকা ভাল ফলের বীজ সেই স্থানে রোপণ করিলে, শীঘ্রই বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইবে। চারার গোড়ার মাটি শুষ্ক হইলে আবশ্যক মতে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণে জল দিলে চারার পক্ষে উপকার হয়। চারার গোড়ার মাটি আঁটিয়া গেলে তাহা খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে দিন যে কোন চারার গোড়া খুসা হয়, সে দিন তাহাতে জল দেওয়া অনাবশ্যক। এইরূপ অবস্থায় চারা বড় হইলে তাহা তুলিয়া বাগানে রোপণ

করিতে হয়। যে স্থানে গাছ রোপিত হইবে, তথায় যেন উত্তমরূপ রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পায়। রৌদ্র ও বাতাস ভাল রকম না পাইলে গাছ বাড়িবার পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। চারা তুলিবার সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহা উঠাইতে হয়। চারার গোড়ার মাটি সমেত শিকড় তুলিবে। পাশের সোরু সোরু শিকড় দুই একটী কাটিয়া গেলে বিশেষ কোন হানি হয় না, কিন্তু মূলশিকড় কাটিয়া গেলে গাছের বিশেষ ক্ষতি জনক হয়। যে নিয়মে বীজ পুঁতিতে হয়, চারা পুঁতিবার পক্ষেও সেই নিয়ম অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপ মাটি প্রস্তুত করিয়া গাছ রোপণ করিলে অত্যন্ত উপকার হয়। পুস্করিণী খনিত হইলে তাহার পাড়ে যে পুকুরের সার মাটি পড়ে তাহাতে গাছ রোপণ করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র চারা বাড়িয়া ফল প্রসবের উপযুক্ত হয়।

যে কোন গাছ ঘন করিয়া রোপণ করা অনুচিত। গাছ ঘন হইলে পাশে বাড়িতে পারে না, উপরের দিকে সোরু হইয়া উঠে এবং অন্যান্য গাছের ডালে পরস্পর ঘসা ঘসি হইয়া ফল ধরিবার ব্যাঘাত করে। গাছের চারি দিকে ফাক থাকিলে উত্তমরূপ হাওয়া ও তাপ লাগিয়া গাছের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। এজন্য যাহাতে গাছের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে তদ্‌পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া উহা রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

জাম অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বর্ত্তমান আছে। ইহা ভারতবর্ষের আদিম গাছ। এদেশ হইতে অন্যান্য দেশে জাম নীত হইয়াছে। অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে জামের নাম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

জামরুল।

(Jambosa alba)

আজ কাল বাঙ্গালাদেশে অনেকের বাগানে এই ফলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। জামরুলের গাছ প্রায় আম, কাঁঠাল এবং জামের গাছের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। পাতার গঠন কতক বাদামপাতার ন্যায় লম্বা ও চেওড়া। জামরুল গাছ দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইহার কাষ্ঠ তত মূল্যবান নহে, ফল বিক্রয় দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। জামরুল খাইতে তত সুখাদ্য ফল নহে। ফলে জলীয় ভাগ অধিক। ফলের আকার মাঝারি রকম। জামরুল দেখিতে সাদা, উজ্জ্বল, এবং মোমের ন্যায় চাকচিক্য। ভারত সাগরীয় দ্বীপ শ্রেণী জামরুলের আদিম জন্ম স্থান। তথা হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। সাদা জামরুল ভিন্ন লাল জামরুল নামে আর এক জাতীয় জামরুল আছে, তাহা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে জন্মিয়া থাকে, উহা এই দেশের ফল।

জামরুল বিচি ও কলম দুই উপায়েই গাছ হইতে পারে। কিন্তু এদেশে সচরাচর কলমে চারা প্রস্তুত করিয়া থাকে। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের গাছে শীঘ্র ফল ধরিয়া থাকে। দুই তিন বৎসরে গাছে ফল ধরে। এদেশে যে সকল জামরুল হইয়া থাকে, তাহাতে বীজ প্রায়ই হয় না। যদিও সামান্যাকারে বীজ হইয়া থাকে, তাহা হইতে আবার সহজে চারা হয় না। এজন্য ফলের পক্ষে কলমের গাছই প্রশস্ত। জামরুলের কলম করিতে হইলে ভালরূপ তেজস্কর সরল ডালে গুটি কলম বাঁধিতে হয়। যে ডালে কলম বাঁধা হইবে, তাহা অগ্রে ঠিক করিয়া রাখা উচিত। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে সেই ডালের চারি কিম্বা ছয় আঙ্গুল পরিমাণ স্থানের নিম্ন ও উর্দ্ধে গোল করিয়া ছালের উপর দাগ দেও। ডালের নীচে এবং উপরে দুইটী গোল দাগ দেওয়া হইলে উপরের দাগ হইতে নীচের দাগ পর্য্যন্ত লম্বাভাবে চিরিয়া সেই স্থানের সমু-

দায় ছাল তুলিয়া ফেলিবে। এরূপ হিসাবে ছাল তুলিতে হইবে যেন ছুরীর অগ্রভাগ কাষ্ঠে বিদ্ধ না হয়। কাষ্ঠে গুরুতর আঘাত লাগিলে, কলমের পক্ষে অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত কলম বাঁধিতে হয়। অনন্তর এই ছাল তুলা স্থানে ভালরূপ সার মাটি কাদা করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। এই মাটি যেন খুব পাতলা না হয়, আঠা আঠা ভাবে কাদা হইবে। কাদা এরূপ ভাবে দিবে যেন তদ্দ্বারা সমুদায় স্থান ঢাকিয়া যাইতে পারে। কাদা দেওয়ার পর তাহার উপর হয় চট কিম্বা নারিকেল ছোবড়া দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। কলম বাঁধার পর যদি বৃষ্টি না হয়, অধিক রৌদ্র হইতে থাকে, তবে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দিতে হইবে। সর্ব্বদা জল সেচনে সেই জড়িত স্থান হইতে সূত্রবৎ শিকড় সকল নির্গত হইবে। যখন দেখিবে চারিদিকে শিকড় নামিয়াছে তখন সেই ডাল কাটিয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিতে হইবে। দোআঁশ মাটিতে জামরুল ভাল হইয়া থাকে। বাগানে গাছ পুঁতিয়া গ্রীষ্ম কালে তাহাতে প্রতি দিন অল্প অল্প জল দিলে উহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠিবে। বর্ষা আরম্ভ হইলে গাছে জল দেওয়া বন্দ করিতে হইবে, বর্ষাকালে চারা গাছ মাত্রেই গোড়া বাঁধিয়া অর্থাৎ মাটির দ্বারা গোড়া উঁচু করিয়া দিলে ভাল হয়। বর্ষাকালে চারা গাছের মূলে অধিক পরিমাণে জল বসিলে মাটি অধিক স্যাঁতা বশতঃ গাছ পচিয়া যাইতে পারে। গোড়ার মৃত্তিকা অধিক আর্দ্র থাকিলে কেঁচ প্রভৃতি কীট জন্মিয়া শিকড় নষ্ট করিয়া দেয়, চারা গাছের মূলে ঐরূপ কীট হইলে, গাছের পাতা কুঁকড়াইয়া যায়, এবং দিন দিন গাছের তেজ হ্রাস হইয়া তাহার জীবন নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য বর্ষাকালে চারা গাছ মাত্রেই গোড়া এরূপ ভাবে বাঁধিয়া দিতে হয়, যেন বৃষ্টি হইবামাত্রেই জল গড়াইয়া দূরে পতিত হয়। যে কোন ফল গাছের মূলে ঘাস মুথা প্রভৃতি জঙ্গল হইতে না দেওয়া আবশ্যক। কারণ গাছের গোড়ায় জঙ্গল হইলে ফলের অপকার সাধন করে। এজন্য সর্ব্বদা তাহা পরিষ্কার রাখিতে হয়। অনেকেই বড় গাছের কোন পাইট করিতে মনোযোগ করেন না। কিন্তু উদ্যানকারীর ইহা মনে রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য যে, গাছ যে পরিমাণে পরিপুষ্ট এবং সার প্রাপ্ত হইবে, তাহার ফলও সেই পরিমাণে বৃহৎ আকারের এবং সুস্বাদু হইতে

থাকিবে। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হয়, উদ্ভিদ্‌দিগের সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক। গাছের গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিবে, গাছে বাতাস ও তাপ নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইবে এবং বাগানের গাছ সমূহ যেন পরস্পর শাখায় ঘসা ঘসি হইতে না পারে তদপক্ষে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। যত্নের তারতম্যানুসারে বৃক্ষের উন্নতি অবনতি হইয়া থাকে। কি চারা কি বড় গাছ প্রতি বৎসর তাহাতে সার দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে চারা গাছের বিষয় একটু বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ ছোট চারায় অধিক সার দিলে গাছের উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট-জনক হইয়া থাকে। কারণ চারা গাছে অধিক সার প্রদত্ত হইলে, তাহার স্বাস্থের পক্ষে অপকার করিয়া তুলে, অতি ভোজন যেমন আমাদের শরীরের অনিষ্টকারী, সেইরূপ খাদ্য স্বরূপ অতিরিক্ত সার উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষে অহিত-কারী। অধিক বয়স্কগাছ হইলে, সারের ভাগ কিছু বেশী পড়িলে, তত ক্ষতিজনক হয় না। কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিয়া বাতাস ও তাপ খাওয়াইতে হয়। তদনন্তর সার মাটি তাহার গোড়ায় দিয়া উহা বাঁধিয়া দিতে হয়। এদেশে বৃক্ষ মূলে সাধারণতঃ গোবরের সার দিয়া থাকে। জন্তুসার প্রভৃতি অন্যান্য সার অনেক ফলবৃক্ষের পক্ষে অত্যন্ত পুষ্টিকর। ইউরোপে অস্থিসার, মৎস্য সার, বিষ্ঠাসার ইত্যাদি বহুবিধ সার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এদেশে সার ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন কৃষিকার্য্য বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসারে প্রচলিত না হইবে ততদিন কৃষিজগতে উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। সকল কার্য্যেই শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে এক একটী নিয়ম আছে, সেই নিয়ম গুলি যে পরি-মাণে অবলম্বিত হইবে, সেই পরিমাণে যে কৃষিকার্য্য সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে থাকিবে তাহা বলা বাহুল্য।

জামরুল গাছের বিশেষ কোন পাইট করিতে হয় না। সাধারণ বৃক্ষাদির যেরূপ পাইট করিতে হয়, ইহারও সেই নিয়মে পাইট করা উচিত। বাড়ীতে একটী গাছ হইলে, তাহার ফলে একটী গৃহস্থের ব্যবহারযোগ্য ফলের সংকুলান হইতে পারে। এক একটী গাছে যথেষ্ট ফল ধরিয়া থাকে এবং গাছও অনেক দিন পর্য্যন্ত ফল প্রসবের উপযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।

পৌষ ও মাঘ মাসে জামরুলের ফুল হইয়া থাকে বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠে, জামরুল কাঁচা অবস্থায়ও ব্যবহার হয়, তখন উহা বিস্বাদু বোধ হয় না। গৃহস্থ মাত্রেই মনে করিলে এই ফলবৃক্ষের গাছ স্ব স্ব আবাসে রোপণ করিয়া ফল ভোগ করিতে পারেন। জামরুলের চারার মূল্য অধিক নহে। এদেশে বাজারে যেরূপ নিয়মে এই ফল বিক্রয় হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আয়ও নিতান্ত অল্প হয় না। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহর অঞ্চলে যে উহার মূল্য অধিক তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। অতএব দেশমধ্যে অধিক পরিমাণে জামরুলের গাছ হইলে ফল বিক্রয় দ্বারা অনেকের উপকার হইতে পারে। কলম করিবার নিয়ম জানা থাকিলে, প্রতি বৎসরে অনেক কলম প্রস্তুত হইতে পারে। কলম ও ফল দুইটীই বিক্রয়োপযোগী, অতএব জামরুল গাছে লাভ ভিন্ন লোকসানের কোন সম্ভাবনা নাই।

কার্পাস।

আজ কাল কার্পাসের যেরূপ আদর, ইহার চাষে উন্নতি করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। ভারত ভূমি কার্পাস চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। উৎকৃষ্ট রীতি অনুসারে ইহার চাষ করিতে পারিলে, আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। কার্পাস এদেশের পক্ষে নূতন চাষের জিনিস নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ইহার চাস হইয়া আসিতেছে। যখন ইয়ুরোপপ্রভৃতি পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ সকল সম্পূর্ণ অসভ্য ছিল, বস্ত্রের ব্যবহার জানিত না, তাহার পূর্ব্ব হইতে এদেশে তুলাজাত বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। ভারতীয় অতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে তুলার কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য কার্পাস জাত বস্ত্র দেখিয়া ইয়ুরোপ-বাসীরা বলিতেন ভারতের গাছে কাপড় হয়। অর্থাৎ ভারতজাত কার্পাস তুলা হইতে বস্ত্র বয়ণ প্রথা অন্য কোন জাতি জানিত না। ভারত অন্যান্য জাতি সমূহকে বস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই ভারতে তুলার চাষ এবং বস্ত্র বয়ণে লোকের যারপর নাই অম-

নোযোগ হইয়াছে। ভারতীয় তুলা আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানীয় তুলার সমকক্ষ হইতে পারিতেছে না। এদেশে কার্পাসের এত হীনাবস্থার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার চাষে লোকের পূর্ব্বের ন্যায় আদর ও যত্ন নাই। এই যত্ন শৈথিল্য বশতঃ কার্পাসের এরূপ দূরবস্থা হইতেছে। এক্ষণে কার্পাসের চাষ সকল স্থানে দেখা যায় না, যে যে স্থানে চাষ হইয়া থাকে, তাহাও আবার উত্তম নিয়মানুসারে হয় না। কোন্ উদ্ভিদের চাষে কোন্ প্রকার সার দিলে অধিক ফল লাভ হয়, এদেশীয় কৃষকগণ তাহাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। প্রত্যেক উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুসারে যে ভূমিতে সার দিতে হয় এবং সেই সার দেওয়ার উপর যে উৎপন্নের হার বৃদ্ধি হয়, যত দিন পর্য্যন্ত কৃষকদিগের সেই জ্ঞান না হইবে এবং সেই জ্ঞানানুসারে চাষের ব্যবস্থা প্রচলন হইতে ব্যাঘাত হইবে, ততদিন এদেশে কৃষিকার্য্যের আদৌ উন্নতি হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কার্পাস চাষ যে প্রণালীতে হইতেছে এবং যে পরিমাণে উৎপন্নের হার বৃদ্ধি হইতেছে, সে নিয়ম অবগত হইয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে এদেশেও প্রচুর লাভ হইতে পারে। আমরা উদাহরণ স্থলে এই প্রস্তাবে ব্যবসায়ী হইতে কার্পাস চাস প্রণালী এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব যে কি নিয়মে চাষ করিলে এদেশে কার্পাস চাষের উন্নতি হইতে পারে।

বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাপড়ের কল হইতেছে। এদেশে এপর্য্যন্ত দুই একটী ভিন্ন কাপড়ের কল হয় নাই। উত্তম কার্পাসের অভাব তাহার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। বিলাতি কাপড় আমদানি হওয়া অবধি দেশী কাপড়ের আদর কমিয়াছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কার্পাসের চাষের ও অবনিত হইয়াছে। আবার ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশে ভাল কার্পাস জন্মে, তথায় সুতার ও কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। কৃষির সঙ্গে শিল্পের যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে না। এদেশে কাপড়ের কল হইলে সহস্র সহস্র লোকের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইবে। কিন্তু উত্তম কার্পাসের অভাবে কাপড়ের কলে অধিক লাভ হইবে না।

বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে কার্পাস জন্মে, ১৮৫৭ সালে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করেন। তাহাতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই

কার্পাস জন্মে। কিন্তু যাহা জন্মে, অধিকাংশ কৃষকেরা তাহা বিক্রী না করিয়া তাহা হইতে নিজের প্রয়োজনীয় কাপড় প্রস্তুত করিয়া লয়। সুতরাং বিদেশে তাহার অতি অল্প ভাগই রপ্তানি হয়। চট্টগ্রাম, নওয়াখালী, ত্রিপুরা, আসাম, দার্জিলিং, সিংভূম ও সুন্দরবন, এই সকল অঞ্চলে কার্পাসের উপযুপ্ত অনেক জমি আছে। যত্ন করিয়া চাষ করিলে তাহাতে উত্তম কার্পাস জন্মিতে পারে।

আমাদের দেশের কার্পাস কত অপকৃষ্ট, তাহা অনেকেই জানেন না। লণ্ডনে মিসর দেশের তুলার দাম ১।০ হইলে, আমেরিকার তুলার দাম ৸৶০ পনর আনা, বোম্বাই অঞ্চলের তুলার দাম ॥০ আট আনা, আর বঙ্গদেশের তুলার দাম ।৵০ ছয় আনা হইবে।

নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিলে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিতে পারে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে একদিন বা এক সপ্তাহ ভাল আহার করিয়া তাহা সংশোধন করা যায় না। সেইরূপ পুনঃ২ সার ভিন্ন চাস করাতে যে ভূমি প্রায় অনুর্ব্বরা হইয়াছে, এক বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ রূপ উর্ব্বরা হইবে না। আশানুরূপ ফল লাভের জন্য দুই তিন বৎসর বিলম্ব করিতে হইবে।

চাস। ধান, গোধূম প্রভৃতির একটী বিশেষ মূল শিকড় নাই। কিন্তু কার্পাসের তাহা আছে। এই শিকড়টী এদিক ওদিক না যাইয়া বর বর নীচের দিকে যায়, এবং সেই নিম্নভূমি হইতেই রস সংগ্রহ করে। সুতরাং এই মূল শিকড়ের বৃদ্ধি ও পরিপোষণের জন্য ভূমি গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। তাহা করিলে গাছ গুলি সতেজ ও সুশ্রী হয়, সুতরাং অধিক ফলও পাওয়া যায়। রিভেট কার্ণাক সাহেব বলেন যে গভীর কর্ষণ করিয়া বিঘায় ৸০ ত্রিশসের তুলা আর আমাদের দেশের রীতি অনুসারে চাস করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে বিঘায় ৵৮ মাত্র তুলা পাওয়া গিয়াছে।* গভীর কর্ষণ করিলে শিকড়ে অধিক সার সংগ্রহ করিতে পারে, কেবল তাহা নয়; আবার বৃষ্টি অল্প হইলে বৃক্ষের তত অনিষ্ট করিতে পারে না। যে রৌদ্রে অল্প কর্ষিত স্থানে কার্পাসের গাছ প্রায় দগ্ধ হইবে, কর্ষণ গভীর হইলে সেই ভূমিতেই রৌদ্রে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

কর্ষণ সমাপ্ত হইলে আলি বাঁধিয়া এই আলিতে বীজ রোপণ করিবে।

* see schrottky's principles of agricultnre P.275.

আমেরিকায় আলি গুলি আধ হাত উচ্চ করা হয়, আর তাহার মধ্যে ২।২॥ হাত ব্যবধান থাকে। আমাদের দেশে দুই আলির মধ্যে ১॥ কি ১৸ হাত ব্যবধান হইলেই যথেষ্ট। ইংরাজি লাঙ্গলে আলি বাঁধা অতি সহজ। যদি আধ হাত চাস করিয়া আধ হাত উচ্চ করিলে আলি বাঁধা হয়, তাহা হইলে এই আলিতে কর্ষিত মৃত্তিকা এক হাত হইবে। সুতরাং আধ হাত মাটী চাস করিলেও এক হাত চাসের ফল পাওয়া যাইবে। আলি করিয়া রোপণ করাতে এত লাভ।

বীজ। ভাল বীজ রোপণ করিলে যে ভাল ফল হয়, আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেরই সেই জ্ঞান আছে। কার্পাসের বড় ও দোষশূন্য পাকড়া (ফুটা) গুলি (Pod) বাছিয়া লইবে। পরে উহা হইতে বীজ বাহির করিবে। যে বীজ গুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিবে। যে বীজে কোন রূপ দোষ লক্ষিত হয়, তাহা রোপণ করিবে না। কেবল নির্দ্দোষ ও সতেজ বীজ গুলি রোপণ করিবে। তাহাতে যে কার্পাস পাওয়া যাইবে, উহা হইতে আবার পূর্ব্বোক্তরূপ যত্ন করিয়া নির্দ্দোষ ও সতেজ বীজ নির্ব্বাচন করিবে। যদি ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর এইরূপ করিয়া বীজ নির্ব্বাচন করা হয়, তাহা হইলে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিবে। সুতরাং উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত।

সার। তুলার বর্ণ সুন্দর ও উজ্জ্বল হইবে। তাহাতে ধুলা বালি ইত্যাদি কোন অপর পদার্থ থাকিবে না। সূত্র গুলি লম্বা ও শক্ত হইবে। যাহাতে কার্পাসের এই সকল গুণ হয়, সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করিবে।

ডাক্তার রয়েল গণনা করিয়াছেন যে পরিষ্কৃত তুলার শত ভাগে ০৯৩৭ অর্থাৎ এক ভাগেরও কম ভস্ম, আর কার্পাসের বীজের শত ভাগে ৩৯৩৬ অর্থাৎ প্রায় চারি ভাগ ভস্ম। সুতরাং তুলা অপেক্ষা কার্পাসের বীজে চারি গুণ ভস্ম। পূর্ব্ব বারে বলিয়াছি যে ভূমি হইতে পুনঃ২ শস্য জন্মাইয়া অদাহ্য ভাগ যত দূর করা হয়, ভূমি ততই অনুর্ব্বরা হইয়া পড়ে। বীজ সমেত কার্পাস বিক্রয় না করিয়া যদি কেবল তুলা বিক্রয় করা হয়, আর কার্পাসের বীজের খইল ক্ষেতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভূমির উর্ব্বরতার অতি যৎ সামান্য হ্রাস হইবে। কার্পাসের ভস্মে কি কি পদার্থ আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

	বীজের ভস্মের একশত সের		তুলার ভস্মের একশত সের
ফস্‌ফরিক অম্ল	১/৫।৶০	.....	॥০
চূর্ণ	॥৯৸/০	.....	॥০
পটাস	।৯।৶০	.....	১।২
গন্ধক অম্ল	/১৶১০	.....	/১॥৶০
লৌহ ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি	/৪।১০	.....	/৬।৶
	২॥০		২॥০

তিন শত সের কার্পাসের দুই শত সের বীজ ও এক শত সের তুলা হইবে। দুই শত সের বীজে আট সের ভস্ম, আর এক শত সের তুলায় এক সের ভস্ম হইবে। সুতরাং

	দুইশত সের বীজে	একশত সের তুলার	সমষ্টি
ফসফরিক অম্ল	/৩॥৶০	৶৫	/৩৸/৫
চূণ	/২ ৶০	৶৫	/১॥/৫
পাটস	/১॥/০	/॥১০	/২/১০
গন্ধক অম্ল	১৫	৫	/০
লৌহ, ম্যাগনেসিয়া ইত্যাদি	/।৶৫	১৫	।৶০
ভস্ম	/৮	/১	/৯

ভালরূপ চাস করিলে এক বিঘাতে ৬/০ মণ কার্পাস পাওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ঐ কার্পাসের বীজ রাখিয়া তুলা বিক্রী করিলে এক বিঘা হইতে এক সের মাত্র সার পদার্থ (ভস্ম) কমিবে। বোধ হয় আর কোনও শস্যে ভূমি হইতে এত অল্প সার পদার্থ দূর হয় না। কিন্তু যদি কার্পাস অর্থাৎ বীজ সমেত তুলা বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে ভূমি অতি ত্বরায় অনুর্ব্বরা হইবে, এবং উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করা প্রয়োজনীয় হইবে।

সকল প্রকার খৈলই কার্পাসের ভূমির সার। প্রতি বিঘায় ৩।৪৲ মণ হইলেই যথেষ্ট হইবে। খৈল ঢেঁকিতে বা অন্য প্রকারে চূর্ণ করিবে; পরে মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে। যত মাটী তত খৈল লইয়া এই দুয়েতে মিশাইবে। এই অবস্থায় এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে। তখন খৈল হইতে অত্যন্ত তাপ বাহির হইবে। পরে ঐ খৈলমাটী ক্ষেতে ছড়াইয়া দিবে।

বিলাতে সার দেওয়ার একটী সুন্দর প্রণালী আছে। প্রথমতঃ ইংরেজী লাঙ্গল দিয়া আলি করিয়া তাহার ব্যবহিত খাতে সার দেওয়া হয়। পরে লাঙ্গল দিয়া ঐ আলি ভাঙ্গিয়া দেয়। পূর্ব্বে যে স্থানে আলি ছিল, তথায় খাত হয়; আর যথায় খাত ছিল, তথায় আলি হয়। সুতরাং আলির নীচে সার থাকে; গাছের শিকড় বড় হইলে সারের জন্য অনেক দূর যাইতে হয় না। ছাই, গোবর সকলই উত্তম সার। তাজা (সদ্যঃ) গোবর ক্ষেতে দিবে না। তাহাতে নানা প্রকার পোকা জন্মিবে। গোবর কয়েক মাস রাখিয়া পচাইবে, পরে ক্ষেতে দিবে।

সোরাতে পটাস্‌ ও যবক্ষার অম্ল আছে। সুতরাং কার্পাসের জন্য প্রয়োজনীয়। বীজ বপণের সঙ্গেই সোরা দিবে। তাহা হইলে বৃক্ষ অতি সতেজে বৃদ্ধি হইবে। সোরাতে ডাল পাতা অধিক হয়। গলিত অস্থিচূর্ণে চূণ ও ফসফরিক অম্ল আছে। যে সকল বস্তুতে এই দুই পদার্থ নাই, কেবল তাহা আহার করিলে আমাদের শরীরের অস্থি পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। বঙ্গদেশে যে এখন ভালরূপ কার্পাস হয় না, মৃত্তিকায় অস্থি সারের অভাবই অনেকে তাহার কারণ বলিয়া গণনা করেন। সাল্‌ফুরিক এসিড দ্বারা অস্থিচূর্ণ গলিত না করিলে, তাহাতে আশু উপকার হয় না। প্রতি বিঘায় বিশসের সোরা ও দুই মণ গলিত অস্থিচূর্ণ বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। গলিত না করিয়া ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অধিক পরিমাণে দিতে হইবে।

বপণ। বর্ষার অবসান অথবা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসই বপণের উত্তম সময় বলিয়া বোধ হয়। এবিষয়ে প্রদেশ ভেদে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। যে প্রদেশে যে সময়ে বপণ করিবার রীতি আছে, বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহার অন্যথা করা উচিত নয়। ছাই, গোবর বা সোরা (Saltpeter)

অথবা এই সকলই একত্র জলে গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিবে, সোরাতে জল অধিক করিয়া দিতে হইবে। বীজ এই জলে একদিনের অধিক রাখিবে না। পরে প্রায় এক ঘণ্টাকাল রৌদ্রে দিয়া তাহা শুকাইবে। বীজগুলি অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া যেন না যায়। আলির উপরে ১ বা ১॥ হাত অন্তর ৪।৫ অঙ্গুল গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহাতে তিন চারটী বীজ রোপণ করিবে, এবং আল্‌গা মাটী দিয়া এই গর্ত্ত পুরিয়া ফেলিবে। চারার তিন চারিটী পাতা হইলেই তাহা পাতলা করিয়া দিতে হইবে। এক এক গর্ত্তে যতটী চারা হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুইটী সবল ও সতেজ চারা রাখিয়া অপর গুলি তুলিয়া ফেলিবে, আর যে স্থানে চারা হয় নাই, তথায় বসাইয়া দিবে।

বৃষ্টি হইলে আলির মাটী খাতে নামিয়া পড়ে। তখন কোদালি বা ইংরেজী লাঙ্গল দিয়া তাহা আলির পার্শ্বে ও উপরে তুলিয়া দিবে। নূতন চারাগুলি মাটিতে একেবারে ঢাকিয়া না যায়, তাহাতে দৃষ্টি রাখিবে। আর জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে কখনও ত্রুটি করিবে না। নতুবা ভূমির যে সারে কার্পাস গাছ বৃদ্ধি পাইত, তাহাতে আগাছার বৃদ্ধি হইবে। যদি ক্রমান্বয়ে ৩।৪ বৎসর চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে পরে ভূমি এত পরিষ্কার হইয়া আসে যে, তখন আগাছার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। বীজের সঙ্গে কখন আগাছার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। বীজের সঙ্গে কখন আগাছার বীজ বপণ করিবে না; তাহা হইলে নিজের শত্রু নিজে ডাকিয়া আনা হইবে।

অনেক সময়ে ফুল ও বীজ না জন্মিয়া অধিক পরিমাণে পাতা জন্মিতে থাকে। তখন শাখার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। তাহাতে সম্ভবতঃ অধিক ফুল ও বীজ জন্মিবে।

সংগ্রহ। কার্পাস ফুটিবামাত্রই তাহা সংগ্রহ করিবে। কারণ রৌদ্র ও শিশিরে তুলার অত্যন্ত অনিষ্ট করে। সংগ্রহকারীর সঙ্গে দুইটী থলিয়া থাকা উচিত। তাহার একটিতে ভাল পাকড়া (Pods) আর অন্যটীতে মন্দ পাকড়া (ফুটা) গুলি রাখিতে হইবে। ফুটিবার পূর্ব্বে কার্পাসের চারিদিকে যে আবরণ থাকে, সংগ্রহকালে তাহা কার্পাসের সঙ্গে না আসে, সেই বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হইবে।

এক বিঘা জমিতে কত কার্পাস জন্মিতে পারে, লোগিন নামে একজন ইংরেজ তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এই তালিকায় তাহা প্রকাশিত হইল। *

প্রদেশ পূর্ব্ববারের শস্য	গড়ে যতবার লাঙ্গল দিয়া চাস করা হয়	গড়ে যতবার জল সেচা হয়।	গড়ে যতবার নিড়ান হয়।	বপনের তারিখ।	প্রতি বিঘায় উৎপন্ন কার্পাস।	মণ ৫ হিসাবে কার্পাসের দাম।
সাহাবাদ গোধূম ও ঘাস	৪॥০	০	৩।০	৫ আষাঢ়	৪॥২	২২৸০
কর্ণুল	৪	৭	৫	১৫ জ্যৈষ্ঠ	৬॥৭	৩৩।৵০
ঐ	৪	৫	৪	১০ আষাঢ়	৪৸২॥	২৪/
দিল্লীর ৩৫ ক্রোশ উ গোধূম	২	২॥০	৪	১৪ আষাঢ়	৩/৯	১৬৵
" ৫০ " " ঐ	১	০	২	১২ আষাঢ়	১/৩	৫।৵
" ২২ " " কার্পাস	০	৬	৬	২৯ বৈশাখ	২৸৩	১৪৵
" ২২ " " ঘাস	৭	৫	৫	১২ জ্যৈষ্ঠ	৩/২৸	১৫।/১০
" ১৫ " " ঐ	৪	২	২	২ আষাঢ়	৩'৫	১৬৸৵
অম্বালা গোধূম	২	৩॥০	৪	আষাঢ়	১।৮৸	৭।/১০

এক বিঘা কার্পাস চাস করিতে লোগিন সাহেব এই খরচ ধরিয়াছেন——

চাস——	১/
আলি করা——	৸৵
বপন——	৵১০
জল সেঁচিতে——	॥/
নালা——	৵
নিড়ান——	২৸/
গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া——	/০
গাছের আগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া——	/০
সংগ্রহ——	৵০
	৫৸/১০
সার ও ভূমির কর (ছয় মাসে)	২।৵১০
	৮।০

*See Schrattky's Principles of Rational Agriculture. Page 281.

মিসর দেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মে। তথায় কার্পাসের কৃষিতে লোকের বিশেষ যত্ন আছে। সেই দেশের প্রণালীতে চাস করিলে যত ব্যয় পড়ে, লোগিন সাহেব তাহারই হিসাব দিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহার কম বই বেশী ব্যয় পড়ে না। চেষ্টা করিলে এদেশে মিসর দেশের ন্যায় উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মান বিশেষ কষ্টকর হইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লণ্ডনে মিসর দেশের তুলার মূল্য ১।০ হইলে, আমেরিকার তুলার মূল্য ৸৶০ পনর আনা, বোম্বাই অঞ্চলের তুলার মূল্য ॥০ আট আনা, আর বঙ্গদেশের তুলার মূল্য ।৵০ আনা হইবে। সুতরাং আমাদের দেশের তিন সের তুলা না জন্মাইয়া, মিসর দেশের এক সের তুলা জন্মাইলেও অধিক লাভ।

এই প্রবন্ধে কার্পাসের বিষয় যাহা উল্লিখিত হইল, যদি এইরূপ নিয়মে চাষ করা যায়, তবে এদেশে উৎকৃষ্ট তুলা জন্মিতে পারে। বাজারে তুলার যেরূপ আদর বাড়িতেছে এবং দেশ বিদেশে যে পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে, তাহা দেখিয়া সহজেই বলিতে পারা যায় ইহার চাষে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। কার্পাস চাষের এই প্রশস্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে, এই সময় দেশীয় লোক সকল যদি উহার চাষে যত্ন করেন, তবে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের বিশেষ উপকার হইতে পারে। বৎসর বৎসর এদেশ হইতে বিস্তর তুলা মাঞ্চেষ্টরে প্রেরিত হইয়া থাকে। আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য দেশের তুলার সহিত যদি ভারতীয় তুলা সমতুল্য হয় তাহা হইলে উহার দর অধিক হইতে পারে। যে কোন কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে দেখা উচিত, যে কোন চাষ করিতে হইবে, তাহাতে লাভালাভ কি প্রকার। যদি লাভের হার কম হয়, তবে কি উপায়ে তাহা বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা দেখা উচিত। আমরা যে সকল চাষে লাভ করিতে অসমর্থ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী কৃষকগণ কি উপায় অবলম্বন করাতে সেই সকল চাষে উন্নতি করিয়াছেন তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। কেবল মাত্র মাটি আঁচড়াইয়া বীজ ছড়াইলে কৃষিকার্য্য করা হয় না। দিন দিন উন্নতি সহকারে চাষ করিতে পারিলেই যথার্থ কৃষিকার্য্য করা হয়। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে চারি দিকেই প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। শিক্ষিত শ্রেণী কিম্বা জমীদারগণ যত দিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করিবেন, তত দিন এদেশে কৃষির উন্নতি হওয়া দুর্ঘট।

কৃষিতত্ত্বে সময়ে সময়ে যে সকল চাষ প্রণালী লিখিত হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ এবং জমীদারগণ যদি দেশমধ্যে কৃষকদিগের নিকট সেই সকল প্রণালী অনুসারে উপদেশ দেন তবে বিস্তর উপকার হইতে পারে। উপদেশ কার্য্যে পরিণত না হইলে কোন ফলোদায় হয় না।

এদেশে যে সকল কার্পাস চাষ হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে আবার নানা প্রকার জাতি আছে। সম্প্রতি আমেরিকা হইতে যে কএক প্রকার

উৎকৃষ্ট জাতীয় তুলার বীজ আসিতে আরম্ভ হইয়াছে, দেশ মধ্যে সেই সকল কার্পাসের চাষ হইলে বিস্তর উপকার হইতে পারে। এজন্য আমাদের অনুরোধ কৃষিতত্ত্বের পাঠকগণ কার্পাস চাষে বিশেষ মনোযোগ দেন।

ক্যাসো পম্‌কিন।

(Cashaw Pumpkin.)

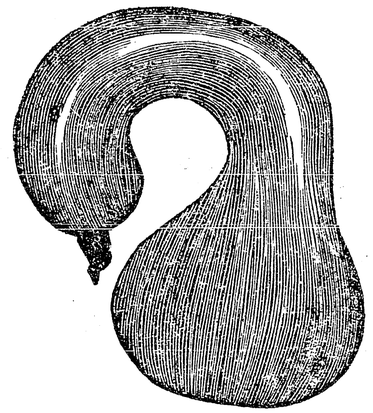

ইহা এক প্রকার বিলাতী লাউ। এই লাউ এদেশে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। বিলাতি কুমড়া; স্কোয়াস ভেজিটেবল মেরো এবং পমকিন এই সকল প্রায় সমশ্রেণীর তরকারী, ক্যাসো পমকিন দেখিতে যেরূপ তাহার আকার উপরে চিত্রিত হইল। ইহাকে ঘাড়বাঁকা লাউও কহিয়া থাকে। সাঁচিকুমড়ার ন্যায় ইহার গাছ তত বড় হয় না। পমকিন মাচায় তুলিয়া না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। মাটিতে লতাইয়া বেড়াইলে গাছ ভাল থাকিতে পারে। এই লাউয়ের ফলন অধিক, এমন কি প্রায় প্রত্যেক গাঁইটে গাঁইটে ফল ধরিয়া থাকে। পমকিন তরকারীতে ব্যবহার হয়। এদেশে ইহার গাছ রোপণ করিয়া ফলভোগ করা অতি সহজ কথা। পাইকপাড়া নর্শরিতে প্রতিবৎসর ইহার বীজ আনীত হইয়া থাকে। শীতকালে এই লাউ

জন্মিয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে বীজ রোপণ করিতে হয়। মাদা করিয়া বীজ রোপণ করা উচিত। এক একটী মাদা করিয়া তাহাতে গোবরের সার দিয়া মাটী প্রস্তুত করিতে হইলে কার্ত্তিক মাসে প্রত্যেক মাদায় দুই তিনটী করিয়া বীজ পুঁতিতে হয়। এক মাদায় অধিক বীজ পুঁতিলে গাছ ঘন হইয়া ফলধরার ব্যাঘাত হইতে পারে। যে স্থানে গাছ পুঁতিবে তাহার চারিদিকে পতিত জমি থাকা আবশ্যক; কারণ গাছ বড় হইলে সেই জমিতে উহা লতাইয়া বেড়াইতে পারে। বীজ রোপণের পর হইতে সর্ব্বদা মাদায় জল দিতে হয়। লাউ কুমড়ার পক্ষে গোবর সারই প্রশস্ত, তবে খৈল সার দিলে উপকার ভিন্ন অপকার নাই, খৈল সার দিতে কিছু ব্যয় পড়ে এজন্য গোবর সার দিলেই চলিতে পারে। কিছু এঁটেল মাটিতে পমকিন ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া দেওয়া উচিত। গাছের গোড়ায় যেন ঘাস মুথা প্রভৃতি জঙ্গল না হইতে পারে, তদ্‌পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নিম্নভূমিতে গাছ রোপণ করিলে বৃষ্টির জল বসিয়া গাছ পচিয়া যাইতে পারে। এজন্য যে স্থানে জল না দাঁড়ায় এরূপ ভূমিতে উহা রোপণ করা আবশ্যক। সকলে চেষ্টা করিলে এদেশে এই লাউ বহুল পরিমাণে চাষ হইতে পারে।

ক্যাসো পমকিন সচরাচর দুই জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার অত্যন্ত বড় আকারের অন্য প্রকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকার বিশিষ্ট। বড় আকারের পমকিন ওজনে অন্যূন ত্রিশসের হইতে একমণ দশসের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমেরিকা ও ইয়ুরোপ বাসীরা ইহা খাদ্যে ব্যবহার করেন। সামান্যাকারের যে পমকিন হয়, তাহা পশ্বাদির খাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, গো অশ্বাদি অতি আগ্রহের সহিত পমকিন ভক্ষণ করে। এই ঘাড়বাঁকা লাউ এদেশে চাষ হইলে কি মনুষ্য কি পশ্বাদি সকলেরই ব্যবহারে লাগিতে পারে। বিশেষতঃ পমকিনের আকার বৃহৎ, সে জন্য আরও উপকার বোধ হয়। একটী লাউ দ্বারা গৃহস্থের বিস্তর উপকার হইতে পারে। এই বিদেশীয় লাউ কুমড়া দেশ মধ্যে রোপিত হইলে দরিদ্র কৃষকদিগের আয়ের কতক সহায়তা হইতে পারে। আমাদের দেশের জল বায়ুতে পমকিন উত্তমরূপ জন্মিতে পারে। তবে স্থান ভেদে মৃত্তিকার

বিভিন্নতাবশতঃ ফলের আকার ছোট বড় হইবার সম্ভব। কারণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই বিলাতি কুমড়া বাঙ্গালাদেশের সকল জেলাতে সমান আকারের হয় না। দুই একটী স্থানে অতি প্রকাণ্ড আকারে কুমড়া দেখা যায়, সেই কুমড়ার বীজের গাছ আবার ছোট আকারের কুমড়াও হইতে দেখা গিয়াছে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা এবং সারাদির বিভিন্নতা যে এইরূপ আকারগত বৈলক্ষণ্যের কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

এস্থলে কৃষকদিগের ইহা মনে করা উচিত যে কার্ত্তিক মাসে যে সকল শাক সবজী এবং তরকারীর আবাদ করিতে হইবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে সেই সকল জমির পাইট করিতে আরম্ভ করিলে ফসল ভাল হইবে। কপি, সালগাম, প্রভৃতির জমি যেমন এই সময় সারদিয়া রাখিতে হয়, পমকিনের ক্ষেত্রও সেই সঙ্গে সার দিলে ভাল হয়। অনেক স্থানে দেখা যায় অনেক প্রকার উদ্ভিদে আদৌ সার দেওয়া হয় না, অথচ সুন্দররূপ ফলন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যখন সার না দেওয়ায় যে পরিমাণে ফসল হইয়া থাকে, সার দিয়া রোপণ করিলে তাহা যে তদপক্ষে উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, চাষের পক্ষে অনেক জমি এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তাহাতে কোন প্রকার সার না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। মনে কর কোন স্থানে পুষ্করিণী খাদ করা হইয়াছে, অথবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহারা পাড়ে ফেলা হইয়াছে, কিম্বা কোন জমি অনেক দিন হইতে পতিত অনাবাদী আছে এরূপ স্থানে কোন প্রকার উদ্ভিদ্ রোপিত হইলে সারের আবশ্যকতা করে না। পতিত ভূমি বলিলে এরূপও হইতে পারে কোন জমি অনেক দিন হইতে কোন প্রকার চাষ করা হয় নাই, কিন্তু তাহাতে উলুঘাস জন্মিয়া জঙ্গল হইয়া আছে, এরূপ স্থলে কোন চাষই সুবিধাজনক নহে। যে জমিতে উলুঘাস জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সমুদায় ঘাস নষ্ট করিয়া সারাদি না দিলে পুনর্ব্বার উহার উর্ব্বরাশক্তি উৎপন্ন হয় না।

পমকিনের বীজ প্রায় বিলাতী কুমড়ার বীজের ন্যায়, তবে বিলাতী কুমড়ার বীজ যে পরিমাণে মোটা হয় ইহার বীজ তত মোটা হয় না, পাতলা আকারের। এদেশের বীজেও গাছ হইতে পারে, কিন্তু সেই

বীজ জাত গাছে ফল তত বড় হয় না। এজন্য বিদেশীয় বীজে চাষ করা ভাল।

ক্যাসোপমকিনকে অনেকে ঘাড়বাঁকা কুমড়াও কহিয়া থাকে। রোপণের যে রূপ প্রণালী লিখিত হইল, সেই নিয়মানুসারে চাষ করিলে অনায়াসেই ফল লাভ করা যাইতে পারে। ইহার চাষের মধ্যে কোন প্রকার কঠিন কিম্বা ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সামান্য অবস্থারলোক সকল চেষ্টা করিলে সহজেই ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমাদেরদেশে যেরূপ মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অবস্থা তাহাতে কি শীত প্রধান কি গ্রীষ্ম প্রধান সকলদেশের কৃষি উপযোগী আবাদ হইয়া থাকে। আমরা নিজে চাষ করিয়া দেখিয়াছি, বিদেশী যে কোন শাকসবজী এদেশে চাষকরা হইয়াছে, কোনবিষয়ই বিফলযত্ন হইনাই। এজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, কৃষিতত্ত্বের লিখিত প্রণালী পরীক্ষা সিদ্ধ; সুতরাং আমাদের লিখিত প্রণালী কাহারও পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে না। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে দুই একটী পমকিনের গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলে, স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী তরকারী সংকুলান হইতে পারে। লাউ কুমড়ার বীজ যেরূপ নিময় অনুসারে রাখিতে হয়, পমকিনের বীজও সেই নিয়মে ধরা উচিত। স্যাঁতাস্থানে বীজ রাখিলে উহা পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। এজন্য ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক। বীজ মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। ভালরূপ মুখবন্ধ করিয়া বোতল মধ্যে বীজ রাখিলে, সহজে উহা অতিউত্তম থাকে কীট বীজের একটী শত্রু; উহাতে অনেক বীজখাইয়া ফেলে। এজন্য সর্ব্বদা বীজ দেখা উচিত। গাছের সুপক্কফল হইতে যে বীজসংগ্রহ করা আবশ্যক তাহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন। পমকিন বৎসরে একবার ফলিয়া থাকে, অন্য ঋতুতে উহার চাষ করিয়া দেখা হয় নাই। বোধ হয় বিলাতী কুমড়া ও লাউয়ের ন্যায় চাষ করিলে অন্যান্য সময়েও হইতে পারে। কিন্তু আমরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, আশা করি কৃষিতত্ত্বের পাঠকগণ এবিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিলে সফল হইতে পারেন।

মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ।

তুঁতের আবাদ করিয়া গুটিপোকাদ্বারা যেরূপে রেসম প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বোধহয় অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন। গুটিপোকাকে কৌষিক-পুত্তিকা কহে, এই পুত্তিকাদিগের গাত্রাচ্ছাদিত আবরণ হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রনির্গত হয়, তাহাকে রেসম কহে। রেসম অতি মূল্যবান দ্রব্য, গরদ, চেলি, কিংখাপ, গর্ণেট, সাটিন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র এই রেসম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারিস নগরে গত একৃজিবিসন হইতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইটালী প্রভৃতি স্থান সমূহে এই বিষয়ের অত্যন্ত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশে এমন লাভজনক ব্যবসা থাকিতে তাহার উন্নতি বিষয়ে আমরা কোন প্রকার চেষ্টা করি না। গত বৎসর এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ডেরাডুন প্রদেশে ও পঞ্জাবে বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা জানা হইয়াছে যে ইহার উন্নতি করিতে পারিলে সমধিক লাভ হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে কৌষিক বস্ত্রের ব্যবহার আছে। রামায়ণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সীতা প্রভৃতি এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞকালীন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে চীন প্রভৃতি দেশের রাজগণ কৌষিক বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ সময় কোন্ দেশ হইতে কাহা দ্বারা যে এদেশে কৌষিক পুত্তিকা আনীত হইয়াছিল এবং কোন জাতীয় কীট রূপান্তরিত হইয়া যে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের পণ্ডিতদিগের কি মত তাহা দেখা উচিত। বার্ডউড সাহেব বলেন পুরাতন বাইবেল গ্রন্থে রেসমের কথা উল্লেখ আছে; এতদ্বারা বোধ হয় অতি প্রাচীনকাল হইতে আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে রেসম ব্যবসা চলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে রেসমের তত ব্যবহার ছিল না; কারণ তৎকালিন বাণিজ্য বিষয়ক তালিকায় দেখা যায়, বারবারিকনগর (এক্ষণে সিন্দুনদীর উপর করাচি বা রোচ মাঙ্গালের নিকটবর্ত্তী নীলকুন্দ) প্রভৃতি স্থান

বীজ জাত গাছে ফল তত বড় হয় না। এজন্য বিদেশীয় বীজে চাষ করা ভাল।

ক্যাসোপমকিনকে অনেকে ঘাড়বাঁকা কুমড়াও কহিয়া থাকে। রোপণের যে রূপ প্রণালী লিখিত হইল, সেই নিয়মানুসারে চাষ করিলে অনায়াসেই ফল লাভ করা যাইতে পারে। ইহার চাষের মধ্যে কোন প্রকার কঠিন কিম্বা ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সামান্য অবস্থারলোক সকল চেষ্টা করিলে সহজেই ইহার চাষে প্রবৃত্ত হইতে পারে। আমাদেরদেশে যেরূপ মৃত্তিকা ও জলবায়ুর অবস্থা তাহাতে কি শীত প্রধান কি গ্রীষ্ম প্রধান সকলদেশের কৃষি উপযোগী আবাদ হইয়া থাকে। আমরা নিজে চাষ করিয়া দেখিয়াছি, বিদেশী যে কোন শাকসবজী এদেশে চাষকরা হইয়াছে, কোনবিষয়ই বিফলযত্ন হইনাই। এজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, কৃষিতত্ত্বের লিখিত প্রণালী পরীক্ষা সিদ্ধ; সুতরাং আমাদের লিখিত প্রণালী কাহারও পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে না। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে দুই একটী পমকিনের গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলে, স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী তরকারী সংকুলান হইতে পারে। লাউ কুমড়ার বীজ যেরূপ নিময় অনুসারে রাখিতে হয়, পমকিনের বীজও সেই নিয়মে ধরা উচিত। স্যাঁতাস্থানে বীজ রাখিলে উহা পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। এজন্য ভালরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক। বীজ মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয় না। ভালরূপ মুখবন্ধ করিয়া বোতল মধ্যে বীজ রাখিলে, সহজে উহা অতিউত্তম থাকে কীট বীজের একটী শত্রু; উহাতে অনেক বীজখাইয়া ফেলে। এজন্য সর্ব্বদা বীজ দেখা উচিত। গাছের সুপক্কফল হইতে যে বীজসংগ্রহ করা আবশ্যক তাহা বোধহয় সকলেই অবগত আছেন। পমকিন বৎসরে একবার ফলিয়া থাকে, অন্য ঋতুতে উহার চাষ করিয়া দেখা হয় নাই। বোধ হয় বিলাতী কুমড়া ও লাউয়ের ন্যায় চাষ করিলে অন্যান্য সময়েও হইতে পারে। কিন্তু আমরা উহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, আশা করি কৃষিতত্ত্বের পাঠকগণ এবিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখিলে সফল হইতে পারেন।

মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ।

তুঁতের আবাদ করিয়া গুটিপোকাদ্বারা যেরূপে রেসম প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বোধহয় অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন। গুটিপোকাকে কৌষিক-পুত্তিকা কহে, এই পুত্তিকাদিগের গাত্রাচ্ছাদিত আবরণ হইতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রনির্গত হয়, তাহাকে রেসম কহে। রেসম অতি মূল্যবান দ্রব্য, গরদ, চেলি, কিংখাপ, গর্ণেট, সাটিন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্র এই রেসম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পারিস নগরে গত একজিবিসন হইতে ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইটালী প্রভৃতি স্থান সমূহে এই বিষয়ের অত্যন্ত আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশে এমন লাভজনক ব্যবসা থাকিতে তাহার উন্নতি বিষয়ে আমরা কোন প্রকার চেষ্টা করি না। গত বৎসর এ বিষয়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ডেরাডুন প্রদেশে ও পঞ্জাবে বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা জানা হইয়াছে যে ইহার উন্নতি করিতে পারিলে সমধিক লাভ হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে কৌষিক বস্ত্রের ব্যবহার আছে। রামায়ণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সীতা প্রভৃতি এই বস্ত্র পরিধান করিতেন। রাজসূয় যজ্ঞকালীন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে চীন প্রভৃতি দেশের রাজগণ কৌষিক বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়াছিলেন। ফলতঃ কোন্ সময় কোন্ দেশ হইতে কাহা দ্বারা যে এদেশে কৌষিক পুত্তিকা আনীত হইয়াছিল এবং কোন জাতীয় কীট রূপান্তরিত হইয়া যে ইহারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের পণ্ডিতদিগের কি মত তাহা দেখা উচিত। বার্ডউড সাহেব বলেন পুরাতন বাইবেল গ্রন্থে রেসমের কথা উল্লেখ আছে; এতদ্বারা বোধ হয় অতি প্রাচীনকাল হইতে আসিয়া ও ইউরোপের মধ্যে রেসম ব্যবসা চলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের রাজত্বের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে রেসমের তত ব্যবহার ছিল না; কারণ তৎকালিন বাণিজ্য বিষয়ক তালিকায় দেখা যায়, বারবারিকনগর (এক্ষণে সিন্দুনদীর উপর করাচি বা রোচ মাঙ্গালের নিকটবর্ত্তী নীলকুন্দ) প্রভৃতি স্থান

সমূহ হইতে চীনদেশীয় রেসম ইয়ুরোপে রপ্তানী হইত। ফলতঃ অতি পুরাকাল হইতে যে ভারতীয় রেসম পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রেরিত হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে যে সকল কৌষিক পুত্তিকা হইতে রেসম উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সকল পুত্তিকা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আমরা এ প্রস্তাবে সাধারণ রেসম চাষের বিবরণ উল্লেখ না করিয়া মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব। এদেশে যে কএকপ্রকার চাষ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে রেসম ও নীলের চাষ অধিক আয়জনক। রেসমের ন্যায় উচ্চমূল্য কোন চাষে নাই। পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে রেসম উৎপন্ন হইত, যে সময়ে কোম্পানির রাজ্য ছিল, সেই সময় এখানে কোম্পানি বাহাদুরের রেসম কুঠী ছিল, ঐ সকল কুঠী হইতে প্রভূত রেসম উৎপন্ন হইয়া ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইত। কোম্পানি এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ওয়াটসন কোম্পানি রেসমেরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সময় মেদিনীপুর জেলা হইতে অন্যূন ৩০।৪০ লক্ষ টাকার রেসম উৎপন্ন হইত। প্রজাগণ আন্তরিক উৎসাহ ও যত্নের সহিত উহার চাষে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রজাসাধারণের অবস্থা অনেকংশে উন্নত ছিল, অন্নের স্বচ্ছলতা সর্ব্বত্র দেখা যাইত। এ প্রদেশের সকলই প্রফুল্ল, একদিকে রাধানগরের কাপড়ের আড়ং, অন্য দিকে প্রচুর রেসম উৎপন্ন, এই সকল বাণিজ্য নিবন্ধন নানা দেশের ব্যবসায়ী দ্বারা সর্ব্বদা ঘাটাল, রাধানগর নিমতলা প্রভৃতি স্থান সমূহ লোকজনে পরিপূর্ণ, বাণিজ্যের উন্নতাবস্থা, পরিলক্ষিত হইত। যে মেদিনীপুর জেলা এত রেসম ও সুতার কাপড়ের জন্য ভারতবর্ষের শিরোরত্ন ছিল, ইউরোপখণ্ড পর্য্যন্ত এই বাণিজ্যে আকৃষ্ট হইয়া ছিল, এখন সেই মেদিনীপুর জেলার যারপর নাই শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাত হইতে মাঞ্চেষ্টরি কাপড়ের আমদানিতে রাধানগরের উন্নত মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে আর সে পরিমাণে সুতার কাপড় উৎপন্ন হয় না। দেশ সাধারণ অল্প মূল্যে বিলাতী বস্ত্র পাইতে থাকিলে; অধিক মূল্যে ঐ বস্ত্রের কে আদর করিবে?

রাধানগরীয় বস্ত্র ব্যবসা হ্রাস হইলে আমাদের মনে বিশ্বাস ছিল, এ প্রদেশে রেসম আবাদে লোক অধিক মনোযোগী হইবে, পূর্ব্ব অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে রেসম উৎপন্ন হইবে, এবং সেই রেসমের ব্যবসাতে প্রজাসমূহের অবস্থা উন্নিতপথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। কিন্তু এক্ষণে মেদিনীপুর জেলার দিন দিন যেরূপ অবনতি দেখিতেছি, তদ্দর্শনে সকলেরই মনে বিশ্বাস হইতেছে আর কিছুদিন পরে এ জেলা হইতে রেসম চাষ একেবারেই উঠিয়া যাইবে।

বাঙ্গালা প্রসিডেন্সির মধ্যে মালদহ,রাজসাহী,মুর্শিদাবাদ,মেদিনীপুর নদীয়া এবং বর্দ্ধমানের কোন২ অংশে রেসম উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন্‌সময় হইতে কাহা দ্বারা যে এইসকল স্থানে রেসমেরচাষ হইতে আরম্ভ হয়, তাহার সটিক বিবরণ পওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষ রেসমের আদিম জন্ম স্থান, মতান্তরে উল্লেখ আছে পৃথিবীর মধ্যে চীনদেশীয়েরা প্রথমে রেসমের ব্যবহার অবগত হয়। একটী প্রবাদ আছে, চীনদেশীয় সম্রাট কোন জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে ছিলেন, এবং বন মধ্যে হটাৎ কএকটী গুটাপোকা প্রাপ্তহয়েন। চাকচিক্যশালী উজ্জ্বলপোকা পাইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন; এবং হাতে করিয়া নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইলেন যে তাহা হইতে একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম সূত্রবৎ পদার্থ নির্গতহইতেছে, তিনি তদ্দর্শনে আরও কতকগুলি পোকা সংগ্রহ করিয়া, তাহা হইতে সূতা বাহির কয়িয়া এক খানি বস্ত্র বয়ণ করাইয়াছিলেন। রাজা এই বস্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েন এবং তদবধি দেশ মধ্যে রেসম আবাদ প্রচলিত করেন। কিন্তু এদেশে যে কি উপায়ে প্রথম এই মূল্যবান পোকার আবিষ্কার হয় তাহা জানিবার কোন বিশেষ বিবরণ নাই।

এ দেশে দুই প্রকার কীট হইতে সুতা প্রস্তুত হইয়া থাকে; রেসম পোকা ও তসর পোকা। তসর পোকার বিশেষ কোনরূপ আবাদ করিতে হয় না এবং তদুৎপন্ন সুতার মূল্যও অধিক নহে। হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, চাঁইবাসা, মেদিনীপুর বীরভূম এবং আসাম প্রদেদেশের অনেক স্থানে জঙ্গলে উহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কীট সকল শাল, এবং অন্যান্য জঙ্গলা গাছে আপনিই জন্মিয়া থাকে এবং উক্ত বৃক্ষের পত্রাদি আহার করিয়া পুরিপুষ্ট

হয়; এইরূপে পোকা সকল জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহাদিগের মুখেরলালা হইতে একপ্রকার সূত্র নির্গত হইয়া তাহাতেই আপনারা জড়িত হইয়া যায়। এই জড়িত অবস্থাকে তসর গুটি কহে। অনন্তর ঐ গুটি সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে তসর সূত্র উৎপাদন করিয়া লইতে হয়।

তসর উৎপাদন অপেক্ষা রেসম উৎপাদন কিছু কঠিন। মেদিনীপুর জেলার কৈবর্ত্ত জাতীয় লোক সকল এই রেসমের আবাদ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ কীটের ডিম বা অণ্ড সকল আনিয়া কাপড়ে রাখে। এবং অণ্ড ফুটিবার সময় উপস্থিত হইলে ডিমসমূহ কোন বড় পাত্রে বিছাইয়া দেয়। ডিম সকল প্রথমে একটু লম্বাকৃতি হয়, এবং উহাতে প্রাণ সঞ্চার হইলে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও লম্বাকৃতি হইয়া নড়িতে থাকে। এই সময় তুঁতের পাতা সকল কুচি কুচি করিয়া দিতে হয়, তাহারা ঐ সকল পত্র খণ্ড আহার করিতে থাকে। এইরূপে কিছু দিন আহার করিয়া তাহার পর একেবারেই আহার বন্দ করিয়া থাকে। আহার বন্দ হইলে তসর পোকার ন্যায় সূত্র দ্বারা জড়িত হইতে থাকে। এই আবৃত অবস্থাকে কুয়া বা কোকন কহে। কোকল হইতে রেসম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে সকল সময়ে কোকন জন্মে না। এদেশে যে সকল কীট হইতে রেসম জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে বড় পলু উৎকৃষ্ট, তাহা বৎসরে একবার জন্মিয়া থাকে। মেদিনীপুর জেলায় বৎসরে আট বার রেসম উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ চৈত্তে বা দোহালা, দ্বিতীয় বৈশাখী বন্দ, তৃতীয় জ্যৈষ্ঠ বন্দ, ইহাকে শুষ্ক বা মার্চবন্দ কহে, এই বন্দের রেসম বর্ষাতী বন্দ অপেক্ষা উর্দ্ধ মূল্যে বিক্রয় হয়। চতুর্থ দরী জ্যৈষ্ঠ, পঞ্চম আষাঢ়ী বন্দ, ষষ্ঠ ভাদুরে বন্দ, এই দুই বন্দের রেসম অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সপ্তম আশ্বিনে বন্দ, অষ্টম কার্ত্তিকে বন্দ ইহাকে নবেম্বর বন্দও কহে, ইহা প্রায় মার্চবন্দের সহিত সমান দর। মেদিনীপুর ভিন্ন অন্যান্য জেলাতে অগ্রহায়ণী নামে আর একটী বন্দ উৎপন্ন হয়, উহার রেসম সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বড় পলু, চীনে পলু, ছোট পলু, বুলু পলু এই সকল জাতীয় কীট লইয়া মেদিনীপুর জেলায় রেসমের আবাদ হইয়া থাকে। রাজসাহী, মালদহ অঞ্চলে নিস্তারি বা নিস্ত্রি নামে আর এক প্রকার কীট জন্মিয়া থাকে, তাহা

হইতে রেসম জন্মে। মেদিনীপুরের রেসম অপেক্ষা মালদহ ও রাজসাহীর রেসম উৎকৃষ্ট।

বড়পলু হইতে যে রেসম উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ বরফের ন্যায় সাদা, চীনে পোকা হইতে যে রেসম জন্মে তাহা লালী ও শ্বেতী এই দুই বর্ণের হইয়া থাকে, শ্বেতীগুলি আবার কিছু গ্রিনিস আভাযুক্ত; এই চীনে পোকাজাত রেসম অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। ছোট পলুর রেসম লালী রঙের, অত্যন্ত শক্ত এবং কিছু কড়া। বুলু পলুর সূত্র সকল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

রেসম চাষ করিতে হইলে অগ্রে তুঁতের আবাদ করিতে হয়। তুঁতের চাষ ভিন্ন রেসম উৎপন্ন হইতে পারে না; তুঁতের পাতাই রেসম পোকার এক মাত্র খাদ্য, তাহারা উহা আহার করিয়া জীবিত থাকে এবং সূত্র উৎপাদনে সমর্থ হয়। মেদিনীপুর জেলায় তুঁতের বিঘার খাজনা সাত আট টাকা করিয়া। মালদহ ও রাজসাহীর খাজনারহার মেদিনীপুর অপেক্ষা অধিক। যে নিয়মে এই জেলায় তুঁতের আবাদ হইয়া থাকে, তাহা আমরা অন্য প্রস্তাবে প্রকাশ করিব। মেদিনীপুরজেলায় পূর্ব্বাপেক্ষা রেসম চাষ ও ফলন কমিয়া আসিতেছে। কি কারণে যে এইঘটনা হইতেছে, অজ্ঞ কৃষকেরা তাহা অনুসন্ধান করে না। তাহারা দৈবেরউপর নির্ভরকরিয়া বসিয়া থাকে। যে মেদিনীপুরে পূর্ব্বে অন্যূন৩০।৪০ লক্ষ টাকার রেসম উৎপন্ন হইত, সেইস্থানে এক্ষণে চারি পাঁচলক্ষটাকার রেসমউৎপন্ন হওয়া কঠিনহইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি যে গ্রামে দশমণ কোকন জন্মাইত, সেখানে এখন দশভাগের এক ভাগ হওয়া কঠিন হইয়াছে। কএক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, রেসমের এই দুরবস্থা দেখিয়া এতদ্দেশীয় কৃষকগণ একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে। এই জেলায় চীনে কোকন অধিক আবাদ হইয়া থাকে। চীনে কীটজাত রেসম অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া কৃষকেরা ইহার চাষে অধিক মনোযোগ দিয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিমণ কোকনে আড়াই সের রেসম উৎপন্ন হইত। এক্ষণে প্রতিমণে দেড় সের সাত পুয়া জন্মাইতেছে। এই উৎপন্নের হ্রাসতা সহকারে কৃষকগণের যার পর নাই ক্ষতি হইতেছে, মনে কর সচরাচর গড়ে রেসমের সের ১৫টাকা করিয়া বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই হিসাবে আড়াইসেরের মূল্য৩৭॥০টাকা, এক্ষণে আড়াইসেরের স্থানে সাতপুয়া হইলে তাহারমূল্য২৬।০

টাকা, সুতরাং একমণ কোকনে১১।০টাকা লোকসান হইতেছে। মণকরা রেসম উৎপাদন অল্প হইতেছে বলিয়া ভূমির খাজনা এবং চাষের ব্যয় ও পরিশ্রম কিছু কমে নাই, তাহা পূর্ব্বের ন্যায়ই বর্ত্তমান আছে। অথচ তাহাদিগকে বৎসর বৎসর অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। নিস্ব প্রজাসমূহ দুই এক বৎসর লোকসান দিয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে উহার চাষে বিমুখ হইতেছে, এই কারণে মেদিনীপুরে রেসমের এত হীনাবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত দশ বার বৎসরের মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় যেরূপ রেসম চাষ কমিয়া আসিয়াছে, সে হিসাবে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে আর দশ বার বৎসরের মধ্যে এই জেলা হইতে রেসম আবাদ একেবারেই উঠিয়া যাইবে। আমরা দিন দিন রেসমের হ্রাস ভিন্ন উন্নতির কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। পূর্ব্বে এই জেলায় ওয়াটসন কোম্পানির ২২টী এবং অন্যান্য ধনী লোকদিগের আরও কএকটী রেসম কুঠী বা বানক ছিল, এক্ষণে ২২টীর মধ্যে তাঁহাদিগের একটী এবং দেশীয় লোকদিগের চারিটী মাত্র কুঠী বর্ত্তমান আছে। এই সকল কুঠী হইতে রেসম পূর্ব্বের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে না। ফলতঃ কোনটীরও উন্নতাবস্থা নহে। যে নিয়মে পূর্ব্বে এদেশে রেসম চাষ হইত, এক্ষণে তদ্‌সম্বন্ধে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সেই নিয়ম বর্ত্তমান আছে, অথচ উৎপন্নের হার বৎসর বৎসর কমিয়া পড়িতেছে। যে কার্য্যে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক পড়ে, তাহা কেহই ইচ্ছা করিয়া অবলম্বন করে না। রেসম চাষে লাভের হার যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তদ্দর্শনে কৃষকশ্রেণী ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে, এবং অনেকেই রেসমের পরিবর্ত্তে ইক্ষু চাষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদিগের দ্বারা যে এই অবনতি নিবারিত হইবে, সে আশা করা বৃথা। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসী কৃষকগণের ন্যায় এতদ্দেশীয় কৃষকবর্গ সুশিক্ষিত ও জ্ঞান সম্পন্ন নহে; ঐ সকল দেশবাসীগণ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন দ্বারা স্ব স্ব দেশের কৃষিকার্য্যের যেরূপ উন্নতি করিতেছেন, তাহা আমাদের কৃষকগণের পক্ষে গল্প স্বরূপ। বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা যে কৃষিকার্য্য করিতে হয়, এবং তাহাতে বিস্তর উপকার হইতে পারে এ জ্ঞান তাহাদিগের মস্তিষ্কে আদৌ প্রবেশ করে না। তাহারা চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে চাষ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের দ্বারা কোন

প্রকার নূতন আবিষ্কার হইতে পারে না। এই মূর্খ কৃষক শ্রেণীর উপর কৃষিকার্য্য ন্যস্ত আছে বলিয়া এদেশে কৃষির দিন দিন অবনতি হইতেছে। এই প্রভূত লাভজনক কৃষির দুরবস্থা দেখিয়া কেহই উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নশীল হইতেছেন না। কি গবর্ণমেণ্ট কি জমীদার কেহই কৃষির উন্নতি কল্পে যত্নবান নহেন। গবর্ণমেণ্ট এবং জমীদারবর্গ যদি এ দেশীয় কৃষির উন্নতি জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রজাদিগকে দুরবস্থা ও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। দেশীয় কৃষকগণ একে মূর্খ তাহাতে আবার তাহাদিগের তাদৃশ অর্থবল নাই যে কোন প্রকার ব্যয়সাধ্য কার্য্যে তাহারা হস্তার্পণ করিতে সমর্থ হইতে পারে। বিলাতের ন্যায় এদেশে কৃষকদিগের অবস্থা নহে, কিম্বা জয়েণ্টষ্টক কৃষিকোম্পানি অদ্যাবধি দেশ মধ্যে সংগঠিত হয় নাই যে সাধারণের অর্থ সাহায্য ও ধনবল একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবে। অতএব এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে, কোন ক্রমেই রেসমের এই দুরবস্থা ঘুচিবে না। এই লুপ্ত প্রায় রেসম আবাদ উঠিয়া গেলে প্রজাসাধারণের কষ্ট স্রোত যে কতদূর বৃদ্ধি হইবে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল স্থানে রেসম উৎপন্ন হইত, এবং সেই রেসমের জন্য পৃথিবীর নানাস্থানে যে পরিমাণে সুখ্যাতি ছিল, এক্ষণে সেই সুখ্যাতিরবিলোপদশা উপস্থিত হইয়াছে। দেশ মধ্যে আয়জনক কৃষিকার্য্যের উন্নতি থাকিলে প্রজাগণের স্বচ্ছলতা থাকে, প্রজাদিগের মধ্যে স্বচ্ছলতা থাকিলে, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত হইতে হয় না। আজ কাল বৎসর বৎসর যেরূপ দুর্ভিক্ষ ও প্রাণনাশক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে প্রজাবর্গ নান্ন ন বস্ত্র নচ বারি পাত্র হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় যাহাতে প্রজাদিগের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, তদ্‌পক্ষে গবর্ণমেণ্টের বিহিত বিধানে চেষ্টা করা উচিত। প্রজা লইয়া রাজার রাজত্ব, অতএব সেই প্রজাকুল যাহাতে বজায় থাকে, তাহাদিগের গৃহে অন্নের স্বচ্ছলতা বর্ত্তমান থাকে, তাহার উপায় বিধান করা রাজার প্রধান কর্ত্তব্য। এজন্যও গবর্ণমেণ্টের উচিত যাহাতে এই বিলুপ্ত প্রায় রেসম চাষ পূর্ব্বের ন্যায় উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা দেখিয়াছি, রেসম কীট পালন কিম্বা তুঁতের

আবাদ জনিত কোন প্রকার দোষে ইহার অধঃপতন সাধিত হইতেছে না। চীনে কীটনামক যে জাতীয় কীট হইতে এ অঞ্চলে রেসম উৎপাদন করা হইয়া থাকে, সেই কীট মম্বন্ধে যে দোষ ঘটিয়াছে,তজ্জন্য যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্‌পক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দেশের যে প্রাণী কিম্বা উদ্ভিদের আদিম বাস স্থান তাহাদিগকে ভিন্নদেশে লইয়া গিয়া বাস করাইলে, সেই নূতন স্থানের জল, বায়ু, উত্তাপ জনিত পরিবর্ত্তে তাহা-দিগের অবস্থা যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারেন। চীনে পোকা অনেক কাল হইল এদেশে আনীত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের সংস্রবে এ কাল পর্য্যন্ত কীট সকল উৎ-পন্ন হইতেছে। যেমন এক বংশের মধ্যে বহুকাল হইতে পরস্পর বিবাহাদি হইয়া সন্তান উৎপাদিত হইলে, সেই বংশের আর উন্নতি হয় না; জাতীয় অবনতি দ্বারা বংশক্ষয় ও হীনবীর্য্য হইতে আরম্ভ হয়; চীনে পোকাদিগের মধ্যেও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে; পূর্ব্বের ন্যায় কীট সকল সতেজ এবং রেসম উৎপাদনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। তাহারা সূত্রবৎ যে লালা দ্বারা কোকন উৎপাদন করিয়া থাকে, এক্ষণে সেইরূপ কোকন উৎপাদন করা তাহাদিগের পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। কীট সকল যে পরিমাণে বলিষ্ঠ হইবে, তাহারা যে সেই পরিমাণে রেসম উৎপাদনে সমর্থ ও উপযুক্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উদ্ভিজ্জাদি দুর্ব্বল হীন তেজ হইলে, তদুৎপন্ন ফল পুষ্প যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্টব ও উপযুক্ত আকারে জন্মে না; সেই রূপ বংশগত হীনাবস্থা বশতঃ রেসম কীট বা চীনে পোকা দিন দিন অধো-গতি প্রাপ্ত হইতেছে। মেদিনীপুর জেলায় এই কীটের যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মালদহ ও রাজসাহী প্রভৃতি স্থান সমূহে সেইরূপ হইয়াছে কি না তাহা বলিতে পারি না। যদি ঐ সকল স্থানে এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে,তবে কেবল যে মেদিনীপুর তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে রেস-মের আবাদ যে একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুর জেলায় যে পরিমাণে রেসমের উৎপন্নের হার হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য স্থান সমূহে ঠিক সেই পরিমাণে না হউক কতক যে কমিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা

মেদিনীপুর জেলার যে পরিমাণে বিবরণ অবগত আছি অন্য কোন জেলার রেসম উৎপন্ন সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ নহি, এজন্য বাঙ্গালাদেশের যে সকল জেলাতে রেসম আবাদ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানের সটিক বিবরণ এই প্রস্তাবে লিখিতে পারিলাম না।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য মেদিনীপুর জেলায় রেসমের এই দুরবস্থা কি উপায়ে নিবারিত হইতে পারে। এ বিষয়ে আমরা যতদূর জানি তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি, চীনে কীট সমূহেরজাতীয় অবনতিই (Degeneration) যে, উহার একমাত্র কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কোন উপায়ে এই, জাতীয় অবনতি নিবারণ করিতে পারিলেই যে, পূর্ব্বের ন্যায় আবার রেসম উৎপন্ন হইবে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। দুইটী উপায় অবলম্বন করিলে মেদিনীপুর জেলার রেসম আবাদের উন্নতি হইতে পারে। প্রথমতঃ এ দেশে যে সকল চীনে পোকা দ্বারা কোয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদিগের দ্বারা আর অণ্ড উৎপাদন না করাইয়া চীন দেশ হইতে নূতন বলিষ্ট কীট আনাইয়া এদেশের হীনাবস্থা গ্রস্থ কীটদিগের সহিত সঙ্গম দ্বারা বংশ উন্নত করতঃ সেই নবজাত বংশীয় কীট লইয়া রেসমের আবাদ করা। দ্বিতীয়তঃ বহুকাল হইতে যেমন এক প্রকার চীনে কীট লইয়া রেসমের চাষ চলিয়া আসিতেছে, এক্ষণে উহা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ছোটপলু বা অন্য জাতীয় পলু আনাইয়া চাষে প্রবৃত্ত হওয়া। এই দুইটী উপায় অবলম্বন না করিলে এই রোগের প্রতীকারের অন্য কোন রূপ আশা নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গুরুতর কথা আছে, চীন দেশ হইতে নূতন কীট আনয়ন করিয়া তদ্বারা বংশের উন্নতি সাধন কিছু সহজ কথা নহে, উহা বহুব্যয় সাধ্য। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই বহুব্যয় সাধ্য কার্য্য এতদ্দেশীয় কৃষকদিগের দ্বারা কোন মতে হইতে পারে না, তাহাদিগের তাদৃশী অবস্থা নহে যে এই ব্যয় ভার বহন করিতে পারে। এ জন্য গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মনোযোগী না হইলে উন্নতির কোন আশা করা যাইতে পারে না। আমাদের বিবেচনায় যদি এই ব্যয় সংকুলান জন্য রেসমের উপর কোন রূপ করধার্য্য করিয়াও চীন হইতে কীট আনীত হইয়া প্রজাসাধারণে উহা

পাইতে পারে তাহাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ ভাল রেসম উৎপন্ন হইলে, উহা দ্বারা যে লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে এই করদান প্রজাদিগের পক্ষে তত কষ্টকর হইবে না। অথবা প্রধান প্রধান রেসমের ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও কিছু কিছু ব্যয় বাবদ গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে। ফলতঃ যে কোন উপায়েই হউক চীন হইতে পোকা আনয়ন করা সম্পূর্ণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আপাততঃ যদি এই কার্য্যে অধিক পরিমাণে ব্যয় পড়ে এরূপ বোধ হয়, তবে বঙ্গদেশের মধ্যে যে সকল স্থানে চীনে পোকার অবস্থা উত্তম, সেই সকল স্থান হইতে পোকা আনাইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপ ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারে। ইহাতে ব্যয় অল্প পড়িবে, কিন্তু এই পরীক্ষায় যে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যাইবে; তাহা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় উপায় চীনে পোকার আবাদ একেবারে ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কীট অর্থাৎ যাহা কখন মেদিনীপুরে ব্যবহার হয় নাই সেই জাতীয় কীট আনাইয়া রেসমের চাষ করিলে বিশেষ উপকারের সম্ভব। চীন হইতে কীট আনয়ন করা অপেক্ষা এ উপায়টী সহজ এবং অল্পব্যয় সাধ্য। এদেশীয় কৃষকগণ ইহাতে তত মনোযোগী নহে। তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিলে কোন ফল দর্শে না। চাষ সম্বন্ধে তাহাদিগকে যে কোন পরামর্শ দেও, তাহাতে কোন ফল দর্শে এরূপ আশা করা যায় না। এ জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া হস্তার্পণ না করিলে কোন ফলোদয় হইবে না। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া একান্ত অবশ্যক। এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, পূর্ব্বোক্ত দোষ নিবারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রধান কর্ত্তব্য। রেসমের কারবার এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, তদ্‌পরিবর্ত্তে এমন কোন কৃষিকার্য্য নাই যে, প্রজারা তাহা অবলম্বন করিলে এই অভাব মোচন হইতে পারে। এদেশের জমীদারবর্গ কি প্রজাসাধারণ, কিম্বা রেসম ব্যবসায়ীগণ কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী নহেন। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে মনোযোগী হইতেন তাহা হইলে এত দিন মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষের বিস্তর উপকার সাধিত হইত। দেশীয় ব্যক্তিদিগের অযত্ন ও ঔদাস্যেযে এরূপ অবনিত হইয়া

আসিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ দেশে কোনপ্রকার কৃষিকার্য্যই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় না, শস্যাদির উন্নতি বা অবনতি সম্বন্ধে কোন প্রকার লিখিত বিবরণ থাকে না। কোন্ সময় হইতে কোন্ প্রকার শস্য চাষ হইতেছে, এবং কোন্ সময় হইতে তাহার অবস্থা হ্রাস হইয়া পড়িতেছে, কি কারণে অবস্থা মন্দ হইয়া পড়িতেছে, এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহার প্রতীকার হইতে পারে এ বিষয়ে কোন বিবরণ থাকে না। যত দিন পর্য্যন্ত দেশীয় শিক্ষিতগণ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইতেছেন, ততদিন আশানুরূপ ফললাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এজন্য সকল বিষয়েই আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যত দিন এই সকল কার্য্যে মন না দিবেন তত দিন উহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং দিন দিন আরও হীনাবস্থায় উপনীত হইতে থাকিবে। আজ কাল দেশীয় কৃষির উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টেরও আন্দোলন চলিতেছে, মাদ্রাজে কৃষিবিদ্যায় সংস্থাপিত হইয়া সুচারুরূপে উহার শিক্ষাদান করা হইতেছে, সম্প্রতি আবার গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি দিয়া দুইটী শিক্ষিত যুবককে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। যখন দেশীয় কৃষির উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট এত ব্যবস্থা করিতেছেন, তখন যে এই লাভজনক কৃষির উন্নতি সাধন পক্ষে গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন, এ আশা করা যাইতে পারে। মেদিনীপুর জেলার রেসম চাষ যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় উপস্থিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করার এই প্রশস্ত সময়। এখন অল্প চেষ্টা, অল্প ব্যয়, অল্প পরিশ্রম করিলে, পূর্ব্বোল্লিত দোষ অনায়াসেই বিনষ্ট করা যাইতে পারে। এখনও চীনে কীটের বংশ একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, অতএব এই সময় স্থানান্তর হইতে উক্ত সবল কীট আনাইয়া কীটবংশের উন্নতি করা একান্ত আবশ্যক।

শ্রীরাধাশ্যাম গুঁই।

টবে চারা রোপণের নিয়ম।

অনেক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদিগের বীজ ও চারা টব বা গামলায় রোপণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এজন্য বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন ও চারার উন্নতিকল্পে টব ব্যবহার হইয়া থাকে। যে সকল বীজ অথবা চারা টবে রোপণ করিতে হয়, তদ্‌সমুদায় ভূমিতে রোপণ করিলে, তাহাদিগের বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মে। অনেক জাতীয় উদ্ভিদের বীজ অতি ক্ষুদ্র, ভূমিতে সেইসকল উদ্ভিদ্‌বীজরোপণ করিলে অঙ্কুরোৎপাদন সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে। অত্যন্ত ক্ষুদ্র জাতীয় বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে বৃষ্টির জলে বীজ সমূহ হয় ভাসিয়া স্থানান্তরে কিম্বা অধিক মৃত্তিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ভূমিতে রোপণের আর একটী বিশেষ অসুবিধা এই যে, অত্যন্ত রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টির সময় বীজ অথবা চারা স্থানান্তর করিবার কোন উপায় করিতে পারা যায় না। অনেক প্রকার গাছ আছে, তাহাদিগের চারার অবস্থায় বৃষ্টির জল অধিক পরিমাণে লাগিলে, গাছ মরিয়া যায়, এজন্য বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত টবে রোপণ অত্যন্ত আবশ্যক। কপি প্রভৃতি কএক জাতীয় উদ্ভিদের বীজ রোপণ অথবা চারার অবস্থায় বৃষ্টির জল অত্যন্ত অপকারী, এই অবস্থায় বৃষ্টির জল যেরূপ অনিষ্টকারী অত্যন্ত রৌদ্রও আবার সেইরূপ ক্ষতিজনক। ফলতঃ রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য টব অত্যন্ত উপকারী।

অনেক প্রকার উদ্ভিদ্ এরূপ আছে যে, চারার অবস্থায় অধিক রস পাইলে তাহা পরিপাক করিতে অসমর্থ হয়। যে সকল শিকড় দ্বারা তাহারা রস আকর্ষণ করিয়া থাকে, ক্রমাগত রস লইয়া তদ্‌সমুদায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রয়োজনাতিরিক্ত রস গ্রহণ দ্বারা উদ্ভিদের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুতঃ প্রভূত অনিষ্ট হইয়া থাকে। টবে রোপণ করিলে রসের প্রচুরতা নিবন্ধন কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই। বীজ বপণ ও চারা রোপণ করিলেই যে ফল লাভ করা যায় এরূপ নহে, যে কোন উদ্ভিদ্‌কে আশানুরূপ আকারে পরিণত করিতে হইলে, তাহার বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। ভূমি অপেক্ষা টব যে অনেক

প্রকার উদ্ভিদের পক্ষে উপকারজনক তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেবল যে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত টব ব্যবহৃত হয়, এরূপ নহে। টবের দ্বারা আর একটী বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অনেক স্থলে মাটিতে নানা প্রকার কীট থাকে, তথায় কোন প্রকার চারা রোপণ করিলে, উক্ত কীটে তাহার শিকড় কাটিয়া দেয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে চারা মরিয়া যায়। এই কীটের অত্যাচার হইতে গাছ বাঁচাইতে হইলে উহা টবে রোপণ করিতে হয়। কটক প্রভৃতি কোন কোন স্থানে ঐরূপ কীটের আধিক্য দেখা যায়। তত্রত্য ভূমিতে কোন প্রকার ফুলাদির চারা রোপণ করিলে, কীটের অত্যাচার হইতে রক্ষাকরা কঠিন। এজন্যকেহ২ তথায় উপর্য্যুপরি তিনটী টব স্থাপিত করিয়া সর্ব্বোপরি টবে চারা রোপণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বনিম্ন টবে মাটি থাকিবে না, দ্বিতীয় টবের তলায় ছিদ্র বন্দ করিয়া দিতে হয় এবং তৃতীয় টব মাটি দ্বারা সাজাইয়া তাহাতে গাছ রাখিতে হয়। ফলতঃ টবের ব্যবহার হওয়াতে কৃষিকার্য্যের যে নানারূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফুল, ফল, শাক সবজী প্রভৃতি বহুবিধ উদ্ভিদের প্রথমাবস্থায় টবে রোপণ করা ভাল। টবে চারা একটু তেজস্কর করিয়া তাহা তুলিয়া ভূমিতে পুঁতিলে চারার ক্ষতি হয় না। বিশেষতঃ ভূমি হইতে চারা তুলা অপেক্ষা টব হইতে সহজে গোড়ার মাটি সমেত গাছ তুলিতে পারা যায়। যে কোন টব হইতে চারা তুলিতে হইলে টবটী উপুড় করিয়া কোন কঠিন দ্রব্যে টবের কানায় অল্প ঘা দিলে টবের সমুদায় মাটিসেমত চারা বাহির হইয়া আসিবে। অনন্তর তাহা সেইরূপ অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিলে চলিতে পারে।

আম্র প্রভৃতি কোন কোন গাছের ডালে কলম বাঁধিতে হইলে টব বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠে; কারণ গাছের যে ডালে কলম বাঁধিতে হয়, আঁটির চারা তথায় তুলিয়া সেই ডালের সহিত জোড় বাঁধিতে হইলে, প্রথমতঃ টবে সেই চারা প্রস্তুত করিতে হয়। চারা কলম বাঁধিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, টব সমেত তাহা সেই ডালের সম উচ্চ স্থানে মাচার উপর স্থাপিত করিতে হয়। টবের ব্যবহার হওয়াতে এই সকল বিষয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। অনেক গাছ এরূপ স্বভাবের যে টব ভিন্ন মৃত্তিকায় কোনমতেই তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারা যায় না।

উদ্যান প্রিয় ব্যক্তির পক্ষে টব অতি আবশ্যকীয় পাত্র। বাগান ও বারেণ্ডা সাজাইতে টবের ন্যায় আর কোন্ পাত্রই নাই। টবকে এক প্রকার ভ্রমণকারী উদ্যান বলিলেই হয়। যেখানে ফুল ও লতায় সাজাইতে মানস হয়, টবে সে সাধ সহজ উপায়ে পূর্ণ করা যাইতে পারে। যে স্থানে মাটী পাইবার কোন সম্ভব নাই, এরূপ অট্টালিকায় কি কোন সভাস্থলে গাছাদিদ্বারা শোভিত করিতে হইলে টব ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। যদিও অনেকে টবের পরিবর্ত্তে একপ্রকার চৌকা বাক্সে গাছ রাখিয়া থাকেন, কিন্তু টবের ন্যায় তাহা সুশ্রী হয় না। টবও আবার নানা প্রকার আছে, এক একটী টব এরূপ সুন্দর আছে যে, তাহাই দেখিতে ইচ্ছা হয়। সুন্দর সুন্দর টবে নানাবিধ মনোহর পুষ্প-পত্র পরিশোভিত গাছ থাকিলে যে কি চমৎকার শোভা হয় তাহা কাহাকেও লিখিয়া বুঝাইতে হয় না। টবে চারা প্রস্তুত করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সকলেরই পক্ষে সহজ কথা; প্রত্যেক গৃহস্থই মনে করিলে এই নির্ম্মল আনন্দের আধার গৃহে স্থাপিত করিতে পারেন। আমাদের দেশের লোকের কোন বিষয়ে সখ নাই বলিলেই হয়। পুষ্পাদি গাছপালা লইয়া আমোদ করার প্রথা কয়জন বাঙ্গালীর দেখিতে পাওয়া যায়? ফুলফলাদির গাছ করিয়া সুখভোগ করিবার উপায় পরমেশ্বর যেমন আমাদের দিয়াছেন, এরূপ ব্যবস্থা অন্য কোন দেশের লোকের দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা উর্ব্বরা দেশ, এবং নানা জাতীয় মনোহর উদ্ভিজ্যাদি পাইয়াও তাহারা সুখভোগ করিতে জানিলাম না। সামান্যাবস্থা হইতে সঙ্গতিশালী ইংরাজের আবাস গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখ, অন্ততঃ দুই একটী ফুলের টবও দেখিতে পাইবে! যে ব্যক্তি নিতান্ত সামান্যাবস্থা প্রাপ্ত তাহারও গৃহে টবের অভাবে দুই একটী বাক্স মাটিদ্বারা পূর্ণকরতঃ তাহাতেও কোন না কোন প্রকার গাছ আছে। পুষ্পাদির গাছপালা লইয়া আমোদ উপভোগ করিতে আমরা এখনও শিখি নাই, প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে দুই একটী গাছ রাখিতে হয়, এ অভ্যাস আজিও আমাদের হয় নাই। সমস্ত দিন কার্য্য ক্ষেত্রে দগ্ধ হইয়া গৃহে আসিয়া সুশিক্ষিত স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুবান্ধব লইয়া নানাপ্রকার নয়নানন্দদায়ক মনোহর পুষ্পাদি দর্শন-

জনিত পবিত্রসুখ ভোগ আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। আমাদের জড় মন সে দিকে আদৌ অগ্রসর হয় না।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে ভূমির অত্যন্ত অভাব। ফুল ফলের বাগান করা দূরে থাকুক, স্থানাভাবে অনেকেই আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, এরূপ অবস্থায় বাগান করা সাধারণেরপক্ষে সুবিধাজনক নহে। কিন্তু টব ব্যবহার করিলে, অনেক পরিমাণে সে অভাব দূর হইতে পারে। বারাণ্ডায় ও ছাদেও অনেক টব রাখিয়া গাছাদি রাখিতে পারাযায়। এজন্য পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে অধিক পরিমাণে টবের ব্যবহার।

যে নিয়মে টবে গাছ করিতে হয়, অনেকে তাহা অবগত নহেন। টবে রোপণ করিলেই যে গাছ সুন্দররূপ বৃদ্ধি পাইয়া রোপণকারীর আনন্দবর্দ্ধন করিবে তাহা নহে। টবে গাছ করিতে হইলে, অগ্রে মৃত্তিকার বিষয়ে মনোযোগী হইতে হয়। বীজ ও চারা টবেই রোপণ কর অথবা ভূমিতেই বসাও মাটির পাইট না করিয়া রোপণ করিলে কোন ফল দর্শে না। ভূমি অপেক্ষা টবে একটী অধিক সুবিধা এই যে, কোন বাগানের যদি মাটি এঁটেল হয় এবং সেখানে যদি রেলে মাটি অথবা অন্য কোনরূপ মৃত্তিকায় রোপণোপযোগী গাছ পুঁতিতে হয়, তবে অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু টবে এরূপ গোলযোগের কোন ঘটনা হইতে পারে না। কারণ যেরূপ প্রকৃতির গাছ রোপণ করিতে হইবে, তদুপযোগী মাটি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিলে সকল প্রকার সুবিধা হইতে পারে। নানাবিধ মাটির উপযোগী গাছাদি একস্থানে প্রস্তুত করারপক্ষে টবের ন্যায় সুবিধাজনক আর কিছুতেই নাই। সকল প্রকার মাটি টবেরপক্ষে অনুকুল নহে। এজন্য উহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র মাটি প্রস্তুত করিলে ভাল হয়। জল লাগিলে যে মাটি চাপ না বাঁধিতে পারে এরূপ মাটি টবের পক্ষে ভাল যদি এরূপ মাটি না পাওয়া যায়, তবে অন্য যে কোন প্রকার মাটিতে তাহার সমান পরিমাণ পাতাসার এবং নদীর উত্তম বালি আট অংশের এক অংশ তাহাতে মিশাইতে হইবে। এই কএক প্রকার মাটী এক সঙ্গে উত্তম রূপ মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে কাঁকর কিম্বা অন্য কোন প্রকার পদার্থ থাকিলে তৎসমুদায় উত্তম করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর

ঐ মাটি দ্বারা টব পূর্ণকরতঃ তাহাতে বীজ অথবা চারা রোপণ করিতে হইবে। টবে মাটি দেওয়ার সময় অগ্রে ক্ষুদ্র ঢিল অথবা খোলর কুচি দ্বারা টবের তলার ছিদ্রটী বন্ধ করিতে হয়। টব মাত্রেরই তলায় একটী করিয়া ছিদ্র থাকা আবশ্যক। ছিদ্র না থাকিলে টবে অধিক পরিমাণে জল দিলে ঐ জল বসিয়া চারা পচাইতে পারে। ছিদ্র থাকিলে আবশ্যকের অতিরিক্ত জলসিঞ্চিত হইলে, ঐ ছিদ্র দিয়া অতিরিক্ত জল নির্গত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে হাল্‌কা মাটিতে টবপূর্ণ করিয়া তাহাতে বীজ পুঁতিলে অল্পদিনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজ বপণের পর টবের মাটি চাপ বাঁধিলে বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে অধিক বিলম্ব হইয়া উঠে। ফুলাদির পক্ষে পাতাসার যেরূপ উপকারী,শাক সবজীর পক্ষে আবার পুরাতন গোবরসার সেইরূপ ফলদায়ক। অতএব শাক সবজী আদির জন্য পাতাসারের পরিবর্ত্তে যে পরিমাণে মাটি হইবে, তাহার সিকি ভাগ গোবরসার দিলে যথেষ্ট উপকার হইবে। টবে মাটি সাজাইবার সময় অন্যূন এক অঙ্গুল পরিমাণে টব খালি রাখিয়া মাটি পূর্ণ করিবে। মাটি দিয়া তাহার উপর অল্প করিয়া চাপিয়া দিবে। এইরূপভাবে টবে মাটি দেওয়া হইলে, তাহাতে যে কোন বীজাদি রোপণ করিবে।

টবে বীজ পুঁতিয়া জল দিতে হইলে হাতে করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে আস্তে আস্তে দিতে হইবে, উহা এরূপ হিসাবে দিতে হইবে, তদ্দ্বারা বীজাদি স্থানান্তরে সরিয়া অথবা মাটির নিম্নে প্রবেশ করিতে যেন না পারে। তাহার পর বীজ হইতে চারা যেমন সবল হইয়া উঠিবে,তখন সরুধার বোমায় করিয়া তাহাতে জল সেচন করিবে। টবে অধিক পরিমাণে জল দেওয়ার আবশ্যকতা হয় না। যে পরিমাণে জল দিলে টবের মাটি সকল ভিজিতে পারে, তাহার পক্ষে সেই যথেষ্ট। আর অতিরিক্ত জল দিলে তাহা তলার ছিদ্র দিয়া বাহির হইতেও পারে। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, টবের তলা বন্ধ করিতে বলা হইয়াছে বলিয়া, কেহ যেন এরূপভাবে বন্ধ না করেন যেন একেবারেই উহা হইতে জল সঞ্চারিত হইতে না পারে। কারণ একেবারে রুদ্ধ হইলে অতিরিক্ত জলসংযোগে টবের গাছ নষ্ট হইতে পারে, আর ছিদ্রটী খুলা থাকিলে জলসংযোগে টবের মাটী ধুইয়া বাহির হইতে থাকিবে

এবং ক্রমে ক্রমে মাটি ধুইয়া আসিয়া উক্ত ছিদ্র একেবারেই বন্ধ হইতেও পারে। এজন্য উহা এরূপভাবে বন্ধ করিবে যেন কঠিনরূপে রুদ্ধ না হয়।

টবে বীজ রোপণ করিয়া দিবসে উহা ছায়াযুক্ত স্থানে এবং রৌদ্র নরম পড়িলে বাহিরে রাখিতে হয়। চারা দুই চারিটী পাতা ধরিলে তখন ক্রমে ক্রমে উহা টব সমেত রৌদ্রে রাখিয়া রৌদ্র লাগা অভ্যাস করাইতে হইবে। এইরূপ নিয়মে টবের গাছ সকল প্রখর রৌদ্র সহ্য হইলে, মরণের বড় আশঙ্কা থাকে না।

টবের মাটির অবস্থা দেখিয়া জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। টবের মটি আঁটিয়া গেলে, আস্তে আস্তে তাহা খুসিয়া দিতে হয়।

কোন্ গাছের পক্ষে কোন্ প্রকার টব আবশ্যক, তাহা গাছের প্রকৃতি অনুসারে ব্যবস্থা করা উচিত? অর্থাৎ যে সকল গাছ বড় হইয়া থাকে, তৎসমুদায় মাটিতে রোপণ করা প্রশস্ত। বড় গাছের শিকড়সমূহ টবের মধ্যে যথেচ্ছভাবে বিস্তরিত হইতে পারে না। অল্প পরিমিত স্থানে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর জড়িত হইয়া থাকে, সুতরাং পর্য্যাপ্তপরিমাণে গাছ বাড়িতে কিম্বা তেজস্কর হইতে পারে না। যে সকল গাছের কাট শক্ত নহে অর্থাৎ চন্দ্রমল্লিকা, পটুলিকা, য়্যাষ্টার, ডালিয়া প্রভৃতি গাছ ছোট ছোট টবে পুঁতিলে কোন অনিষ্ট হয় না। যে গাছের শিকড় যে পরিমাণে নিম্নে গমন করে তাহাদিগের জন্য সেই পরিমাণে গভীর টব আবশ্যক। আর যাহাদিগের শিকড় মাটির অধিক নিম্নে গমন না করিয়া উপরে সঞ্চারিত হয়, তাহাদিগের জন্য অগভীর টব প্রয়োজনীয়। সহজ কথায় এইটী মনে রাখা উচিত বড় গাছের জন্য বড় টব, আর ছোট গাছের জন্য ছোট টব।

প্রতি বৎসর টবের মাটি ঝাড়িয়া নূতন মাটি দিতে হয়। টবের মাটি পরিবর্ত্তনের পক্ষে কার্ত্তিক মাসই প্রশস্ত। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে, টবের মাটি ঝাড়িয়া পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ সারমাটি প্রস্তুত করতঃ টব পূর্ণ করিতে হয়। এবং গাছের গোড়ার মাটি কতক ঝাড়িয়া ফেলিয়া যে সকল শিকড় চারি দিকে বাহির হইয়া থাকে, তদসমুদায় কাটিয়া দিতে হয়।

ক্রমশঃ।

স্কোয়াস।

(Squash.)

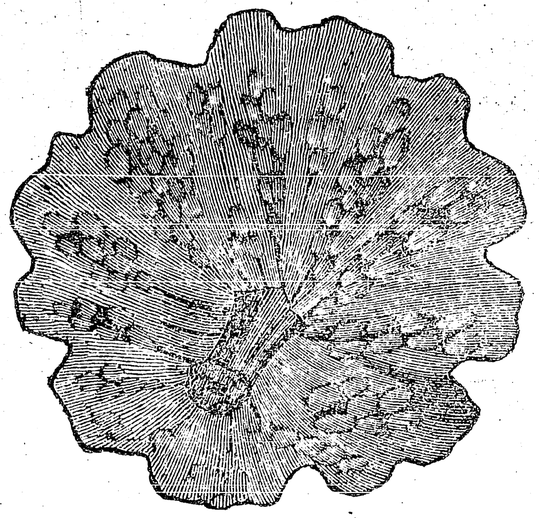

আমেরিকায় এক প্রকার কুমড়া জন্মে, তাহাকে স্কোয়াস্ কহে। স্কোয়াসের যেরূপ আকার তাহার চিত্র উপরে অঙ্কিত হইল। সাঁচি কুমড়া কিম্বা বিলাতি কুমড়ার ন্যায় স্কোয়াসের আকার তত বৃহৎ নহে। উহা ছোট ছোট আকারে জন্মিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে চাকি কুমড়াও কহিয়া থাকেন। স্কোয়াস অতি সুখাদ্য; তরকারীতে ব্যবহার হয়, বিলাতি কুমড়ার ন্যায় স্কোয়াস রন্ধন করিয়া খাইলে তরকারী সুখাদ্য হইয়া থাকে। ইহার রন্ধনে কোন রূপ বিশেষ পারিপাট্য নাই। কএক বৎসর হইল পাইকপাড়া নর্শরিতে এই নূতন জাতীয় কুমড়ার বীজ আনীত হইয়া এদেশে ইহার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, জলবায়ুও উত্তাপের পরিবর্ত্তে এদেশে ইহার ফলনের কোনরূপ ব্যতীক্রম হয় না। এদেশের জল বায়ুতে উত্তমরূপ স্কোয়াস জন্মিয়া থাকে।

স্কোয়াসের মধ্যে আবার কএকটী শ্রেণী আছে যথা; গল্ডেন ক্রুকনেক স্কোয়াস [Golden Crookneck squash) বোষ্টন ম্যারো স্কোয়াস (Boston marrow squash) টার্বনস্কোয়াস (Turban squash) এইসকল জাতীয় স্কোয়াসই প্রধান। জাতি অনুসারে উহাদিগের আকার-গত গঠন প্রণালীর

প্রভেদ দেখা যায়। যে কএক প্রকার স্কোয়াসের নাম উল্লেখ করা হইল, তরকারীতে সকল গুলিই উৎকৃষ্ট।

স্কোয়াসের একটী বিশেষগুণ এই যে, অতি ছোটগাছে ফল হইয়া থাকে। দেশী কিম্বা বিলাতী কুমড়ার ন্যায় ইহার গাছ তত বড় হয় না। গাছ সামান্যাকারের হইয়া থাকে। গাছের ধরণ, পাতা ও লতাদি অন্যান্য কুমড়া গাছের ন্যায়। গাছ অত্যন্ত বড় হইলে দশ বার হাতের অধিক প্রায়ই বাড়ে না। সচরাচর তিন চারি হাত লম্বা গাছে স্কোয়াস ফলিতে দেখা গিয়াছে। এমন কি অনেকে ইচ্ছা করিলে টব বা গামলায় গাছ করিয়া স্কোয়াস ফলাইতে পারেন। গাছে দশ বারটী পাতা হইলে ফুল হইয়া ফল ধরিতে আরম্ভ হইয়া থাকে। লতার প্রায় প্রত্যেক গাঁইটে গাঁইটে ফল ধরিয়া থাকে। স্কোয়াস চাষের একটী বিশেষ গুণ এই যে, অল্প পরিমিত স্থানে গাছ করিয়া ফললাভ করিতে পারা যায়। গৃহস্থ মাত্রেরই বাড়ীতে এই চাকি কুমড়ারগাছ করা আবশ্যক। বিনা পরিশ্রম ও বিনা ব্যয়ে অনায়াসেই উত্তম একটী তরকারী লাভ করা যায়, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থগণের সুবিধা আর কি আছে!

এই কুমড়ার চাষে বিশেষরূপ কোন নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় না। বিলাতী কুমড়া যেরূপ নিয়মে রোপণ করিতে হয়, স্কোয়াসের পক্ষেও প্রায় সেই রূপ নিয়ম। বালুকা ও গোবর সার সমান ভাবে মিশাইয়া এক একটী মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। মাদার মাটী একটু গভীর করিয়া খনন করিলে গাছের পক্ষে সুবিধা হয়। যে কোন গাছের গোড়ার মাটী আলগা পাইলে, শিকড়সমূহ সহজে বৃদ্ধি পাইতে পারে। বিশেষতঃ লতা ও যেসকল উদ্ভিদের মূল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে আলগা মাটিই প্রশস্ত। পাতাসার দিলেও স্কোয়াসের উপকার হইতে পারে। ফলতঃ পাতা সার ও গোবর সার ইহাদিগের মধ্যে যাহাই হউক, স্কোয়াসে ব্যবহার করিলে গাছের উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। গোবর সার মধ্যে অত্যন্ত পুরাতন সারই গাছের পক্ষে অনুকুল। উহা টাটকা হইলে, উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রভূত অপকার হইয়া থাকে। টাটকা সারের তেজে গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যঘাত জন্মে, এবং উহাতে জল পড়িলে পোকা জন্মিয়া থাকে। এজন্য গোবর সার পুরাতন অবস্থায় অধিক উপকারী।

এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, সার উপকারী বলিয়া যে কোন উদ্ভিদের পক্ষে পরিমিত নিয়মে সার দেওয়াই কর্ত্তব্য। উদ্ভিদ্ মূলে অতিরিক্ত সার দিলে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইয়া ফল ধরে না। সার-জনিত গাছের তেজবৃদ্ধি হইলে, পাতা ছিঁড়িয়া দিলে সে দোষ নষ্ট হইতে পারে। অনেক গাছের চারার অবস্থায় পিপীলিকা ও অন্যান্য কীট লাগিয়া গাছের অপকার সাধন করিয়া থাকে, এজন্য ছাই গাছের উপর ছড়াইয়া দিতে হয়। স্কোয়াসের গাছে উপরিলিখিত দোষ ঘটিলে উক্ত দোষ নিবারণের যেরূপ ব্যবস্থা বলা হইল, সেইরূপ নিয়মে কাজ করিলে সকল দোষ কাটিয়া যাইবে।

এদেশে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে স্কোয়াস রোপণ করিতে হয়। এক একটী মাদায় অধিক বীজ রোপণ করা উচিত নহে। কারণ এক স্থানে অধিক গাছ রোপিত হইলে, গাছের ভাল তেজ হয় না। বীজ রোপণ করিতে হইলে একেবারে সমুদায় বীজ না পুঁতিয়া অগ্রপশ্চাৎ করিয়া রোপণ করা ভাল। এরূপ করিয়া রোপণ করিলে এই সুবিধা হয় যে, একটী গাছ ফলিয়া মরিতে আরম্ভ হইলে, সেই সময়ে আবার নূতন গাছ তেজ করিয়া ফলিতে থাকে। বঙ্গদেশের সকলস্থানেই স্কোয়াস জন্মিতে পারে। আমরা আশা করি এদেশে এই নূতন তরকারীর চাষ বৃদ্ধি হইয়া লোকের উপকার হইতে থাকুক।

ভিক্টোরিয়া পদ্ম।

(VICTOREA REGEA.)

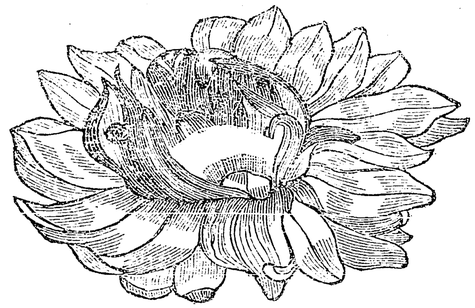

জলজ পুষ্পের মধ্যে পদ্মের ন্যায় সুন্দর পুষ্প আর দেখা যায় না। পদ্ম নানা জাতীয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই ফুলের পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে শির্ষ লিখিত অদ্ভুদ পদ্মের বৃত্তান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

কমলিনীর জগদ্বিখ্যাত শোভা ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, কোন পুষ্প তাহার অসামান্য সৌন্দর্য্যের তুল্যতা প্রার্থনা করে নাই; সকলেই অবনত মস্তকে "পুষ্পরাজ" বলিয়া ইহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কল্পিত পারিজাত পুষ্পশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরন্তু তাহা সত্য পদার্থ নহে; সুতরাং পদ্মের সহিত তাহার বিরোধ নাই; পরন্তু থাকিলেও বিষ্ণু দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি পুরাণোক্ত দেবদেবী মাত্রেই পারিজাতের পরিবর্ত্তে স্ব স্ব দেহে পদ্ম ধারণ করিয়াছেন, অতএব তাহার শ্রেষ্ঠত্ব দেবতা দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে মানিতে হইবে। এই পুষ্পের জন্ম স্থান ভারতবর্ষ ও মিসর দেশ। ঐ উভয় স্থানের নদী তড়াগ সরোবর প্রভৃতি জল পূর্ণ স্থান কমলিনীর সুচারু কান্তিতে মরকতেরও কান্তি ভ্রষ্ট করিয়াছে। পরন্তু সম্প্রতি প্রাগুক্ত দেশদ্বয়ের পদ্মিনী তাহার নব্য ভগিনী ভিক্টোরিয়া পদ্মিনী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছে। ঐ নূতন কুসুম দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত গায়েনা প্রদেশ হইতে সমানীত হয় এবং তত্রত্য তটিনীকুলই [illegible]হার বাসস্থান। বিংশতি বৎসর হইল শুএ-ম্বর্ক নামা একজন উদ্ভিদ্‌বেত্তা গায়েনা প্রদেশের বর্বিস নদী মধ্যে ইহাকে প্রথম দর্শন করেন এবং তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া লেখেন "এই নদী মধ্যে

প্রবেশ করিতে আমার যে অসহ্য ক্লেশ হইয়াছিল এই অপূর্ব্ব পুষ্প দর্শনে আমি তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ বিস্মৃত হইলাম। তখন বোধ হইল যে আমি অমূল্যনিধি পাইয়াছি; ইহা দ্বারা সকল শ্রম দূরীকৃত হইতে পারে। ফলতঃ ত্রয়োদশ হস্ত পরিধিপরিমিত এক একটী পত্র, এবং মধ্যে মধ্যে অলিকুল পরিবেষ্টিত চমৎকার সুন্দর আড়াই হস্ত পরিধি পরিমিত পদ্ম সকল দেখিলে কে না আনন্দে বিহ্বল হয়?

উক্ত পুষ্পের সুগন্ধি অত্যন্ত মনঃপ্রফুল্লকর এবং বর্ণও অতীব মনোহর। ইহার প্রস্ফোটন দিবসে, ইহার মধ্য ভাগের বর্ণ পদ্মাভাবিশিষ্ট ও অপর অংশ শুক্ল বোধ হয়; দ্বিতীয় দিবসে ঐ বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পদ্মাভ হয়। পত্রের উর্দ্ধ ভাগের বর্ণ হরিৎ এবং নিম্ন ভাগের বর্ণ রক্ত এবং তাহার সর্ব্বত্র কণ্টকে পরিবেষ্টিত।

শুত্রম্বর্ক সাহেব এই মনোহর পুষ্প দ্বারা ভিক্টোরিয়া মহারাণীর নাম চিরস্মরণীয় করণাভিপ্রায়ে ইহার নাম "ভিক্টোরিয়া পদ্ম" রাখিয়াছেন। ইহার নিকট জাতি এতদ্দেশীয় নীল পদ্ম। সম্প্রতি ঐ পুষ্প ঐ পুষ্পলতা এতদ্দেশে আনীত হইয়া শিবপুরস্থ কোম্পানির বাগানে তথা কোন কোন ধনাঢ্যের উদ্যানে রোপিত হইয়াছে! বোধ হয় কিয়ৎকালের মধ্যে তাহা এতদ্দেশে সুপ্রাপ্য হইবে। উহার রোপণার্থে গোময় পঙ্ক ও বোদ মৃত্তিকা তুল্যাংশে মিশ্রিত করত এক গামলায় রাখিয়া তাহা জলে পরিপূর্ণ করিতে হয়। পরে প্রস্তাবিত পদ্মবীজ উৎতপ্ত জলে ক্ষণকাল সিদ্ধ করিয়া ঐ গামলায় প্রোথিত করা আবশ্যক। চারা প্রস্তুত হইলে এক অগভীর পুষ্করিণীর গর্ভে পূর্ব্ববৎ প্রকারে গোময় পঙ্ক ও বোদ মাটি দিয়া তাহাতে ঐ চারা রোপিত করিতে হয়। কর্কটী এই পদ্মের বিশেষ শত্রু, অতএব তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষি ও বাণিজ্য—শ্রেষ্ঠ কি?

বোধ হয় পাঠকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে কৃষি ও বাণিজ্য উভয়ই ধনাগমের প্রধান কারণ; কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ, কোনটী অত্যাবশ্যক, কোন্‌টীর বা তত প্রয়োজন হয় না অথবা কোন্‌টী না হইলে নয়, কোন্‌টী না হইলেও চলিতে পারে এই বিষয়ের মীমাংসায় সাধারণ

মধ্যে মত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। অনেকে বাণিজ্যকে দেশের ধনাগমের প্রধান সোপান বলিয়া উল্লেখ করেন—পণ্ডিতেরাও বলিয়া থাকেন, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী!" আমরা একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমরা বাণিজ্যকে ধনাগমের একমাত্র বা মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করি সুতরাং বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির অধিক আদর করি! বাণিজ্য ধনাগমের প্রশস্ত বর্ত্ম এ কথা আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু বাণিজ্য কৃষির ন্যায় ধনরত্নপ্রসবিণী নহে। বাণিজ্যে কৃষির আদর বৃদ্ধি হয়—গৌরব উপলব্ধি হয়—উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়; পক্ষান্তরে কৃষিই বাণিজ্যের প্রাণ। কৃষি যদি আমাদিগকে বাণিজ্যের উপযোগী সামগ্রী সমূহ প্রদানে ক্ষান্ত হয়, তবে আমরা কি লইয়া বাণিজ্য করিব? আজি যদি আমরা সকলে মিলিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হই আর কৃষি বিষয়ে সকলেই উদাসীন হন, তাহা হইলে আমরা বাণিজ্যের উপকরণ কোথায় পাইব? তাহা হইলে আমরা কোন্ বস্তু অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা পরিচালনা করিব? কোন্ বস্তু লইয়া আমরা দূর দূরান্তরে গমন করিব আর তত্তৎ স্থান হইতে কোন্ বস্তুর বিনিময়ে আমরা প্রচুর অর্থরাশি আনয়নকরত দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করিব! নিশ্চয়ই তাহা হইলে দেশময় হাহাকার শব্দ উঠিবে—আমাদের চেষ্টা বিফল হইবে—বাণিজ্যের সমাপ্তি হইবে—জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে—মানবজীবনে যবনিকা পড়িয়া যাইবে। সংক্ষেপতঃ কৃষি ব্যতীত বাণিজ্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে। তাইবলি বাণিজ্যের দ্বারা দেশে প্রচুর পরিমাণে অর্থরাশি আনীত ও সঞ্চিত হইলেও বাণিজ্যের অভাবে ধনবৃদ্ধির পথ সঙ্কোচিত হইলেও—বাণিজ্য-বিহনে কৃষির সম্মাননার হ্রাস হইতে থাকিলেও, আমরা বাণিজ্যকে ধনাগমের মূল কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি না—বাণিজ্যকে কৃষির ন্যায় আদর করিতে পারি না। পক্ষান্তরে, বাণিজ্য ব্যবসা যদি একেবারে বন্ধ করিয়া সকলেই কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে বিষয় ও অবস্থা বিশেষে যৎসামান্য কষ্ট হইলেও হাহাকার শব্দ দেশময় প্রতিধ্বনিত হয় না বরং বৃথাভিমান, উচ্চনীচ জ্ঞান, স্বার্থপরতা, দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি জাতীয় অসাম্যের মূল সমূহের উচ্ছেদে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অত্যাশ্চার্য্য নির্ম্মল ও পবিত্র সাম্য-

মূর্ত্তির আবির্ভাবের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অধিকন্তু চতুরতা, কপটতা, স্বার্থপরতা, কুটিলতা প্রভৃতিই বাণিজ্যের ভূষণ—কিন্তু কৃষিকার্য্যে সরলতা, বদান্যতা, নম্রতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি প্রকৃতির চিত্র জাজ্জ্বল্যরূপে প্রতিভাত হয়। কৃষিতে আত্মার উন্নতি—বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে এতদ্দ্বারা আমরা বাণিজ্য ব্যবসায়ের নিন্দা করিতেছি কিম্বা বাণিজ্যানুরক্ত ব্যক্তিবৃন্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত করিতেছি। আমরা এই প্রবন্ধে কৃষি বাণিজ্যের তুলনায় সমালোচন করিতেছি বলিয়াই এতদ্রূপ লিখিতেছি। আমরা বাণিজ্যের গুণ গরিমা বিস্মৃত হইয়া এই সমস্ত কথা লিখিতেছি, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে বাণিজ্য অভাবে কৃষির অস্তিত্ব যেরূপ সম্ভবপর, কৃষি অভাবে বাণিজ্যের অস্তিত্ব সেরূপ সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন ভারতে কৃষির যেরূপ আদর ছিল, বাণিজ্যের তত নহে। তৎকালে ভারতে আদৌ বাণিজ্যের আবশ্যক ছিল না, কারণ অভাব পূরণের জন্যই বাণিজ্যের প্রয়োজন। যে দেশবাসীগণের সুখে জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে কোন প্রকার কষ্ট নাই—কোন প্রকার অভাব বোধ নাই, সে দেশে বাণিজ্যের আবশ্যক হয় না। ধনরত্নপ্রসবিণী প্রাচীনা ভারতের কিসের অভাব ছিল? ভারতমাতা তাঁহার সন্তানবৃন্দকে কোন বিষয়ের জন্য পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখেন নাই-তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী প্রচুরপরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের উর্ব্বরা ভূমি, ভারতের অনুকূল জল বায়ু, নিত্য আবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্য প্রসব করিয়াছিল—প্রাচীন ভারতের কোন বিষয়ের অভাব ছিল না। সমুন্নত হিমাচল যে ভারতের শিরদেশ, কাশ্মীর যাহার শ্রবণাবতংস, সিন্ধু যাহার আনন্দাশ্রুধারা, গঙ্গা ও নর্ম্মদা যাহার হৃদয়রমনী, গলকণ্ঠ হীরকমণি যাহার মেখলা, স্বর্ণময়ী-লঙ্কা যাহার পাদসিঞ্চিনী এবং পদ্মপরিমল যাহার বদন সুরভি, সে ভারতলক্ষ্মীর অভাব সম্ভবপর নহে। ফলতঃ ভারতে তৎকালে কৃষিবিদ্যার ভূয়সী অনুশীলন ছিল—কৃষিকার্য্যে সাধারণের যত্ন ছিল, কৃষিকার্য্যের বিশেষ আদর ছিল-সম্মান ছিল, তাই কৃষি ভারতীয়গণের যাবতীয় অভাব পূরণকরিত তাহা-

দিগকে কোন বিষয়েরই জন্য পরের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না। প্রাচীন ভারতে কৃষিই একমাত্র উপজীবিকা ছিল। অতি প্রাচীন—জগতের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে ভারতীয় আর্য্যগণ কৃষিকার্য্য সম্পাদনের সুবিধার্থ দেবতার নিকট জল প্রার্থনা করিতেন। তদ্ভিন্ন মনুসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, পরাসরসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার ভূয়সী উল্লেখ আছে। ফলতঃ কৃষিই তৎকালে তাহাদের যাবতীয় অসদ্ভাব নিরাকরণ করিত সুতরাং বাণিজ্যের প্রয়োজন হয় নাই কাজেই ইহার প্রসার বা প্রচার ছিল না। উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে পাঠকগণ অবশ্যই বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন।

কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই আদরের সামগ্রী কৃষির কি অবনত অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে—কৃষির কি প্রকার অনাদর হইয়াছে আর এই স্বর্ণময়ী ভারতের কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে! যে কৃষিকার্য্যের উন্নতি-সাধনে ফলমূলাহারী ও নির্ঝরের নির্ম্মল জলপায়ী ভারতীয় আর্য্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—যে কৃষির উৎকর্ষসম্পাদনে পূর্ব্বতন আর্য্যসন্তানেরা জীবনের যাবতীয় সুখ বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই—যে কৃষি ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিল—যে কৃষি ভারতকে ধনরত্ন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিল, যে ঐশ্বর্য্য যুগ যুগান্তর হইতে বিদেশীয়গণ লুণ্ঠন করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই; সেই আদরের ধন কৃষির আজ কাল কয় জনে আদর করে—সেইকৃষিকার্য্যে আজ কয়জনে নিমগ্ন—সেই অর্থকরী কৃষিবিদ্যা আজ কয়জনে অনুশীলন করে? আর অনুশীলন করে না বলিয়াই ভারতের এ দুর্গতি! কি লজ্জার কথা, যে ভারত কৃষিবিষয়ে জগতের শিক্ষা গুরু, সেই ভারতের বংশধরগণকে কৃষিবিদ্যা অনুশীলন জন্য বিদেশে বিজাতীয়ের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে! কি আক্ষেপের কথা, আজ ভারতে কৃষির আদর নাই, কৃষকের সম্মান নাই! অধুনা কৃষি অবজ্ঞার কার্য্য, কৃষক চাষা বলিয়া অভিহিত, সমাজ মধ্যে ঘৃণেয় ও সভ্যসমাজ বহির্ভূত! কৃষির এ প্রকার দুরবস্থা সংঘটিত হইল কেন? কৃষির অবনতির কারণ কি? ইদানীন্তন সকলে রত্নপ্রসবিণী কৃষিবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া কেন শ্বেতপদ লেহনে অনুরক্ত? এ সমস্তের বিস্তারিত আলোচনা [illegible] করিবার আমাদের

বাসনারহিল, অদ্য ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে আমাদের অমনোযোগ ও অযত্নই কৃষির অবনতির মূল কারণ। দাসত্ব ব্রত এক্ষণে আমাদের অতি প্রিয় হইয়াছে—দাসত্বই এক্ষণে আমাদের অবলম্বন হইয়াছে—দাসত্বের আশয়ে আমরা প্রাতঃকাল হইতে সায়ংসময় পর্য্যন্ত আফিসে আফিসে ঘুরিয়া বেড়াইব--তোষামোদের বজরা মস্তকে বহন করিয়া ঘুরিব—কত লাঞ্ছনা, তিরস্কার, গালাগালি অম্লানবদনে ভোগ করিব, তথাপি সাধের দাসত্বরত্নকে পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্যে মনোভিনিবেশ করিব না। যে কৃষি প্রচুর অর্থ প্রসব করে, তাহা আমাদের পরিত্যেজ্য কিন্তু দাসত্ব করিয়া আমরা একসন্ধ্যা অর্দ্ধপেটা আহার পাই তাহাও শ্রেয়—তাহাই আমাদের বাঞ্ছনীয়; আর তদ্ধেতুই আমাদের এদুর্গতি হইতেছে—দিন দিন অবনতি হইতে অধিকতর অবনতি ঘটিতেছে—দেশ নির্ধন হইতেছে। পক্ষান্তরে বিদেশীয়গণ আমাদের উলঙ্গ চক্ষুর সম্মুখে আমাদিগেরই ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থরাশি সংগ্রহ করিতেছে; আর আমরা তাহা দেখিয়া শুনিয়াও উদাসীন রহিয়াছি। আজ কাল চাকুরীর লালসায় পিপিলিকা দল সদৃশ যে অগণ্য যুবক ঘুরিয়া বিফল মনোরথ হইতেছেন, তাঁহারা যদি কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও উপকার এবং দেশেরও উপকার উভয়ই সংসাধিত হয়—উদরান্নের জন্য কাহাকেও আর কাঁদিতে হয় না।

ভারতবাসীর এক্ষণে চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে, ভারতবাসী এক্ষণে বুঝিয়াছে যে বিদেশীয় ধনলুব্ধবণিক সম্প্রদায় আমাদের সর্ব্বস্বগ্রাস করিতেছে, তাই বলি ভারতবাসীগণ আর উদাসীন কেন? ভারতের সেই উর্ব্বরা ক্ষেত্র, সেই অনুকূল জল বায়ু তাপ এখনো রহিয়াছে, আমরা যত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে এই ভারতে আবার স্বর্ণ প্রসূত হইবে—আবার ভারতের উন্নতি হইবে। কৃষিই আমাদের জীবন, কৃষিই আমাদের আশা ভরসা, তবে কৃষির উন্নতিকল্পে আমাদের উদাসীন থাকা কোন মতে যুক্তি সিদ্ধ নহে।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল সিংহ।

আসাম জাত রবর।

আসাম অঞ্চলের অরণ্যে ও বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বভাবত বহুল পরিমাণে বটবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। এই সকল বৃক্ষের মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। এ প্রদেশে যে কএক রকম বটবৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে চারিপ্রকার গাছ হইতে রবর জন্মিয়া থাকে; আসামী ভাষায় ঐ সকল গাছের পৃথক পৃথক নাম আছে; যথা বামণী বড়, ধোপা বড়, ছিকা বড়, ঠুরি বড়। বামণী বড় শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। এই জাতীয় গাছের পত্র লম্বা এবং তদ্‌গ্রভাগস্থ হুলটী দীর্ঘ হয়। ধোপা বড়ের গাছ যদিও বামনী বড়ের ন্যায় বৃহৎ আকার বিশিষ্ট, কিন্তু তাহার পাতা তত দীর্ঘ নহে, পরন্তু অধিক পরিমাণে চৌড়া। রবরের জন্য এই দুই জাতীয় গাছই প্রধান। এই সকল গাছে আঠারন্যায় যে একপ্রকার দুগ্ধবৎপদার্থ উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা রবর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছিকা বড় ও ঠুরি বড়ের গাছ তত বড় হয় না। এবং পাতাও অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। আসাম অঞ্চলের জঙ্গলে বট বা বড় জাতীয় যে সকল গাছ জন্মে, তন্মধ্যে কোন কোন জাতীয় গাছ হইতে প্রচুর রবর উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঐ সকল বট জাতীয় গাছ হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হয়, এই আঠা দেখিতে দুগ্ধের ন্যায়। কোন কোন গাছ হইতে এই দুগ্ধবৎ পদার্থ অধিক পরিমাণে নির্গত হয় কোন কোন গাছের দুগ্ধ গাঢ় অপর কোন কোন গাছের দুগ্ধ তরল। বামনী ও ধোপা বড়ের দুগ্ধ অপেক্ষা ঠুরি বড়ের দুগ্ধ ঘন।

যে কএক জাতীয় বটবৃক্ষের নাম উল্লিখিত হইল, তদ্ভিন্ন কটৌ বড় নামে আরও এক জাতীয় বটবৃক্ষ আছে, তাহার পাতা ছোট, ছাল পাতলা ও কাষ্টাংশ অত্যন্ত কঠিন। কটৌবড়ের গাছ অধিক বড় হয়না ইহা হইতেও দুগ্ধবৎ আঠা নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা শুষ্ক হইলে উৎকৃষ্ট রবরের ন্যায় স্থিতিস্থাপকতা গুণবিশিষ্ট হয় না, টানিলে ছিঁড়িয়া যায়। এজন্য তাহাতে রবরের কাজ হয় না। অল্প বয়সের গাছে [illegible] আঠা পাওয়া যায় না।

একটী পূর্ণ বয়স্ক অক্ষত রবর গাছ হইতে প্রতি বৎসর অন্যূন অর্দ্ধমোণ রবর পাওয়া যাইতে পারে। মনুষ্য কৃত অধিক দৌরাত্ম্য না হইলে, এক একটী গাছ অধিক কাল বাঁচিয়া থাকে। রবর জাতীয় বট গাছ হইতে গাছের সকল অংশে সমান রবর উৎপন্ন হয় না। বৃক্ষের যে শাখার গা হইতে শিকড় নামিয়া মাটিতে পড়িয়া মূল গাছ হইয়া উঠে এবং এই উভয় গাছের মধ্যে যে বৃহৎ শাখা থাকে, তাহা হইতে অধিক পরিমাণে দুগ্ধবৎ আঠা নির্গত হয়। গাছের গোড়ায় কিছু কম আঠা পাওয়া যায়। ছোট ছোট ডালে দুগ্ধবৎ পদার্থ পাওয়া যায় না। এবং তদ্‌সমুদায় শাখা কাটিয়া দিলে গাছ মরিয়া যাইবার সম্ভব।

যে নিয়মে রবর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অতি সহজ। রবর জাতীয় গাছের গোড়ার দুই তিন ফিট উর্দ্ধ হইতে উপরের বড় বড় ডাল পর্য্যন্ত দুই তিন ফিট অন্তর অন্তর দা দ্বারা এক একটী ঘা কাটিবে। এমন ভাবে এই ঘা কাটিবে যেন তদ্দ্বারা গাছের ছাল ও কাষ্ঠাংশের মধ্যে যে একটী অত্যন্ত পাতলা ছাল আছে, তাহা যেন কাটিয়া না যায়। কেবল গাছের উপরিকার মোটা ছাল কাটিতে হইবে। উক্ত ঘা এক বিঘত পরিমাণে লম্বা ও দুই অঙ্গুলি পরিমাণ চৌড়া হইবে। এইরূপ হিসাবে ঘা কাটা হইলে, একটী মোটা বাঁসের চুঙ্গার মুখ শূচাল করিরা প্রত্যেক ক্ষত স্থানের নিম্নে এরূপ ভাবে বিদ্ধ করিয়া দিবে যেন ক্ষত হইতে সমুদায় রস বা দুগ্ধবৎ আঠা তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। চুঙ্গার পরিমাণ ও গাছ অনুসারে রাত্রি মধ্যে ঐ দুগ্ধবৎ পদার্থে সমুদায় চুঙ্গাটী পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। পরদিন প্রাতে গাছ হইতে চুঙ্গাটী খুলিয়া আনিয়া তন্মধ্যস্থ দুগ্ধ তসলা কিম্বা অন্য কোন পাত্রে ঢালিয়া আগুনের উপর বসাইতে হইবে, এবং একটী মোটা কাষ্ঠ দ্বারা তাহা অল্প অল্প নাড়িতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় দশ পোনর মিনিট নাড়িলে উক্ত আঠা শুষ্ক হইয়া বৃহৎ একটী গোলা (*cake*) প্রস্তুত হইবে। যদি উহাতে জলীয় অংশ থাকে এরূপ বোধ হয়, তবে কোন ভারি দ্রব্য দ্বারা উহা চাপিয়া রাখিলে জল নির্গত হইয়া যাইবে। এক একটী ক্ষত হইতে বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র দুগ্ধ পাওয়া যায়।

উপরের লিখিত নিয়ম ভিন্ন অন্য প্রকারেও রবর সংগৃহীত হইয়া থাকে,

গাছের সরল ডাল রবর সংগ্রহের পক্ষে ভাল। বাঁকা হইলে বিস্তর রবর নষ্ট হইয়া থাকে। বক্র ডালে ক্ষত করিলে ডালের গায়ে প্রচুর আঠা লাগিয়া যাইতে পারে। এজন্য সরল ডাল রবর সংগ্রহের পক্ষে বিশেষ সুবিধা-জনক। সরল ডালে ক্ষত করিয়া চুঙ্গি না বসাইলে, সেই ক্ষত স্থান হইতে আঠা বা দুগ্ধবৎ পদার্থ গাছের গা দিয়া নীচে আসিতে পারে, এবং রৌদ্র লাগিলে উহা জমিয়া সূত্রবৎ আকারে পরিণত হইয়া থাকে। চতুর্থ দিবসে যখন দেখিবে ঐ আঠা উত্তমরূপ সূত্রবৎপদার্থের ন্যায় জমিয়া গিয়াছে, তখন তাহা নিম্ন হইতে টানিলে সমুদায় জড়াইয়া আসিবে। তখন উহা লাড়ু রবরের ন্যায় (Ball) প্রস্তুত হইবে। ইহাই এক প্রকার খাটি রবর। এই প্রকারে রবর প্রস্তুত করিতে হইলে বিস্তর আঠা লোকসান হইয়াথাকে; কিন্তু কলিকাতায় এইরূপ রবরের মূল্য অধিক। চেপ্‌টা (Cake) রবরের মূল্য অল্প।

আজ কাল রবর যে পরিমাণে ব্যবহার হইতেছে এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে যে প্রকার আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারা যায়, রবরের চাষ একটী প্রধান আয়জনক ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। রবর সংগ্রহ যেরূপ সহজ তাহা দেখান হইল। আসাম অঞ্চলে যে পরিমাণে উহার আদর বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে উক্ত জাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া রবর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। এদেশে চাষ সম্বন্ধে প্রধান দোষ এই যে কোন প্রকার চাষের পরীক্ষা করা হয় না। কোন্ প্রকার চাষে কি প্রকার লাভ হয়, কি উপায়ে ঐ চাষ বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার উপায় অনুসন্ধান না করিলে কোন প্রকার চাষের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। বাজারে রবরের যেরূপ মূল্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই সময় যাহাতে উহার চাষ বৃদ্ধি হয় তদ্‌পক্ষে বিহিত বিধানে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরা কেমন অলস প্রকৃতির লোক যে কোন প্রকার শ্রমজনক কার্য্যে আদৌ প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা যদি ইংরাজদিগের ন্যায় শ্রমশীল এবং অনুসন্ধায়ী জাতি হইতাম, তাহা হইলে আজ উদরান্নের জন্য আমাদিগকে এত [illegible] না। আমরা এমন সোণার দেশ পাইয়াও স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইতে পারিলাম না।

কি বন জঙ্গল, কি লোকালয়, কি ময়দান সকল স্থানেই আমাদের আয়ের উপায়, সুখের উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক একটী বৃক্ষ দ্বারা আমরা অনায়াসেই সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারি, জগদীশ্বর বৃথা কোন উদ্ভিদই সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আমাদের উপকারের জন্য নানাবিধ উপকারজনক বৃক্ষলতা দ্বারা ভারতকানন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যদি কিঞ্চিৎমাত্র মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, আমাদের জীবন যাপনের জন্য জগদীশ্বর বৃক্ষ,লতা প্রভৃতি উদ্ভিদে কতপ্রকার উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীহরিবিলাস আগরওয়ালা।

লতী চালিতা।

চালিতা বা চাল্‌দা বৃক্ষ অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু লতী-চালিতা অনেকেই দেখেন নাই। চালিতা বৃক্ষ বড় বড় আকারে হইয়া থাকে। এক একটী বৃক্ষে প্রচুর ফল ফলিতে দেখা যায়। বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই চালিতাবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। চালিতা গাছের কোনরূপ বিশেষ পাইট করিতে হয় না। চালিতা জাতীয় এক প্রকার লতা আছে, তাহাতে চাল্‌দা ফলিয়া থাকে, এজন্য উহাকে লতীচালিতা কহে। এই লতার কাট কিছু কঠিন, লাউ কুমড়ার লতার ন্যায় কমল নহে। এই লতায় যে চালিতা ফলিয়া থাকে,তাহারগঠন ও আস্বাদন বৃক্ষজাত চালিতারন্যায় প্রায় সমতুল্য। পার্থক্যের মধ্যে ফলের আকার কিছু ক্ষুদ্র এবং তীব্র অম্লবিশিষ্ট নহে। পাতাও চালিতা পত্রের ন্যায়, তবে কিঞ্চিৎ ছোট আকারের; লতা কোন গাছে কিম্বা মাচায় তুলিয়া দিলে চলিতে পারে, ভূমিতে লতাইয়া বেড়াইলেও কোন ক্ষতি হয় না। বৃক্ষের ন্যায় লতায় ফল কম হয় না, এবং অনেক স্থলে অধিক ফলিতে দেখা যায়। একটী লতী চালিতারগাছ বাড়িতে রোপিত হইলে, আবশ্যকীয় ফলের অভাব পূর্ণ হইতে পারে।

কলম দ্বারা এই চালিতার গাছ বা লতা প্রস্তুত করিতে হয়। বর্ষাকালে কলম বাঁধিবার প্রশস্ত সময়। [illegible]ত সহজ উপায়ে কলম তৈয়ার হইতে [illegible]রে। পরিণত লতা অর্থাৎ যে লতার কাষ্ঠাংশ কঠিন হইয়াছে, এরূপ লতা

বাছিয়া তাহাতে কলম বাঁধিতে হয়। দাবা কলম, গুটি কলম, খোঁচা কলম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ইহার কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দাবা কলম করিতে হইলে পরিপুষ্ট লতা মাটিতে শোওয়াইয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন মাটি চাপা থাকিলে লতার গাঁইট হইতে শিকড় নির্গত হইয়া গাছ লাগিয়া যায়। গাছ লাগিয়া গেলে তখন সেই মাটি ঢাকা লতার গোড়ার দিক অর্থাৎ মাটির আচ্ছাদনের পর গাছের দিকে কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার পর সেই শিকড় সমেত ডাল বা লতা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিতে হয়।

গুটি কলম করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ ডালের মধ্যে একটী স্থান ঠিক করিয়া আন্দাজ চারি পাঁচ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানের ছাল তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর সার মাটিতে কাদার দলা করিয়া সেই স্থানটী পুরু করিয়া লেপিতে হইবে। মাটি লেপা হইলে চট কিম্বা নারিকেল ছোবড়ার আঁশ দ্বারা তাহা জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। এইরূপ বন্ধনের পর যদি বৃষ্টি না হয়, তবে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় কিছু দিন অতীত হইলে সেই স্থান হইতে শিকড় বাহির হইবে। শিকড় নির্গত হইলে বন্ধনের নীচে ডালটী কাটিয়া সেই ডালপুঁতিলেই গাছ হইবে।

খোঁচা কলম করিতে হইলে অগ্রে একটী স্থানে হাপোর প্রস্তুত করিতে হইবে। অনন্তর শক্ত লতা বা ডাল কাটিয়া আট দশ অঙ্গুলি পরিমাণ করিয়া তাহা কলম ছেয়া করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে। এবং হাপোরে এক একটী কর্ত্তিত ডাল রোপণ করিতে হইবে। হাপোরে ডাল ঘন করিয়া রোপণ করা উচিত নহে। যদি সর্ব্বদা বৃষ্টি না হয়, তবে ঐ হাপোরে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া মাটি ভিজা রাখিতেহইবে। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিন হাপোরে ডাল থাকিলে তাহা লাগিয়া যাইবে। রোপিত ডালের মূল হইতে শিকড় নির্গত হইবে। এবং ডালের গা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া পত্রাদি বাড়িতে থাকিবে। হাপোরে চারা কিছু বড় হইলে তাহা তুলিয়া স্থায়ীরূপে কোনস্থানে রোপণ করিতে হইবে। এই লতা যেখানে রোপিত হইবে, সেস্থান অর্থাৎ গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। [illegible]ইটের মধ্যে সময়ে সময়ে গোড়া

খুসিয়া দেওয়া এবং কার্ত্তিক মাসে মূল দেশে গোবরের সার দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হয়।

চারা প্রস্তুতের উপায় জানা থাকিলে একটী লতা হইতে বহুতর গাছ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পাইকপাড়া নর্শরিতে এই লতীচালিতার চারা বিক্রীত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে চা'র চাষ। *

লণ্ডন ডেলিনিউসে এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, সাতচল্লিশ বৎসর গত হইল, ভারত বর্ষে চা আবাদের নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাব হয়, কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডে যত চা কাট্‌তি হয়, তাহার তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষ হইতে যাইতেছে। ১৮৭০ অব্দে ইংলণ্ডে সমস্ত চা আমদানির দশমাংশ মাত্র ভারতবর্ষ হইতে যাইত, কিন্তু এই কয় বৎসরের ঐ আমদানির পরিমাণ দেড় আনা হইতে পাঁচ আনায় উঠিয়াছে। সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল, চীনেরা প্রথমে চার ব্যবহার ও আবাদ করিতে আরম্ভ করে। ৮৫০ খৃঃ অব্দে সলিমান নামা এক জন আরবীয় সওদাগর পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ঐ চার বিষয় অবগত হয়; এবং সেই ব্যক্তিই পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে ঐ চার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু ১৬৬০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে কখন চার আমদানী হয় নাই। ইংলণ্ডে প্রথম যখন চার আমদানি হয়, তখন পার্লেমেণ্টের আইন অনুসারে উহার উপর প্রতি গ্যালনে আট পেন্স শুল্ক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এইরূপ কথিত হয়, ওলন্দাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমতঃ ইউরোপে চার আমদানি করে। ১৬৬৪ অব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজসরকারে দুই পাউণ্ড চা উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে উক্ত কোম্পানি ৫ হাজার পাউণ্ড চা স্বদেশে লইয়া যান। ঐ সময় অবধি ১৮৩৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে চীনের চাই ব্যবহৃত হইত; এবং ইংলণ্ডীয় লোকেরা চীনের চা-র বিষয়ই অবগত ছিল। পরে ঐ শেষোক্ত বৎসরে ভারতবর্ষীয় চা-র নমুনা ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছে। প্রথম প্রথম এই চা

* বর্ত্তমান বৎসরের ১৩ই [illegible] এডুকেশন গেজেট দেখ।

তথায় অতি উচ্চ দরেই বিক্রীত হইয়াছিল—১ পাউণ্ড চা ৮ হইতে ৩৬ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইয়াছিল।

প্রায় ষাট বৎসর গত হইল, যখন চীনের সহিত ইংরাজদিগের বাণিজ্যঘটিত বিবাদ হয়, সেই সময়ে ইংলণ্ডের একটী সভা এমন অঙ্গীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ভারতবর্ষ, আমেরিকা, বা অন্য কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে উত্তম চা প্রস্তুত করিতে পারিবে, তাহার সেই প্রস্তুত চা অন্যূন বিশ পাউণ্ড হইলেই তাহাকে একটী স্বর্ণ পদক ও পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। ঐ পুরস্কারের বিজ্ঞাপন পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিশ বৎসর পরে ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের চেষ্টা হইয়া এই খানেই ঐ পুরস্কার প্রদত্ত হয়।

অনেকে বিবেচনা করেন. আসামে বন্য চার গাছেরচারা আবিষ্কৃত হইয়া অবধি ভারতবর্ষে উহার চাষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পূর্ব্বাবধিই এ দেশে উহা উৎপাদনের চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। গত শতাব্দীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি চীন দেশ হইতে ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ উভয়ত্রই কতকগুলি চার চারা আনয়ন করেন। ১৭৮০ অব্দে তৎকালীন কলিকাতার রেসিডেণ্ট এবং উদ্ভিজ্জতত্ত্ববিদ্ কর্ণেল কিড্ সাহেব ঐ চারার কতকগুলি আপন উদ্যানে রোপণ করিয়াছিলেন। উহার দুই বৎসর পরে তিনি ঐ বাগান কলিকাতার কর্ত্তৃপক্ষকে অর্পণ করেন। এক্ষণে ঐ বাগান বোটানিকেল গার্ডেন বা কোম্পানির বাগান নামে পরিচিত হইয়াছে। ঐ বাগানে চার চাষ করিয়া দেখা হয় যে, কলিকাতা অঞ্চলের মাটী ও জল বায়ু ঐ চাষের উপযোগী নহে; এবং এমন বিবেচনা হয় যে, অধিকতর সমশীতোষ্ণ স্থানে এবং অধিকতর আর্দ্র বায়ুতে ঐ চাষ ভাল হইতে পারে। অনন্তর ডিরেক্টরদিগকে অনেক লেখালেখির পর তাঁহারা ভারতবর্ষে চার চাষ পরীক্ষা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমতঃ ঐ বিষয়ে শৈথিল্য করিয়াছিলেন, কারণ তখন তাঁহাদের চীনের চার একচেটিয়া ১৮৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত থাকে, এবং সে পর্য্যন্ত তাঁহারা অন্যত্র চা উৎপন্ন করিতে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। [illegible] পরে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে চার চাষে প্রণোদিত করেন। ১৮৩৪ [illegible] গবর্ণমেণ্ট ভারত-

বর্ষে চার আবাদের সম্ভাবিতা নির্ণয়ার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করেন। কমিটী ঐ সম্বন্ধে অনুকূল বিজ্ঞাপনী অর্পণ করিলে ১৮৩৫ অব্দে গবর্ণমেণ্ট আসামের লখিমপুর নামক স্থানে একটী চার বাগান প্রস্তুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সেই অবধিই এখানে প্রকৃত প্রস্তাবে চার চাষের পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পরে ১৮৪৫ সালেও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে চীন হইতে আরও অনেক বীজ আনাইয়া চারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, চীনের চা অপেক্ষাও ভারতবর্ষীয় চা উৎকৃষ্ট হইতেছে।

আসামে যে বন্য চার গাছ ছিল, ১৮৩০ অব্দে তাহার আবিষ্কার হয়। কিন্তু কে আবিষ্কার করে, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ কেহ সি এ ব্রূস সাহেবকে, কেহ বা কাপ্তেন চারল্‌টন সাহেবকে, এবং কেহ কেহ বা আসামীয় মণিরাম দেওয়ানকে আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ব্রূস সাহেবই চা উৎপাদন নিমিত্ত প্রথম পারিতোষিক লাভ করেন।

ভারতবর্ষের চা একবারে এরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই। অনেক দিন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে ইহার উৎকর্ষ প্রমাণ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহা আশু প্রমাণ হইয়াছিল যে, চীনের চারা অধিকতর কোমল, সহজেই নষ্ট হয়; এবং উহার বর্দ্ধন বরং কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেশী বীজের চারা সেরূপ নহে। দেশী বীজের চারার বিঘ্ন কম হয়। অপিচ চীনা চা-গাছ যত শক্ত হয়, দেশী চার গাছ তত দৃঢ় হয় না। কিন্তু এখনও উহার বন্য প্রকৃতি অপসারিত না হওয়ায় উহার বড়ই বাড় হইয়া থাকে। দেশী চা-গাছ সচরাচর ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়; উহা সচরাচর ঝুপরি গাছের ন্যায় হইয়া থাকে। কিন্তু চা-করেরা দেশী গাছকে অতদূর বাড়িতে দেয় না। চারি পাঁচ ফুটের অধিক উচ্চ হইলেই উহাকে ছাঁটিয়া ফেলে। তাহাতে ঐ গাছ ঝুপরি হইয়া পত্রোৎপত্তি ও পত্র সংগ্রহ উভয় পক্ষেই সুবিধা হয়।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট প্রথমে লখিমপুরে সে চার বাগান প্রস্তুত করেন, তাহাতে বড় কৃত কার্য্যতা ঘটে না। অনন্তর আসামের জয়পুর নামক আর এক স্থানে চা-ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে অল্প বিস্তর সফলতা ঘটে। এই [illegible] ১৮৪০ সালে গবর্ণমেণ্ট একটী কোম্পানিকে বিক্রয় করেন। প্রথম

প্রথম উক্ত কোম্পানির বড় লাভ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আসামে চা আবাদের উৎসাহের কিছুই লাঘব ঘটে নাই। নূতন নূতন কোম্পানি হইয়া নূতন নূতন চা-ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। কেবল আসামে নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও চা উৎপাদনের চেষ্টা হইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃই প্রমাণ হইতে লাগিল যে, ভারতবর্ষ চা উৎপত্তির যথার্থ উপযোগী ভূমি। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় চার বাণিজ্যের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

আসামে চা আবাদের সূত্রপাত ১৮৩৫ সালে ধরিতে হয়। অনন্তর কমাউন ও গড়োয়ালে ইং ৫০ সালে; কাছাড় এবং দেরাদুনে ৫৫ সালে; শ্রীহট্টে ৫৭ সালে, কাঙ্গারায় (পাঞ্জাব) ৫৮ সালে; দারজিলিং, টেরাই এবং চট্টগ্রামে ৬০ সালে; মান্দ্রাজের নীলগিরিতে ৬২ সালে; ছোটনাগপুরে ৭২ সালে এবং ভূটান দুয়ার সমূহে ১৮৭৫ সালে চা আবাদের প্রবর্ত্তনা হয়। এবং সর্ব্ব স্থলেই পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ হইয়াছে। দুয়ার প্রদেশে যে চা হয়, তাহা গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু তথাকার আব হওয়া চা উৎপত্তির পক্ষে বড় অনুকূল নহে, সেই কারণে তথায় বেশী চা উৎপন্ন হয় না। পার্ব্বত্য ভূমিতে উৎকৃষ্ট চা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু সমতল ভূমিতে যত অধিক পরিমাণে চা জন্মে, পার্ব্বত্য স্থলে তত নহে। পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্ব্বতময় ক্ষেত্রে যদি ২৮০ হইতে ৩৬০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়, তবে সেই পরিমাণ সমতল ক্ষেত্রে ৪৪০ হইতে ৬৪০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত চা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পর্ব্বত ভূমির চা বড় কড়া হয়, এবং উহার সহিত মৃদু চীনা চা মিশ্রিত না করিলে চলে না। কিন্তু নিম্নভূমির চা সহজেই মৃদু; উহাতে আর মিশাল দিতে হয় না।

চীনের চা অপেক্ষা ভারতবর্ষের চার মূল্য অধিক। ইংলণ্ডে যত চা বিক্রীত হয়, সে সকলে অন্ততঃ সিকি ভাগ ভারতবর্ষীয় চা মিশান থাকে। ভারতবর্ষীয় চার আমদানি যদি বন্ধ করা হয়, ইংলণ্ডের লোকে চার উত্তেজকতা আর অনুভব করিতে পারিবে না।

চা উৎপত্তির অনেক বিঘ্ন আছে। [illegible] বর্ষায় চা ভাল হয় না। আবার অনেকরূপ কীট ধরিয়া উহার পাতা নষ্ট করে। তন্মধ্যে লাল [illegible]

লাগিলে আর রক্ষা নাই। কেহ ঐ মাকড়সার প্রতিকারক ঔষধাদি আবিষ্কৃত করিতে পারিলে তিনি যথার্থই চা-করদের নিকট পুরস্কৃত হন।

অষ্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকাতেও এক্ষণে ভারতবর্ষের চা রপ্তানি হইতেছে।

ইংলণ্ডে প্রতি বৎসর যত চা আমদানি হয়, তাহার কত ভাগ ভারতবর্ষ হইতে এবং কত ভাগ চীন হইতে আমদানি হইয়াছে, ১৮৭১ অব্দ হইতে ১৮১ অব্দ পর্য্যন্ত তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

বৎসর	ভারতবর্ষীয় চা	চীনের চা
	শতকরা	শতকরা
১৮৭১	১১	৮৯
১৮৭২	১৩	৮৭
১৮৭৩	১৪	৪৬
১৮৭৪	১৩	৮৭
১৮৭৫	১৬	৮৪
১৮৭৬	১৭	৮৮
১৮৭৭	১৮	৮২
১৮৭৮	২৩	৭৭
১৮৭৯	২১	৮৯
১৮৮০	২৮	৭২
১৮৮১	৩০	৭০

উপরি উক্ত তালিকায় দৃষ্ট হইতেছে, ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় চার আমদানি ক্রমশঃই বাড়িয়াছে, এবং চীনের চার আমদানি ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে। ১৮৮০ সালে আমদানির সিকি অংশেরও উপর এবং ৮১ সালে প্রায় তৃতীয়াংশ ভারতবর্ষীয় চা। ভারতবর্ষে উক্ত মূল্যবান দ্রব্যের কৃষির ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতে দেশের ধনবৃদ্ধির যে একটী সুষ্ঠ উপায় হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে এমন প্রত্যয় [illegible] দাঁড়াইয়াছে যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীকে চা [illegible] দিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বে চীনের লোক-[illegible] চাবাগানের কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়াইবার আদেশ আনিতে হইত, এখন আর

তাহার আবশ্যকতা হয় না। এখন শিষ্য গুরুকে পরাস্ত করিয়াছে। অনেক বাগানে এখন কলের দ্বারা কার্য্য হইতেছে।

নারিকেল বৃক্ষের উপকারিতা।

গ্রীষ্ম প্রদেশের অধিবাসিগণ নারিকেল বৃক্ষ হইতে তাহাদের জীবনোপায় সংগৃহিত করিয়া লয়। নারিকেলের বহুবিধ কার্য্যোপযোগিতা এ দেশস্থ অনেকেই বিদিত আছেন। নারিকেল বৃক্ষের প্রায় সমুদায় অংশ ব্যবহারে আইসে; অন্য কোন বৃক্ষ এতাদৃশ কার্য্যকারক কিনা তদ্বিষয়ে সংশয় হয়। যাহা হউক ইহার সমুদায় কার্য্যকারিতা এ স্থানে বিবৃত করিলে বোধ হয় পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। এ সম্বন্ধে যে বিবরণটী নিম্নে প্রকটিত হইল, তাহা কোন ইংরাজী গ্রন্থ বিশেষ হইতে সংগৃহীত।

মনে করুন অতিশয় গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মরুভূমি মধ্য দিয়া এক পথিক যাইতেছিলেন। এতাদৃশ রৌদ্র হইয়াছে যেন সূর্য্যদেব চতুর্দ্দিকে অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন; শান্তি ও শীতলতা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং পরিক্লান্ত পথিকের শ্রান্তিদূরোপযোগী লোকালয় বহুদূর সংস্থিত রহিয়াছে। পথিক নিরাশ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে অবশেষে দূরে এক সামান্য কুটীর দেখিতে পাইল। দেখিল কুটীরের চতুর্দ্দিকে সরলকান্তি বিশিষ্ট কতকগুলি বৃক্ষ রহিয়াছে। বৃক্ষের শিরোদেশে বড় বড় পত্রের শ্রেণী শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সরল ঊর্দ্ধভাবে রহিয়াছে এবং অবশিষ্ট গুলি ঝুলিতেছে। ঐ সুদৃশ্য বৃক্ষ ব্যতীত কুটীরের নিকট আবাদ ভূমির অন্য কোন প্রকার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। ইহা অবলোকন করিয়া পথিক পুনর্জীবিত হইল। এবং [illegible] কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া কুটীরবাসীর অতিথি হইল। অতিথি সৎকার বিষয়ে মরুভূমির অধিবাসীরা পরা[illegible] নহে। তৎক্ষণাৎ কুটীরবাসী পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পথিককে ইষদুষ্ণপানীয় [illegible] করায় তিনি বিজাতীয়

তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলে কুটীর বাসী তাঁহাকে আহার করিতে আহ্বান করিল। সে বহুবিধ খাদ্য চিক্কন পিঙ্গলবর্ণ পাত্রে রাখিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিল এবং অতিমধুর সুগন্ধ মদ্য প্রদান করিল। আহারের শেষ সময়ে কতকগুলি রসাল, ফলের শাঁসবৎ অতি কোমল খাদ্য গ্রহণ করিতে দিল। এবং অবশেষে অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় সুরা তাঁহার নিকট আনীত হইল।

এবম্বিধ দ্রব্যাদি মরুভূমি মধ্যে তাঁহাকে কে আনিয়া দেয় পথিক বিয়স্মান্বিত হইয়া অতিথিসেবককে জিজ্ঞাসা করিনেল। তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর পাইলেন "আমার নারিকেল বৃক্ষ"। আপনার আগমন মাত্রেই যে সুস্বাদু পানীয় দিয়াছিলাম তাহা এই অপক্ক ফল হইতে সংগৃহীত, যে বাদামের আস্বাদনে আপনি এত প্রীত হইয়াছেন তাহা পক্কফল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে দুগ্ধের এত প্রশংসা করিলেন তাহা এই বৃক্ষের ফল হইতেই আসিয়াছে। যে মধুর কপিরৎব্যঞ্জনে আপনি এত সন্তুষ্ট হইয়াছেন তাহা এই বৃক্ষের অগ্রভাগ; কিন্তু আমরা এ সুখাদ্য ক্বচিৎ ভক্ষণ করি, কারণ যে গাছ হইতে ইহা সংগৃহীত হয় তাহা শীঘ্র মরিয়া যায়। যে মদ্যে আপনার আনন্দোদয় হইয়াছে তাহাও এই বৃক্ষ হইতে পাইয়াছি। এ কারণ ঐ বৃক্ষের ফুলের মোচাকে চিরিয়া দিতে হয়, ইহা হইতে যে পরিষ্কৃত শাদা জল বহির্গত হয় তাহা উপযুক্ত পাত্রে ধরিয়া আনি! ইহাকে আমরা তাড়ী বলিয়া থাকি। সূর্য্যের উত্তাপে রাখিলে ইহা অম্লগুণবিশিষ্ট হয়, পরে ছিরকারূপে পরিণত হয়।

আর ইহাকেই চুয়াইয়া আমরা ঐ প্রকার উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত করি। ঐ রস হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া এই সকল মোরব্বা তৈয়ার করিয়াছি। এই সকল পাত্রাদি ও বাসান এই নারিকেলের মালা হইতে তৈয়ার করিয়াছি! ইহাদের কাষ্টে আমার কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে; ইহাদের শুষ্ক পত্র শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক সাজাইয়া ঘরের চাল করিয়াছি। ইহাদের পাতাই ছত্ররূপ হওয়াতে আমাকে প্রখর সূর্য্য কিরণ হইতে রক্ষা করে। যে বস্ত্রে আমি লজ্জানিবারণ করিতেছি তাহা ইহাদের পত্রের [illegible] বুনিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এই সকল [illegible] কার্য্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও এই বৃক্ষো

ৎপন্ন। এই ছাকনি যে স্থান হইতে পত্র বহির্গত হয় তথায় আমার জন্য প্রস্তুত ছিল। ইহাদের পত্র বুনিয়া আমরা জাহাজের ও নৌকার পাইল তৈয়ার করিতে পারি। যে ছোবড়া নারিকেলকে আবৃত করিয়া আছে তদ্বারায় জাহাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রজ্জু প্রস্তুত হয়! এই রজ্জু জলে পচিয়া নষ্ট হয় না, বরং জলে ভিজিয়া ফুলিয়া উঠে। যে উৎকৃষ্ট তৈলে আমাদের অনেক খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছি ও যাহা আমার প্রদীপে জ্বলে তাহাও এই নারিকেল ফলের শাঁস হইতে নিষ্কাশিত।"

পথিক ঐ দরিদ্র কুটীরবাসীর কথা শুনিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঐ ব্যক্তির কেবল মাত্র কতকগুলি নারিকেল বৃক্ষ থাকাতেই তাহার প্রায় সমগ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহৃত হইয়াছে। যখন পথিক বিদায় গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন অতিথি সেবক তাঁহাকে বিনয়সহকারে বলিলেন, "মহাশয়! ঐ দূরবর্ত্তী নগরে আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁহাকে এক পত্র লিখিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কি আমার পত্র লইয়া যাইবেন?" পথিক সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নারিকেল গাছ কি এ বিষয়েও তোমার সহয়তা করিবে?" কুটীরবাসী বলিল "নিশ্চয়ই; নারিকেলের পাত চিরিয়া যে গুঁড়া পাই তদ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়াছি এবং সেই পাতা হইতে লেখনোপযোগী কাগজ তৈয়ার করিয়াছি; পুরাকালে এই কাগজেই যতকিছু লেখিতব্য বিষয় লিখিত হইত।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে উপরিউক্তবিবরণ বাস্তবিক কোন ঘটনা মূলক বা কল্পনা ঘটিত হউক, এতদ্বারা নারিকেল বৃক্ষের নানা উপকারিতা যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে তাহার কোন সন্দেহনাই। এক নারিকেল বৃক্ষইখাদ্য, মদিরা, বস্ত্র, আবাস গৃহ, বাসন ও পাত্র ইত্যাদির আকর হইয়াছে। ইহার তৈলে বাতি ও সাবান প্রস্তুত নিমিত্ত কত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়!

আম্রে কীট।

সচরাচর দুই প্রকার কীটে আম্রের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। এক প্রকার কীট বৃক্ষে লাগিয়া গাছের তেজে বৃদ্ধি এবং ফলোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মায়, অন্য প্রকার কীট ফলে লাগিয়া উহা খাদ্যের অনুপযুক্ত করিয়া তুলে। এই উভয় প্রকার কীটই আম্রের পক্ষে পরম শত্রু। আজ কাল অনেক স্থান হইতেই আম্রের পোকার কথা শুনা যাইতেছে। আম্রে কেনই যে এই কীটের সঞ্চার হয়। এবং কি উপায়ে উহা নিবারিত হইতে পারে তাহা অদ্যাবধি আবধারিত হয় নাই। এই কীট সম্বন্ধে অনেকে অনেক রূপ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন ঔষধ প্রকাশিত হয় নাই যে তদ্বারা এই কীট বিনষ্ট হইতে পারে।

গাছে কীট লাগিলে উহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। শাখাদি সতেজ ভাবে বাড়িতে পারে না। পত্রাদি কুঁকড়াইয়া যাইতে থাকে। যে সকল শাখার পোকা ধরে তাহার অবস্থা এত দুর্ব্বল হয় যে সামান্য ঝটিকায় উহা ভাঙ্গিয়া যায়। শাখাদি ভাঙ্গিয়া গেলে বৃক্ষে অধিকপরিমাণে ফল ধরিতে পারে না। উক্ত কীটে কেবল যে বৃক্ষের শাখাদির অনিষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে তাহা নহে। বৃক্ষের জীবনী শক্তিও অনেক পরিমাণে কমাইয়া ফেলে। আর যদি গাছের গুঁড়িতে কীট লাগে তাহা হইলে উহা এরূপ অকর্ম্মণ্য হইয় যায় যে তদ্বারা কোন প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করা কঠিন হইয়া উঠে। তক্তা কিম্বা অন্য কোন প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। কীট লাগিয়া বৃক্ষের গায়ে গর্ত্ত করিয়া ফেলে। ফলত যে কোন উপায়ে উহা নিবারণ করা উচিত। এই কীট বিনষ্ট করিতে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত সুত্রলপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারাণ নায়ক আমাদিগকে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন, পাঠক বর্গের গোচরার্থে নিম্নে ঐ পত্র খানি অবিকল প্রকাশিত হইল।

(ক্রমশঃ)

লবঙ্গ বৃক্ষ।

(Clove-tree)

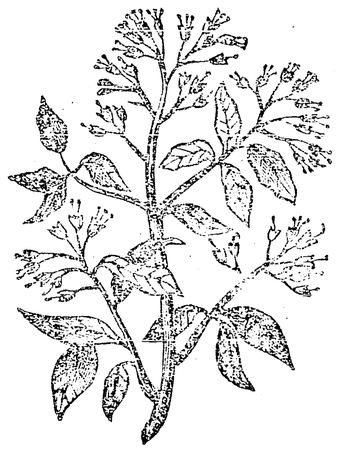

লবঙ্গআমরা সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু উহা যে কি উপায়ে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। অনেকে আদৌ লবঙ্গ গাছ দেখেন নাই। বাজার হইতে লবঙ্গ খরিদ করিয়া আনিয়া থাকেন। লবঙ্গ আমাদের অনেক ব্যবহারে লাগিয়াথাকে। লবঙ্গ পানের ও রন্ধন মসলা এবং ঔষধে ব্যবহার হয়। লবঙ্গের দুই জাতীয় গাছ দেখা যায়, এক প্রকার লবঙ্গ-বৃক্ষ দ্বিতীয় প্রকার লবঙ্গ-লতা। বৃক্ষ জাতীয় গাছে লবঙ্গ ফলিয়া থাকে। লতায় লবঙ্গ ধরে না। ফুলের জন্য উহা বাগানে রোপণ করিয়া থাকে। অনেকের মনে বিশ্বাস লবঙ্গ লতা জাতীয় গাছ হইতেই উৎপন্ন হয়। জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ যে ললিত-লবঙ্গ-লতা লইয়া তাঁহাদিগের কবিতার অঙ্গ গঠন করিয়াছেন, তাহা লতা জাতীয় গাছ দেখিয়া। লবঙ্গ-লতার উত্তম ফুল হইয়া থাকে। ইহার ফুল মাঝারি আকারের এবং দেখিতে শাদা বর্ণের ফুলের সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধের জন্য ইহার বিশেষ আদর। অল্প দিনের মধ্যে লতার অত্যন্ত ঝাড় হইয়া থাকে। লতা জাফরিতে তুলিয়া দিলে ভাল হয়।

এই লতার উত্তম সৌন্দর্য্য আছে, বর্ষা কালে লতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অন্যান্য সময় অপেক্ষা বর্ষা কালে প্রচুর ফুল ফুটিতে দেখা যায়, যে সময় লতা ফুলে পরিপূর্ণ হয়, তখন লতার সৌন্দর্য্য এবং পুষ্পের গন্ধে সে স্থান আমোদিত করিয়া তুলে। লবঙ্গ লতার চারা বৎসরের সকল সময়ই রোপণ করিতে পারা যায়, কিন্তু বর্ষাকালে রোপণ করিলে গাছ প্রায় মরে না এবং শীঘ্র তেজস্কর হইয়া উঠে। অন্যান্য সময়ে চারা পুঁতিলে একটু যত্ন করিতে হয়। বর্ষাকালে অনেক গাছের গোড়ায় বীজ পড়িয়া আপনিই চারা বাহির হইয়া থাকে। লবঙ্গ লতার ফলের আকার আকন্দ ফলের সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। সেই ফলের মধ্যে বীজ থাকে, ইহার বীজের আকার ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত পাতলা, এমন কি তাহা দেখিলে বীজ বলিয়াই বোধ হয় না। পাতলা ছালের ন্যায় বোধ হয়। গাঁদা জিনিয়া প্রভৃতির বীজ যেমন এক স্থানে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত হইলে উহা তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিতে হয়, ইহারও বীজ সেইরূপ নিয়মে পাতো দিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়; বীজ ভাল হইলে চারি পাঁচ দিনের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হইতে পারে। চারা অন্ততঃ আধ হাত বড় হইলে তাহা তুলিয়া অন্য স্থানে রোপণ করা উচিত। এই লতার বিশেষ কোনরূপ পাইট করিতে হয় না; তবে বৎসরান্তে লতার গোড়ায় সার দিলে উপকার হইয়া থাকে। সার দিতে হইলে কার্ত্তিক মাসে উহা দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছের গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিলে উহার অবস্থা ভাল থাকে এই লতা হইতে লবঙ্গ ফলে না। লবঙ্গলতা ও লবঙ্গ বৃক্ষ সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় গাছ। যাহা হইতে লবঙ্গ ফলিয়া থাকে নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইল।

লবঙ্গের বড় বড় গাছ হইয়া থাকে। গাছে লবঙ্গ ফলিলে উহার যেরূপ আকার হয় পাঠকবর্গের দর্শনার্থে সপুষ্প একটী লবঙ্গশাখা এই প্রস্তাবের শিরো-ভাগে চিত্রিত হইল। গাছে লবঙ্গ ধরিলে এক প্রকার সৌন্দর্য্য হইয়া থাকে। উপরি চিত্রিত শাখার অবস্থা দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এক একটী গাছে কি প্রকার লবঙ্গ ফলিয়া থাকে। যে পরিমাণে লবঙ্গের আদর, তাহাতে নিশ্চয় বলিতে পারা যায় এ দেশে উহার গাছ করিলে একটী নূতন আয়ের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। এ দেশের মৃত্তিকা ও জল

বায়ু এবং উত্তাপে লবঙ্গ গাছ জন্মিতে পারে। এ দেশে কেহ ব্যবসায়ের জন্য লবঙ্গের গাছ রোপণ করেন নাই, তবে ধনী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সখ করিয়া স্ব স্ব উদ্যানে উহার দুই একটী বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন।

লবঙ্গের এক একটী গাছ সচরাচর পেয়ারা গাছের ন্যায় বড় হইয়া থাকে। অন্যান্য গাছের ন্যায় লবঙ্গ গাছ সহজে হয় না। উহার বিশেষ রূপ পাইট ও যত্ন করিতে হয়। এদেশে লবঙ্গের যে সকল চারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন প্রকার কলম দ্বারা উৎপন্ন হয় না। বীজ হইতে চারা তৈয়ার হইয়া থাকে। যে সকল বীজে চারা হইয়া থাকে, সেই সকল বীজ আবার অন্যত্র হইতে আনীত হইয়া থাকে; এ দেশের বৃক্ষজাত লবঙ্গ বীজেও চারা হইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহা তত উৎকৃষ্ট নহে। বীজ কিছু বালির অংশ বিশিষ্ট মাটিতে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। বীজের আকার কতকটা শর্ষপের ন্যায় কিন্তু গোল ধরণের নহে, চৌকা আকারের। বীজ রোপণের পক্ষে টবই উৎকৃষ্ট। যে টবে লবঙ্গের বীজ রোপণ করিবে তাহা বেলে মাটিতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে রোপণ করিলে ভাল হয়। টবের আকার অনুসারে বীজ রোপণ করা আবশ্যক। ছোট টবে অধিক পরিমাণে বীজ পুঁতিলে চারা ঘন হইয়া উহার বৃদ্ধি সম্বন্ধে গোলযোগ হইতে পারে, এজন্য টবে পাতলা করিয়া বীজ রোপণ করা আবশ্যক। বীজরোপণ সম্বন্ধে মাঘ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। বীজ ভাল হইলে দশ বার দিনের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হইতে পারে। টবের মাটি রসাল রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উহাতে অল্প পরিমাণে জল দেওয়া আবশ্যক। টবে চারা অন্ততঃ আধ হাত বড় হইলে, চারা তুলিয়া বাগানে রোপণ করিলে চলিতে পারে। বাগানের মধ্যে যে স্থানে উত্তমরূপ রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পায় এরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সেই স্থানে গাছ পুঁতিলে কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভব নাই। বর্ষাকালে গাছের গোড়া বাঁধিয়া একটু উঁচু করিয়া দিলে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইয়া গাছ পচাইতে পারে না। কার্ত্তিক মাস উপস্থিত হইলে গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিতে হয়। পুরাতন সার দিয়া ঐ খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মূলদেশ পুনর্ব্বার পূর্ণ করিয়া দেওয়া

আবশ্যক। গাছের গোড়ায় তৃণাদি জঙ্গল হইলে গাছের বৃদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তর অনিষ্ট হইতে পারে, এ জন্য মূলদেশ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। ছাগ ও গবাদি পশু যাহাতে চারার পত্রাদি খাইতে না পারে তদপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কোন গাছাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, সর্ব্বদা তাহা দেখা উচিত, এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে কি প্রকার অভাব আছে তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মোচনে চেষ্টা করিতে হয়। সন্তানাদি প্রতিপালনে যেমন সর্ব্বদা যত্ন করিতে হয় এবং কোনরূপ যত্নের শৈথিল্য হইলে যেমন শিশুর নানারূপ রোগাদি হইয়া স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত করিয়া তুলে, বৃক্ষাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম। বিশেষতঃ যে সকল বৃক্ষাদি এদেশের জল বায়ুতে, উৎপন্ন হইতে নানারূপ বিঘ্ন হইয়া থাকে, সেই সকল বৃক্ষাদি বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতে হয়। লবঙ্গ বঙ্গদেশীয় বৃক্ষ নহে। মালকস, সিলোন, বোর্ব্বণ এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যে সকল লবঙ্গ ব্যবহার করি, তদসমুদায় ঐ সকল দ্বীপ হইতে আনীত হইয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাস ও গ্রীষ্ম কালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে লবঙ্গ গাছে ফুল হইয়া থাকে। পুষ্প সকল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত না হইতে অর্থাৎ যে সময় বোঁটার উপরে চারিটী মাত্র সূচী দেখা দেয় এবং দল সমূহ উপরি ভাগে অবস্থিত হইয়া বিকাশোন্মুখ হয়; সেই সময়, ফুল সমূহ ভাঙ্গিতে হয়। গাছ হইতে এইরূপ অবস্থায় ফুল পাড়িয়া তাহা দুই এক দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। এই শুষ্ক লবঙ্গ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি।

চিকিৎসকেরা লবঙ্গ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। লবঙ্গের বিরেচন শক্তি আছে, এজন্য অধিক লবঙ্গ খাইলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। লবঙ্গে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, চক্ষু রোগে লবঙ্গ ব্যবহার হয়। ফলতঃ লবঙ্গ আমাদের নানা কাজে লাগিয়া থাকে।

কেহ যদি গাছ দেখিয়া লবঙ্গ বৃক্ষ চিনিতে না পারেন, তবে উহার পাতা ডলিয়া আঘ্রাণ করিলে লবঙ্গের গন্ধ পাইয়া গাছ ঠিক করিতে পারেন।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি।

"কামং ববর্ষ পর্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘা মহী।
সিষিচুঃ স্ম ব্রজান গাবঃ পয় সোধস্বতীর্ম্মুদা॥
নদ্যঃ সমুদ্রা গিরয়ঃ সবনস্পতি বীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামমন্বৃতু তএ বৈ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা। ১ম স্কন্ধ
১০ম অধ্যায়।

ইংরাজী ১৮৮০-৮১ অব্দে সার এসলি ইডেন যে শাসন বিজ্ঞাপক গ্রন্থ (Bengal Administration Report) প্রণয়ন করিয়া ছিলেন, সম্প্রতি তাহা মুদ্রিত এবং সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের ১৩৪ পৃষ্ঠায় মহামান্য ছোট লাটসাহেব লিখিয়াছেন "যশোহরের অন্তর্গত নড়াইল উপবিভাগের চণ্ডালগণ কৃষিকার্য্য দ্বারা আপনাদের অবস্থার এতাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছে যে এক্ষণে তাহারা প্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিচিত স্থান অধিকার করিবার জন্য উৎসুক হইতেছে। তাহারা আপনাদিগকে নমশুদ্র বলিয়া পরিচয় দেয় এবং বৈষ্ণব বংশ সম্ভূত বলিয়া গৌরব করে। * প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইউজিনি স্কুটকি সাহেব স্বপ্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তকের ‡ স্থান বিশেষে মিরট জিলার অন্তর্গত রামখন্দ জাতিদিগের মধ্যে একটী চমৎকার ব্যাপারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন!—

* "The chandals of Narail in jessore have been led by their improved circumstances to claim promotion in the social scale. They how call themselves "nama sudras" and declare themselves to be "vaisnales" (vide Bengal Administration Report for 1880 81. Page 134) মূলের ঠিক অনুবাদ করি নাই। কেবল ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়াছি।

‡ "Some practical ways improving Agri Horticultural sciences" P. 95.

"রামখন্দ সম্প্রদায়িকদিগের সংখ্যা সার্দ্ধ ত্রিসহস্রের অধিক হইবে না। ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা ৫ ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে হুপাখন্দদিগের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অপরাপর চারিদল কখন কখন কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু হুপাখন্দেরা তাহা করে না। প্রায় পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না; ইহারা নীচ জাতি, পাহাড়ে বাস করে, ইহাদের জল অস্পর্শনীয় কেবল এইমাত্র সাধারণ্যেপ্রচার ছিল। কিন্তু কৃষিবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব বলে এই অধমাধম হুপাখন্দ সম্প্রদায় প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এক্ষণে মৈথিলী ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেছে, এবং বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সহিত কন্যা এবং সহোদরার বিবাহ দিতেছে।" স্কুটকি সাহেব বিশ্বাস করেন, এই জাতি অতি স্বল্পকাল মধ্যে হিন্দুদেবমন্দিরের পৌরহিত্যিক পদ অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। বেঙ্গল আড্‌মিনিষ্ট্রেসনি রির্পোটের ১৪৩ পৃষ্ঠায় সার এস্‌লি ইডেন লিখিয়াছেন "কৃষিকার্য্যের আলোচনায় অসভ্য সাঁওতাল জাতিও সভ্য হইতে চলিল। তাহারা এক্ষণে জুতা, ছাতা, ধুতী, টুপি প্রভৃতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং দেশপ্রচলিত বহুকালের কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া এখন অসভ্য পর্ণকুটীরেরপরিবর্ত্তে উত্তম২ কাষ্টনির্ম্মিত গৃহে বাসকরিতে আরম্ভকরিয়াছে। গৃহের চারিদিকে সুসভ্যজনোচিত ফল ফুলের তরু ও লতা রোপণ করিতেছে এবং স্ত্রী পুত্র লইয়া আজি কালি পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছে।" ইত্যাদি। কৃষিতত্ত্বের সুযোগ্য এবং সুশিক্ষিত পাঠক! এখন দেখুন, সাঁওতাল, চণ্ডাল, রামখন্দ, হুপাখন্দ প্রভৃতি অসভ্য গণ্ডমূর্খ জাতি যাহাদের কখন শ্রীবৃদ্ধি হইবে বলিয়া আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই—এখন তাহারা তোমাকে আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। এখন বোধ হয় তুমি তোমার গৃহ হইতে একেবারে দ্বিসহস্র মুদ্রা বাহির করিতে পার না, কিন্তু নড়াইলের একজন চণ্ডাল কৃষক অনায়াসে তাহার কাপড়ের বুচকির মধ্য হইতে দুই সহস্র টাকা বাহির করিয়া দিবে। তোমার লৌহ বিনির্ম্মিত সিন্ধুক শূন্য গর্ভ হইয়া চিরকাল পড়িয়া থাকিবে। তাহা হইলে তোমার আমার অপেক্ষা ঐ সকল অসভ্য জাতি মন্দ কিসে?

আমাদের লেখা পড়া শিখিয়া এই ফল হইল যে আমরা দুই সন্ধ্যা উদর পুরিয়া খাইতে পাই না। এই যে রমণীয় দ্বিতল অট্টালিকার মধ্যে ম্যাহগণি কাষ্টের চেয়ারে বসিয়া গবর্ণমেণ্টের অন্ন ধ্বংশ করিতেছি আর টেবিলের উপরে রায় ব্রাদার্সের কালী এবং ফিনিক্‌সের কলম ও শ্রীরামপুরের কাগজ নষ্ট করিতেছি,—কখন কখন দর্শন, অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়া চিন্তা করিতেছি, কখন কখন সমগ্র ভারতোদ্ধারের কল্পনায় পাগল মনকে সন্তুষ্ট করিতেছি—দিবা নিশি রাশি রাশি গ্রন্থকারকে একগ্রাসে উদরসাৎ করিতেছি—কখন মৌলবীকে, কখন পাদ্রীসাহেবকে, কখন ঋষি কুমারকে, কখন বা বাঙ্গালী যুবাকে জীবন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিতেছি কিন্তু অন্তরে আমার কি? আমি খাইতেপাই না!! তোমাদের লেখা পড়া শিখিয়া, তোমাদের চাল চলন অবলম্বন করিয়া তোমদের 'সহিত আলাপ করিয়া যদি উদর পুরিয়া খাইতেই না পাইলাম তবে তোমার এ রকম শিক্ষা, আচার, এবং আলাপে আমি ঘোল ঢালিয়া দিই!! সাঁওতাল হইয়া দুই সন্ধ্যা সুখে খাইতে পাওয়া ভাল, তথাচ পণ্ডিত হইয়া অনাহারে থাকা ভাল নহে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, উচ্চ জাতিকে ফেলিয়া নীচ জাতি, শিক্ষিত পুরুষকে ফেলিয়া অসভ্য মূর্খ ছোটলোকেরা পর্য্যন্ত ধনী এবং বড় হইতে চলিল, কালে আমাদিগকে তাহাদের গোলামী করিয়া খাইতে হইবে। তাহাতেই বলিতেছি, ওহে শিক্ষিত পুরুষগণ! তোমরা আর ভাবিতেছ কি? তোমাদের ডিপ্লোমা, সার্টীফিকেট, ডিগ্রী প্রভৃতি ভারতবাজারে দশবৎসর পরে আর এক আনা পয়সা মূল্যেও বিক্রয় হইবে না। আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে এ সকলে আমার কি হইবে? পরলোকে কি ইহারা সাক্ষী দিবে না ইহাদিগকে ধুইয়া খাইতে হইবে? তুমি তোমার গৃহের কড়িতে ঐ গুলি ঝোলাইয়া রাখিয়া হাল ধর এবং গরু পালন কর।

কৃষিকার্য্যে ধনের বৃদ্ধি হয়। যে দেশে বা যে জাতিতে ধন নাই, সে দেশ কিম্বা সে জাতির কখনই উন্নতি হইতে পারে না এবং উন্নতি হয় নাই। যে ব্যক্তির ধননাই সেই ব্যক্তি জগতের প্রধানপ্রধান কার্য্যকরিতেঅক্ষম। ধন না থাকিলে দরিদ্রতা উপস্থিতহয়, দরিদ্রতারসঙ্গে অনাহার, রোগ, দস্যুতা, পাপ ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলা, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি আসিয়া থাকে। যে খাইতে পায় না

তাহার শরীর ভাল থাকে না। শরীর ভাল না থাকিলে মন অসুস্থ হয়। মন অসুস্থ হইলে মানসিক শক্তির লঘুতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির লোপ পায়। তখন তাহার উদ্যম, উৎসাহ, দেশহিতৈষিণা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা যমুনার শ্যাম সলিলের তরঙ্গের সহিত মিশিয়া যায়। উদরে অন্ন না থাকিলে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়। তাহাতেই বলিতেছি, যদি দীর্ঘায়ু হইয়া সংসারে সুখসচ্ছন্দতাসহকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার যেমন সাধ্য সেই মত কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া দেখ। যেহেতু কৃষিই মেধা এবং কৃষিই জন্তুর জীবন।

কৃষিকার্য্যের অনেক উপায় আছে। শিক্ষিত পুরুষেরা তাহা বোধ হয় জ্ঞাত আছেন। আমিও কৃষি তত্ত্বে অনেক প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়া দিয়াছি। অদ্য ইহার উন্নতি সম্বন্ধে আর একটী সহজ উপায় দেখাইয়া দিতেছি। আমি লিখিয়া মরিতেছি কিন্তু তোমরা কার্য্যতঃ কিছু করিবে কি? আমার মন্তব্য এই যে, এদেশ হইতে যদি এক সম্প্রদায় লোক কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া নউইয়র্ক, সুমাত্রা কিম্বা জাবা প্রভৃতি স্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং তথায় কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার সত্বরেই অনর্গল হইয়া উঠে। পোর্টবেল্য়ারে এইরূপে অনেক বাঙ্গালী প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশ গমন করিতে অভিলাষী নহেন, তাঁহাদিগের জন্য আমি সুন্দরবন, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ঘোগা, সাঁওতাল পরগণা, ডুমকা, ছোটনাগপুর, প্রভৃতি স্থান নির্দ্দেশ করিতেছি। পূর্ণিয়ার রাজা নীলানন্দ সিংহ বাহাদুর সামান্য মাত্র নজরান লইয়া সহস্র সহস্র বিঘা জমি আবাদের জন্য দিতেছেন। অনেক বন কাটিয়া আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন! সাঁওতাল পরগণার জমির মূল্য এবং খাজনা অত্যন্ত অল্প। অতএব এই সকল স্থানে আবাদ আরম্ভ করিলে অল্প মূল্যে অধিক ফসল উৎপন্ন হয় এবং কালে প্রভূত ধনের অধিকারী হওয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আর একটী প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

ফুল ও ফল এবং শস্যাদির উন্নতি করিবার উপায়।

ভারত কৃষি প্রধান দেশ, কিন্তু এখানে কৃষি কার্য্যের কোন প্রকার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষি কার্য্য করিতে হইলে যে, শিক্ষার আবশ্যক করে তাহা এদেশীয় লোকের মনে আদৌ বিশ্বাস নাই। মৃত্তিকা দয়া করিয়া যাহা আমাদিগকে দিয়া থাকে আমরা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই। কৃষি সম্বন্ধে কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে কেহই যত্নশীল নহেন। সকলেই প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যে এই রূপ ঔদাস্য ভাব থাকিবে, ততদিন উহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি, উদ্ভিদের প্রকৃতি নির্ণয় এবং তাহাদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি অভাব আছে তাহা নিবারণ চেষ্টা না করিলে আশানুরূপ ফল লাভের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ফুল ফল ও শস্যাদির উন্নতি করিতে হইলে তদ্ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিশেষ যত্ন না করিলে যে বিশেষরূপ ফল লাভ ঘটে না তাহা বলা বাহুল্য।

যে উপায় অবলম্বন দ্বারা ইংলণ্ডে গুজবেরী ফলের উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠকবর্গের গোচরার্থে এ স্থলে লিখিত হইল। এই প্রণালীটী কৃষক মাত্রেরই জানা আবশ্যক।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গুজবেরী ফল এক প্রকার অখাদ্য ছিল, তখন উহার আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অতিশয় বিস্বাদু ছিল এক্ষণে উহার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তত্রত্য কৃষিবিদ্যা—বিশারদ পণ্ডিতগণ প্রথমে অরণ্যজাত ফলের মধ্যে যে সকল ফল অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং পরিপুষ্ট সেই সকল গাছপাকা ফলের বীজ উত্তমরূপ সার বিশিষ্ট জমিতে রোপণ করেন এবং সেই বীজ হইতে যে সকল চারা অঙ্কুরিত হয় তন্মধ্যে যে সকল চারা সতেজ ও হৃষ্টপুষ্ট সেই সকল চারা রাখিয়া অবশিষ্ট চারা গুলি মারিয়া ফেলা হয়। এই সকল গাছের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বদা তাহার মূলে জল সেচন এবং ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। এইরূপ যত্নের সহিত গাছ রক্ষিত হইলে সেই সকল গাছে

পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল হইবে। এই রূপ নিয়মে কিছুকাল বৃক্ষাদি রোপণ ও প্রতিপালন করিলে ফলের আকার ও আস্বাদন ক্রমেই উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বোল্লিত প্রণালী অনুসারে আবাদ করিয়া বিলাতে গুজবেরী ফলের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন ফলের আকার এবং আস্বাদন এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, যে সকল ফল হইতে প্রথমে এই সকল ফলের উৎপাদন করা হইয়াছিল, এক্ষণে উহা এক জাতীয় বলিয়াই বোধ হয় না।

মনুষ্যাদির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যেমন যত্ন করিলে ক্রমেই তাহার উন্নতি হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যত্নের সহিত রোপণ ও পাইট করিলে তাহাদিগের প্রভূত উপকার হইতে পারে। আমাদের দেশে বীজ রক্ষা সম্বন্ধে কোন বিশেষ দৃষ্টি নাই, ফুল ও ফল কিম্বা শস্যাদির বীজ বিশেষরূপ যত্নের সহিত বাছিয়া রাখা হয় না। যে কোন ফল ও ফুলের বীজ রাখিবার সময় তেজস্কর গাছের পরিপুষ্ট বড় ফলের বীজ রাখা আবশ্যক। যে ফলে পোকা ধরে কিম্বা আকারে ছোট এরূপ ফলের বীজ রোপণ করা কখনই উচিত নহে। যেমন দুর্ব্বল রোগগ্রস্থ হীনবীর্য্য ব্যক্তির সন্তান হইলে সে যেমন তেজস্কর এবং বলবান হয় না, সেইরূপ অপুষ্ট বীজের চারা সম্যক তেজস্কর এবং ফল সম্পূর্ণ আকার বিশিষ্ট হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে, ইহা স্থির জানা আবশ্যক। বীজের মধ্যে যখন উদ্ভিদের জীবন ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তখন সর্ব্বাগ্রে উহাতেই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

* সুযোগ্য নির্ব্বাচন—প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইউরোপে পালিত জন্তুদের অনেক উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। † তাহা অনেকেই জানেন। এই রূপ উপায়ে ইংলণ্ডের গোপালেরা গোজাতির শারীরিক আকৃতি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, কাল গরুর বংশধরদিগকে শাদা করিয়া তুলিয়াছে, এই উপায়েই "ডার্হামে"র গরু অসাধারণ মাংসল হইয়াছে এবং "ইয়র্কে"র গাভী দুগ্ধবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদের বিষয়ে এতদূর মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। শস্যাদি উৎপাদন সম্বন্ধেও যদি নির্ব্বাচন প্রণালী

* বর্ত্তমান সনের ১৫ই শ্রাবণের ভারতী দেখ।

†Feed plant improvemento. Paper read by Major Hallet at the Brighton Health Congress. Nature May 25, 1882.

অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে যে প্রচুর ফল লাভ করা যাইতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এক জাতীয় সকল উদ্ভিদে কিছু সমান ফল হয় না, কোনটায় ভাল হয়, কোনটায় মন্দ হয়। সেই ভাল উদ্ভিদ্ হইতে ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে সেই উদ্ভিদ্ জাতির যে যথেষ্ট উন্নতি হইবে ইহাই সম্ভবপর। আমাদের দেশে অনেক অনেক ভাল ভাল বিশেষ প্রকারের আম্র ফল আজ পর্য্যন্ত যে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, সে কতকটা এই উপায়ে। শস্যাদি সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটাইলে তাহাতে অনেক উপকার দেয়। এক যোড়া গরু হইতে এক কালে একটির অধিক বাছুর পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু একটী ধান রোপিলে যে গাছ হয়, সে গাছে যতগুলি শীষ জন্মায় তাহাতে প্রায় সাত আট হাজার ধান জন্মাইতে পারে। এই সাত আট হাজার ধান হইতে সাত আট হাজার গাছ জন্মাইলে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গাছ গুলি রাখিলে তাহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

কেবল মাত্র সম্ভাবনার কথা বলিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে চাই না, কার্য্যতঃ কতদূর হইয়াছে, তাহাও আমরা দেখাইব। হ্যালেট নামক একজন ইংরাজ পূর্ব্বোক্তরূপ বীজ বাছাই করিবারজন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার পদ্ধতির নাম Hallet's Pedigree System. ইঁহার নির্ব্বাচিত বীজের শস্য উৎপাদন ক্ষমতার শত শত আশ্চর্য্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তির ১২ একর জমী আঙুরের চাষ ছিল তিনি হ্যালেটের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বীজ বপন করাতে এত অধিক ফসল পান যে, পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুন অধিক মদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে ছত্রিশ একরে যে ফল হইত, এখন বারো একরে সেই ফল হইল। সকলেই জানেন ইউরোপে এবং আমেরিকার স্থানে স্থানে বিটপালঙের মূল হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কানাডা হইতে এক ব্যক্তি Gardener's Chronicle and Agricaltural Gazette" এ লিখিতেছেন যে বিট চাষ করিতে হইলে তাহার বীজের গুণাগুণের

প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম প্রথম বিট হইতে শত করা পাঁচ ভাগ মাত্র চিনি উৎপন্ন হইত, কিন্তু বীজ নির্ব্বাচন পদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিয়া এখন তাহা হইতে শত করা ১৫ ভাগ চিনি উৎপন্ন হইতেছে। বিলমোরিন নামক এক ব্যক্তি বিটের মূল পরীক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র তৈয়ারি করেন। প্রত্যেক বিটের মূলে কতটা পরিমাণে চিনি আছে, অতি সূক্ষ্ম ওজনের পদ্ধতি অনুসারে এই যন্ত্রের দ্বারা সহজে তাহার প্রমাণ হয়। যে সকল বিটের মূলে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি আছে, বীজ উৎপাদনের জন্য সেই গুলিই কেবল রোপিত হয়। তাহার বীজ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বিট মূল উৎপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমশই বিটের উন্নতি হইতে চলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়াতে হ্যালেটের নির্ব্বাচিত বীজ লইয়া গমের চাষ হয়। যেখানে পূর্ব্বে এক একরে দশ বুষেল (প্রত্যেক বুষেল প্রায় ৯॥০ সের) গম উৎপন্ন হইত, উক্ত বীজ বপন করিয়া সেই খানে ৯ হইতে ৩৫ বুষেল উৎপন্ন হইতে লাগিল। বড় বড় শীষে ১১৩টি করিয়া শস্য জন্মিতে লাগিল। এই রূপে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া ১৮ বৎসর পরে ৭২ বুষেল শস্য জন্মিল, অনেক গুলি গাছে প্রায় ৯০টি করিয়া শীষ বাহির হইল; এবং অনেক গুলি শীষে ১৩২টী করিয়া শস্য জন্মিল। ফ্রান্সে ব্রুসিয়ের নামক স্থানে একটী ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসারে বীজ বপন হইয়াছিল, পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন গড়ে ১৪ বুষেল শস্য উৎপন্ন হইল, এই ক্ষেত্রে তখন ৫৬ বুষেল শস্য জন্মাইল। কেবল ফসলের ন্যূনাধিক্য না দেখিয়া যদি অন্যান্য গুণ দেখা যায়, তাহা হইলেও হ্যালেটের পদ্ধতির শ্রেষ্টতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেল্‌জিয়মে পরীক্ষিত হইয়াছে যে, যখন বরফে অন্যান্য সকল শস্য নষ্ট হয় তখন হ্যালেট নির্ব্বাচিত বীজের চারা নষ্ট হয় নাই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বের গবর্ণর সর সীমোর ফিটজেরল্ড তুলার চাষের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে লিখিত আছে, ক্রমান্বয়ে কএক বৎসর ধরিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীচ নির্ব্বাচন করিয়া বপন করিলে তাহা হইতে যে কি পরিমাণে শস্যের উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহা আমি ইংলণ্ডে আমার নিজের জমি ও অন্যান্য ভদ্রলোকের জমী হইতে দেখিয়াছি।

হ্যালেটের বীজ নির্ব্বাচনের প্রণালী এইরূপ—প্রথম বৎসর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শীষ গুলি হাতে করিয়া বাছিয়া লইয়া তদুৎপন্ন বীজ বপন করিবে। পরে গাছ জন্মিলে পুনশ্চ তাহা হইতে সর্ব্বোত্তম শীষ গুলি বাছিয়া লইবে ও তদুৎপন্ন বীজ রোপণ করিবে, এমনি উপর্য্যুপরি কএক বৎসর করিলে পর হ্যালেটের "Pedigree" বীজ উৎপন্ন হয়। আমি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বাজারে কেনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজের অপেক্ষা প্রায় শত করা ৫০ ভাগ অধিক পরিমাণেও শতকরা ৫০ ভাগ অধিক ভাল শস্য উৎপন্ন হয়। "বোম্বের গবর্ণর উক্ত পদ্ধতি অনুসারে দক্ষিণে তুলার চাষ প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সেই সময়কার তুলার কমিসনর মেজর মুর রিপোর্টে লেখেন যে, হ্যালেটের পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বকার অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক ফসল হইতেছে। যে সকল বীজ বাকী ছিল চাষারা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা কিনিয়া লইয়া যাইতেছে। একটী গ্রাম হইতে সন্ধান পাওয়া গেল যে, এই বীজ হইতে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ অধিক ফসল জন্মিয়াছে। যদি মনে করা যায় এই পরিমাণেই স্থায়ী হইবে, ইহা হইতে অধিক ফসল আর জন্মিবে না, তাহা হইলেও দেখা যাইবে পূর্ব্বাপেক্ষা ২৬৩৬৫৯৭৯ টাকা মূল্যের অধিক শস্য উৎপন্ন হইল"।

আমাদের দেশে সহজে ও অল্প মূল ধনে জীবিকা উপার্জ্জনের পক্ষে কৃষি কার্য্যই প্রশস্ত। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি খাটাইয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের দেশে কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয় ও জীবিকা অর্জ্জনের এক বিস্তৃত ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি কয়েক বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ভালবীজের লক্ষণ গুলি আবিষ্কার করেন ও নির্ব্বাচিত বীজ রোপণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহারা প্রচুর ফল প্রাপ্ত হইবেন। কাজটি নিতান্ত দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। বড় বড় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করা এখনো বাঙ্গালীদের নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারি না, কিন্তু যত্ন ও শ্রম সহকারে বীজ—নির্ব্বাচন প্রণালী আবিষ্কার করা বোধ হয় তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত।

এদেশে কৃষি কার্য্যের যেরূপ অবনতি অবস্থা তাহাতে হ্যালেটের

বীজ—নির্ব্বাচন-প্রণালী দেশ মধ্যে প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। দেশীয় কৃষকগণ যেরূপ অশিক্ষিত এবং তাহাদিগের জ্ঞান যেরূপ সংকীর্ণ এই সকল নূতন তত্ত্ব তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। তাহারা চির-প্রচলিত প্রণালীর এক প্রকার ক্রীত দাস, অতএব তাহাদিগের দ্বারা কৃষি কার্য্যের কোন প্রকার উন্নতি আশা করা যাইতে পারে না। দেশীয় জমিদার-গণ যদি এই সকল তত্ত্ব দেশ মধ্যে প্রচার করিতে যত্নশীল হয়েন, তাহা হইলে প্রভূত উপকার হইতে পারে। উৎকৃষ্ট বীজ ও উপযুক্ত সার দিয়া যেখানেই চাষ করা হইয়াছে, সেই খানেই লাভ দেখা গিয়াছে। কোন্ কোন্ সার দিয়া কোন্ কোন্ শস্য বপন করিলে উপকার হইতে পারে, তদ্‌সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস মিত্র আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিবরণটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

কাণপুরে গবর্ণমেণ্টের একটী পরীক্ষার্থ বাগান ও ক্ষেত্র আছে। ঐ বাগান ও ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর নানাবিধ শস্যাদির উৎকর্ষ সাধন জন্য বহু প্রকার পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক কোন বিষয়ের উন্নতি করিতে হইলে বিস্তর চেষ্টা ও পরীক্ষা করিতে হয়। দেশীয় কৃষকদিগের মধ্যে এরূপ পরীক্ষা প্রণালী দেখা যায় না। পরীক্ষা করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সময়ে সময়ে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়; কারণ সকল পরীক্ষায় যে সফল যত্ন হওয়া যায়, তাহা সম্ভব নহে। এতদ্দেশে কৃষকদিগের এরূপ অবস্থা নহে যে, তাহারা এই রূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরীক্ষা দ্বারা কৃষির উন্নতি করিতে পারে। বঙ্গদেশে কোম্পানির বাগানে যদিও নানা দেশীয় বৃক্ষ লতাদির পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিবরণ সাধারণ কৃষকদিগের জানিবার কোন ব্যবস্থা নাই। এদেশে কৃষি কার্য্য কৃষকদিগের হস্তেই এক প্রকার ন্যস্ত আছে, কিন্তু তাহারা যেরূপ মূর্খ তাহাদিগের দ্বারা যে ইহার উন্নতি হইবে এরূপ আশা নাই। কোন স্থানের মৃত্তিকা কি রূপ, কোন্ প্রকার সার কোন্ কোন্ উদ্ভিদের উপযোগী, কোন্ দেশীয় লোকেরা কোন্ প্রকার কৃষি কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে, তদ্‌সম্বন্ধে দেশীয় লোকেরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা কোন দেশের কৃষি কার্য্যের তত্ত্ব রাখে না। চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। প্রকৃতি অনুকূল হইয়া

যে বৎসর শস্য প্রদান করে সেই বৎসর তাহাদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার হইয়া থাকে, নতুবা বুদ্ধি পরিচালনা দ্বারা শস্যোৎপত্তি বৃদ্ধি করিতে তাহারা সম্পূর্ণ অপারক।

কাণপুরস্থ পরীক্ষা ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে নানাবিধ শস্যাদির পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এবং তথায় নানা প্রকার কৃষি ব্যবহার্য্য অস্ত্রশস্ত্রও প্রস্তুত হইয়া প্রধান প্রধান কৃষিক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি তথায় বিভিন্ন প্রকার সার ব্যবহার দ্বারা যব, গম ও ইক্ষু এই কয়েকটির পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফল যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তদ্বিবরণ সাধারণের গোচরার্থে এই প্রস্তাব লিখিত হইল। যে পরীক্ষার বিষয় লিখিত হইতেছে তাহা কেবল কাণপুরেই হইয়াছিল। সকল স্থানের মৃত্তিকার একরূপ প্রকৃতি নহে, সুতরাং মৃত্তিকা ও শস্যের প্রকৃতি বুঝিয়া সারের ব্যবস্থা করা আব-শ্যক। কাণপুরের পরীক্ষায় প্রথমতঃ যব ও গম উৎপাদনার্থ নীলের সার ব্যবহার করা হয়। বৈশাখ কিম্বা জ্যৈষ্ঠ মাসে নীল বুনিতে হয় ও নীল সমেত জমীতে চাষ দিতে হয়। এইরূপ চাষ দেওয়া হইলে ঐ কর্ষিত ক্ষেত্রে গম কিম্বা যব বপন করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গাঁজার সারেও উৎকৃষ্ট ফসল হইতে দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ গোবরের সার, তৃতীয়তঃ গোবর ও জিপসম (gypsum) চতু-র্থতঃ ছাই, পঞ্চম মাহাদ্রাবক মিশ্রিত অস্থি চূর্ণ, ষষ্ঠ অস্থি চূর্ণ এতদ্ব্যতীত পাউডারেট সারও (Paudrette) ব্যবহার করা হয়।

উল্লিখিত সারের মধ্যে নাইট্রোজনপ্রদ সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেখা গিয়াছে; অর্থাৎ নীল, পাউডারেট ও গোবর সারই অত্যুত্তম। গোবর ও জিপসম মিশ্রিত সার দ্বারা বিশেষ কোন ফলই লাভ হয় নাই। নাইট্রো-জন প্রদ নয় এরূপ সার অর্থাৎ অস্থি-চূর্ণ ও মহাদ্রাবক মিশ্রিত অস্থি-চূর্ণে কোন ফলদায়ক হয় নাই।

জিপসম (Sulphate of lime) আমেরিকায় ও ইউরোপে প্রধান সার মধ্যে গণ্য। এই জিপসম পঞ্জাব দেশস্থ লাবণিক পার্ব্বতীয় প্রদেশে ও নাইনিতাল পর্ব্বতে পাওয়া গিয়া থাকে। এই সার অন্যান্য প্রকারে ব্যবহার করা হয়। এরূপও দেখা গিয়াছে যে এই সার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করায়

কোন ফল না হইয়া অল্প পরিমাণ ব্যবহারে অধিক ফল লাভ হইয়াছে। কাংকর যুক্ত স্থান সমূহে এই সার ব্যবহারে কোন ফলোদয় হয় নাই, কারণ কাঁকরে চূণের অংশ থাকায় জিপসম ব্যবহারে কোন উপকার না হইয়া বরং সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা ইক্ষুতে করা হইয়াছিল। ইক্ষুর চাষে তিন প্রকার সার ব্যবহৃত হয়। পশ্বাদির বিষ্ঠা, গায়নো ও মহাদ্রাবক মিশ্রিত অস্থি চূর্ণ; এই সকলের মধ্যে মহাদ্রাবক মিশ্রিত অস্থি চূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তদপরে পশ্বাদির বিষ্ঠা এবং গায়েনা দেখা গিয়াছে। মাতলা নামক ইক্ষু বপণ করিয়া এই পরীক্ষা করা হয়। এক একার (Acre) পরিমিত ভূমিতে নিম্নলিখিত রূপ ফসল হইয়াছিল।

সার	মণ	লাভ	
গোবর	২৬০	৫৬॥৵৫	ইহা হইতে প্রতি মণে চিনি করিবার জন্য খরচ বাদ যাইবে।
ঐ	১৩০	৩৯॥১০	
গায়নো	১২৸৫	২৩৲১৫ (ক্ষতি হয়।)	
ঐ	৩৷৮	১০৸১৫	
মহাদ্রাবক মিশ্রিত অস্থি চূর্ণ।	৬॥৫	৯৪৷৫	
ঐ	৩৸২	৪৪॥৶০	

উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, কোন উদ্ভিদের উন্নতি সাধন, সার প্রদান ও বীজ নির্ব্বাচন এবং পাইটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বীজ নির্ব্বাচন দোষে যে এদেশে অনেক প্রকার ফল ও ফুলের আকার ছোট এবং আস্বাদনেরও যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সচরাচর দেখা যায় বড় ফল বিশিষ্ট গাছের চারা বড় হইয়াই থাকে, তবে স্থান বিশেষে যে উহার আকারগত বৈলক্ষণ্য দেখা যায় তাহার নানাবিধ কারন আছে। আমরা বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছি একই কপি বীজ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রোপিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে উৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে ফুল কপির যেরূপ আকার দেখা

যায়, এ দেশে সেরূপ আকারের ফুল সচরাচর উৎপন্ন হয় না। পাটনাই ডালিম, কাশীর কুল, সিলেটের কমলা লেবু সকল স্থানে রোপিত হইলেও জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে আকার গত ও আস্বাদনের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। যত্ন ও চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা কৃষি কার্য্যের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ঐ সকল দেশে যেরূপ যত্ন ও উন্নতির চেষ্টা দেখা যায়, এ দেশে সেই পরিমাণে চেষ্টা হইলে যে কতদূর উন্নতি হইত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

পূর্ব্বে এদেশে কলমের তত প্রচলন ছিল না। বীজ হইতেই চারা উৎপন্ন হইত। এক্ষণে অধিক পরিমাণে কলমের ব্যবহার হইতেছে। বীজ অপেক্ষা কলমের গাছে যে ফল ও ফুলের বিস্তর উপকার হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বীজের গাছে গুণের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, কিন্তু ডাল নির্ব্বাচন দোষে আবার কলমেও গুণান্তর হইতে দেখা যায়। বীজ নির্ব্বাচনের উপর যেমন উদ্ভিদের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, ডালনির্ব্বাচনের উপরও সেইরূপ তাহাদিগের উন্নতি নির্ভর করিতে দেখা যায়। যেমন বৃক্ষের সকল বীজে ভালরূপ গুণ প্রাপ্ত গাছ জন্মে না, সেইরূপ গাছের সকল ডালের চারায়ও উৎকৃষ্ট ফুল ফল হয় না। এজন্য ডাল নির্ব্বাচন পক্ষে বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

যে সকল ফুল ফল ক্ষুদ্র আকারের হইতে আরম্ভ হয়, সেই সকল গাছের বীজ কিম্বা ডালের কলমে চারা উৎপাদন করিলে সেই গাছে যে ফুল কিম্বা ফল হইবে তাহাও প্রায়ই ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক গাছ এরূপ আছে যে তাহাদিগের বয়স অধিক হইলে ফুল ও ফলের আকার ছোট হইয়া যায়, এ জন্য ঐরূপ অধিক বয়সের গাছ কাটিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন গাছ রোপণ করা ভাল। বয়স অধিক না হইলেও নানা প্রকার রোগ উপস্থিত হইয়া গাছের ফুল ও ফল ছোট আকারের হইয়া থাকে। জুঁই, বেলা প্রভৃতি অনেক গাছে দেখিতে পাওয়া যায় এক প্রকার রোগ হইয়া ডাল কোঁকড়াইয়া পাতা সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং সেই সকল পাতার উপর ডিম ডিম এক প্রকার রোগ হইয়া উঠে, এই প্রকার রোগে গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে, এজন্য যে সকল ডালে ঐ রূপ রোগ

হইবার উপক্রম দেখা যায় সেই সকল ডাল কাটিয়া বাগান হইতে অনেক দূরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। অনেকে পোকা লাগা ডাল কাটিয়া বাগানেই ফেলিয়া রাখেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা বাগান হইতে দূরে রাখাই কর্ত্তব্য; কারণ বাগানে উহা পতিত থাকিলে ঐ কর্ত্তিত ডালের পোকা সকল আসিয়া অন্যান্য গাছে লাগিতে পারে। এ জন্য যে কোন রোগগ্রস্থ শাখাদি বাগানে রাখা কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্যাদির মধ্যে যেমন নানা প্রকার সংক্রামক রোগ আছে, ঐ রোগ কোন স্থানে উপস্থিত হইলে যেমন উহা অল্প দিনের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ বৃক্ষাদির মধ্যেও নানা প্রকার সংক্রামক রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল ও ফলাদির আকার বড় হইলেই যে উন্নতি হইল, এরূপ মনে করাও চিত নহে। আকার বড় হওয়ার সহিত গুণেরও ঔৎকর্ষ সাধিত হইলে, প্রকৃত উন্নতি মনে করিতে হইবে।

এরূপ অনেক আম্র আছে যে তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ, দেখিলে মনে আনন্দ উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহার আস্বাদন অত্যন্ত বিস্বাদু এবং পান্‌সা, এরূপ আকারগত সৌষ্ঠবে কোন উপকার নাই, ঐরূপ আস্বাদবিশিষ্ট ফল-বৃক্ষ অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ ঐ একটী গাছের দোষে বাগানের অন্যান্য ভাল ভাল গাছের ফল মন্দ হইতে পারে। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ভাল বীজ হইতে যে গাছ উৎপন্ন হইবে তাহার ফল অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু সকল স্থলে সে কথা রক্ষা পায় না। মনে কর বাগানে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আম্র বৃক্ষ আছে, আর কতকগুলি অত্যন্ত অম্লবিশিষ্ট। এক বাগানে এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির গাছ থাকিলে সহজেই তাহাদিগের গুণান্তর উৎপত্তি হইতে পারে। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের মধ্যে যেমন স্ত্রী ও পুরুষ দুইটী জাতি আছে। বৃক্ষাদির মধ্যেও সেইরূপ স্ত্রী পুরুষ দেখা যায় এবং প্রাণিদিগের যেরূপ স্ত্রী পুরুষের সঙ্গমে গর্ভ সঞ্চারিত ও সন্তান উৎপন্ন হয়, উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যেও সেইরূপ নিয়ম বর্ত্তমান আছে। সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বর যেরূপ কৌশলে উদ্ভিদ্‌দিগের গর্ভ সঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না

করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। পুষ্পের যে সকল পদার্থ গর্ভ-কোষে পড়িয়া গর্ভ সঞ্চার হয়, সকল পুষ্পে ঐ সকল পদার্থ থাকে না। এ জন্য বায়ু সংযোগে এবং মক্ষিকাদির গাত্র সংযুক্ত হইয়া ঐ সকল পদার্থ গর্ভাশয়ে পতিত হয় এবং গর্ভ উৎপাদন করে। বাগানে অনেক সময়ে যে দেখা যায় মিষ্ট আঁঠির গাছেও যে টক আম্র হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে মক্ষিকাদির গাত্র সংযুক্ত গর্ভোৎপাদক পদর্থ মিষ্ট আম্র গাছের পুষ্পে সঞ্চারিত হয় এবং বায়ু দ্বারাও আসিয়া পতিত হয় এই সকল কারণে অনেক সময় ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। কোন স্থানে এরূপ পরীক্ষা হইয়াছে টক অম্র গাছে মুকুলোদ্গমের সময় হইতে সমুদায় শাখাদি এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া কোন প্রকারে মক্ষিকাদির সংস্পর্শ করিতে দেওয়া হয় নাই। সুতরাং অন্য কোন গাছের রেণু আদি তাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়া স্বাভাবিক নিয়মে আম্র হইয়াছে। মিষ্ট আম্রের পুষ্পিত অবস্থায় বায়ু ও মক্ষিকাদির গাত্র সংযোগে টক আম্রের রেণু ঐ পুষ্পে পতিত হয় এই সকল কারণে আম্রের গুণান্তর হইয়া থাকে। অনেকে দেখিয়াছেন যে এক গাছের ভিন্ন ভিন্ন ডালে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদনের আম্র হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা যে ঐ গুণান্তরের কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বাগানে টক কিম্বা বিস্বাদু অম্রের গাছ রাখিয়া অন্যান্য গাছের অনিষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। মন্দ জাতীয় ফুল ফলের গাছ কাটিয়া সেই বংশ লোপ করা ভাল।

অনেকে বাগানে গাছাদি ঘন রোপণ করিয়া পরিশেষে মায়া করিয়া উহা কাটিতে পারেন না। গাছ ঘন রোপণ করিলে উহা আবশ্যকীয় স্থান ব্যাপিয়া বৃদ্ধি হইতে পারে না এবং উপযুক্ত পরিমাণে রস গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেও ব্যাঘত জন্মে। শাখা ও শিকড় সমূহ পরস্পর জড়িত হইয়া পরস্পরের অনিষ্ট সাধন করিতে থাকে। ঘন করিয়া গাছ রোপণ করিলে প্রায়ই গাছ সোরু হইয়া উঠে এবং ফুল ফলাদি আবশ্যকীয় আকারে উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য বৃক্ষাদি রোপণের সময় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি থাকা উচিত। শাক সবজী শস্যাদি ঘন হইলে অনেক বহুদর্শী কৃষক ক্ষেত্রস্থ কতক গাছ মারিয়া দেয়, তাহাতে অবশিষ্ট গাছ সমূহ বেশ ঝাড়াল হইয়া

উঠে। এ স্থানে ইহাও জানা উচিত সকল জাতীয় গাছের পক্ষে যে এই নিয়ম তাহা নহে। পাট ও শোণ গাছ ঘন রোপিত হওয়া উচিত। কারণ গাছ ঘন হইলে, চারিদিকে ডাল পালা বাহির হইতে পায় না, সুতরাং সোরু হইয়া উপর দিকে লম্বা হইয়া উঠিতে থাকে। এই সকল গাছ যত লম্বা হয় আঁশ তুলিবার পক্ষে ততই ভাল, পাট ও শোণের লম্বা আঁশ, অধিকাংশ কাজে লাগিয়া থাকে এবং বাজারে উহার মূল্যও অধিক।

ফুল ও ফল বড় আকার করিতে হইলে এক একটী গাছে অধিক ফল রাখা উচিত নহে। গাছে অধিক ফল ধরিলে তাহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। কারণ গাছে অধিক ফুল কিম্বা ফল হইলে তাহারা আবশ্যকীয় আহার্য্য রস পায়না। আমরা যেমন এক জনের খাদ্য দুই জনে ভাগ করিয়া খাইলে কিছু দিনের মধ্যে উভয়েই দুর্ব্বল হইয়া যাইব। সেই রূপ অল্প পরিমিত ফুল ফলাদির পুষ্টিসাধনোপযোগী রস বহু পরিমাণ ফুল ফলে সঞ্চারিত হইলে অবশ্যই তাহাদের আকার ক্ষুদ্র হইবে। এবং সেই সকল ফুল ফলের বীজে চারা উৎপন্ন করিলে তাহাতে যে ফুল ও ফল হইবে তাহাদের আকার অবশ্যই ক্ষুদ্র হইবে। এইরূপে বিস্তর ফুল ও ফল ক্রমেই ক্ষুদ্র আকারের হইয়া উঠিয়াছে। অনেকে দেখিয়াছেন যে সকল গাছে অধিক নারিকেল ফলিয়া থাকে তাহার আকার কখনই বড় হয় না আর যে সকল গাছে অল্প পরিমাণে ফল ধরিয়া থাকে, তাহা প্রায়ই বৃহৎ হয়। ফলতঃ ফুল ও ফলাদির প্রতি যত্ন করিলে যে তাহাদিগের উন্নতি করা যাইতে পারে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কৃষি কার্য্যের যে পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কৃষকদিগেরও যে সেই পরিমাণে লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবে তাহা বলা বাহুল্য। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্বারা আজি কালি আমাদের দেশে আকের চাষের কিরূপ অবস্থা তাহার অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। মরিসস ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপের আকের চাষের তুলনায় আমাদের দেশে আকের চাষের অতি হীন অবস্থা। মরিসসে অতি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসারে চাষ হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশেও ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া যে সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মরিসসে দেশীয় আকের চাষ করিয়া এত বড় আক তৈয়ার হইয়াছে যে, চাষী লোকেরা উহাকে দেশী আক বলিয়াই বিশ্বাস করে না, তাহারা বলে যে উহা নিঃসন্দেহ কোন এক প্রকার ভিন্ন জাতীয় আক হইবে। এই পরীক্ষায় ততদূর উর্ব্বরা ভূমি লওয়া হয় নাই এবং ততদূর যত্ন করিতেও পারেন নাই, যদি ভূমি আরও উর্ব্বরা হইত এবং আরও অধিক যত্ন করা যাইত, তাহা হইলে আকের পরিমাণ ও গুণ উভয় সম্বন্ধেই আরও ভাল ফল পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশে যেখানে ভাল চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেখানে এক একর (অর্থাৎ প্রায় তিন বিঘা) জমিতে ২৫ হইতে ৩০ টন করিয়া আক উৎপন্ন হয়; কিন্তু আমাদের দেশে খুব বেশী হইল তো ১৫ কি ২০ টন আক জন্মিল। এবং অন্যান্য দেশে প্রতি একারে ২॥০ কি ৩ টন (এক টনে ২৭ মণ হইবে) চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদিও আজি কালি অনেক প্রকার গণ্ডীগাছ চলিত হইয়াছে বটে, তথাপি আমাদের চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী এখনও অনেক হীন। আমাদের দেশে আক মাড়িয়া শতকরা ৫০ মণ রস বাহির হয়, কিন্তু ওয়েষ্ট-ইণ্ডিয়া দ্বীপ পুঞ্জে শতকরা ৬৫ মণ রস বাহির হইয়া থাকে; এবং গুড়ের ভাগ দ্বিগুণ কিন্তু উক্ত দ্বীপে গুড় অপেক্ষা শুষ্ক চিনির ভাগ তিন গুণ। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে উক্ত দ্বীপে আকের ওজনের অর্দ্ধেক রস বাহির হইত, অর্থাৎ আমাদের দেশের ন্যায় শতকরা ৫০ মণ রস বাহির হইত, কিন্তু এক্ষণে উপযুক্ত কলের দ্বারা শতকরা ৭৫ হইতে ৮৫ মণ রস উৎপন্ন হইতেছে। উপযুক্ত কলের অভাবে আমাদের দেশে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে উন্নতি করিতে হইলে সামান্য চাষী লোকে সফলযত্ন হইতে পারে না। এদেশে যদি ধনী ও জমিদারবর্গ কৃষি কার্য্যের উন্নতিকল্পে চেষ্টা করেন তাহা হইলে ফুল ও ফল এবং শস্যাদির আকারগত উন্নতি এবং ফলন ও অধিক হইতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপন্নের হার বৃদ্ধি ও আকারগত উন্নতি করিতে পারিলে কেবল মাত্র যে কৃষকদিগের লাভ তাহা নহে, তদ্বারা ভূম্যাধিকারীগণেরও আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। কারণ ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি

হইলে সেই সঙ্গে জমিরও করবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে জমীদারগণ স্ব স্ব জমীদারী হইতে যে পরিমাণে কর আদায় করিয়া থাকেন, ভূমির উন্নতি করিতে পারিলে তাঁহাদিগেরও সেই সঙ্গে আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দেশীয় জমীদারগণ স্ব স্ব জমীদারীর কোন প্রকার উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন না, তাঁহারা খাজনা আদায় করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন

এদেশে সহজেই ফল ও ফুল এবং শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে যদি আবার বৈজ্ঞানিক নিয়মে চাষ করা যায়, তবে নিশ্চয় বলিতে পারা যায়, পৃথিবীর মধ্যে সমুদায় স্থান অপেক্ষা এদেশে কৃষি কার্য্যের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে। যে সকল স্থানের ভূমি বহু কাল হইতে অনাবাদী পতিত রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে চাষ আরম্ভ করিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)

দুলাল চাঁপা।

এ দেশে যে কএক প্রকার চম্পক পুষ্প আছে, সকল গুলিই সুগন্ধ-বিশিষ্ট। চাঁপা ফুলের যেরূপ সুগন্ধ সেইরূপ মনোহর সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য ও পরিমল একত্রে সমাবেশ নিবন্ধন সকলেই চম্পকের আদর করিয়া থাকেন।

চাঁপা নানা জাতীয়; এক এক প্রকার চাঁপার এক এক প্রকার স্বতন্ত্র আকার ও স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য এবং স্বতন্ত্র পরিমল। আমরা এ প্রবন্ধে অন্যান্য চাঁপার বিষয় উল্লেখ না করিয়া কেবল দুলাল চাঁপার বিবরণ লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। অন্যান্য চাঁপার বিবরণ অবসর ক্রমে প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব।

দুলাল চাঁপার বর্ণ সম্পূর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত। সেই শ্বেত বর্ণের মধ্য হইতে এক প্রকার রমণীয় চাকচিক্য নির্গত হইতে থাকে। কোন দ্রব্য উৎকৃষ্ট-

রূপ বার্ণিস করিলে তাহা হইতে যেমন এক প্রকার আভা বাহির হইয়া থাকে। ইহার পুষ্প হইতেও সেই রূপ আভা বাহির হয়। পুষ্পের সৌন্দর্য্য সঠিক লিখিয়া প্রকাশ করা বড় কঠিন। উহা নিজের চক্ষে না দেখিলে ঠিক সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায় না। দুলাল চাঁপার যেরূপ মনোহর সৌন্দর্য্য ও যেরূপ প্রীতিকর সুগন্ধ তাহা দর্শন কিম্বা আঘ্রাণ করিলে মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়।

এই চাঁপার রোপণ প্রণালী অতি সহজ। কোনরূপ বিশেষ পাইট করিতে হয় না। ইহার মূল হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহা কিম্বা গেঁড় এই উভয়ের মধ্যে যাহা রোপণ করা যায় তাহা হইতেই গাছ হইয়া থাকে। কলার মূল হইতে যেমন তেউড় বাহির হয়, সেই রূপ ইহারও মূল হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে। মূলের কতক অংশসমেত সেই চারা তুলিয়া রোপণ করিলে গাছ হইতে পারে। মূল বা গেঁড় অপেক্ষা উক্ত রূপ অবস্থার চারা তুলিয়া পুঁতিলে সহজেই চারা হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে সকল সময় দুলাল চাঁপার ফুল হয় না। বর্ষাকালে গাছে ফুল হইয়া থাকে। দুলাল চাঁপার এক একটী ঝাড় হইয়া থাকে। বর্ষা আরম্ভ হইলে সেই ঝাড় হইতে প্রচুর ফুল ফুটিতে থাকে। কোন স্থানে একবার একটী গাছ পুঁতিলে সহজে তাহা নষ্ট হয় না। ক্রমেই গাছ বৃদ্ধি হইয়া ঝাড় হইয়া উঠে। অন্যান্য ঋতুতেও গাছের অবস্থা তত ভাল দেখা যায় না। কোন কোন স্থানে আবার এরূপও দেখা যায় বর্ষান্তে গাছ মরিয়া গিয়াছে, আবার বর্ষা আরম্ভ হইলে সেই সকল গাছ পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠে। রৌদ্রাদিতে গাছ মরিয়া গেলে, তাহার গেঁড় মরে না, উহা মাটির মধ্যে সজীবাবস্থায় থাকে, বর্ষার জল পাইলে নবজীবন লাভ করিয়া বাঁচিয়া উঠে। দুলাল চাঁপা এক প্রকার বর্ষাকালের ফুল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কুঁড়ি ফুটিতে থাকে, এবং রাত্রি কালে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সেই সময় উহাতে অত্যন্ত গন্ধ থাকে। দিবসে যখন রৌদ্র প্রবল হইতে আরম্ভ হয় সেই সঙ্গে পুষ্পও মলিন এবং হতশ্রী হইতে দেখা যায়।

দুলাল চাঁপার কলম হয় না। উহা মূল জাতীয় গাছ। দুলাল চাঁপার গাছের সহিত আদাগাছের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পাতা ও গাছের

উচ্চতা পায়ই এক রূপ হইয়া থাকে। ইহার চারা রোপণের পক্ষে বর্ষা-কালই প্রশস্ত সময়।

বালির অংশ বিশিষ্ট মাটিতে দুলাল চাঁপা ভাল হইয়া থাকে। যে স্থানে সর্ব্বদা প্রখর রৌদ্র পায়, সেখানে এই গাছ রোপণ করিলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এ জন্য ইমারতের পার্শ্বে এবং বৃক্ষাদির ছায়া যুক্ত স্থানে উহা রোপণ করিলে, গাছের তেজোবৃদ্ধি এবং উৎকৃষ্টরূপ ফুল হইয়া থাকে। সহজে ফুলের সুগন্ধ ও সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে হইলে দুলাল চাঁপার ন্যায় পুষ্প আর দেখা যায় না। এ জন্য অনেকে টবে উহা রোপণ করিয়া বারাণ্ডায়ে রাখিয়া থাকেন। টবে গাছ করিতে হইলে একটু বড় আকারের টবে রোপণ করা ভাল। দুলাল চাঁপার শিকড় অধিক মাটির নীচে গমন করে না। সুতরাং টব অধিক গভীর আকারের না হইলেও তত ক্ষতি নাই কিন্তু উহা প্রশস্থে বড় হইলে গাছের পক্ষে উপকার হইয়া উঠে। টবের মাটি যাহাতে অধিক কঠিন না হয়, তদ্‌পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। গাছের গোড়ার মাটি কঠিন হইলে উহার বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত হয়। এ জন্য মাটি কঠিন হইবার উপক্রম হইলে উহা খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক। টবের মাটি শুষ্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দিতে হয়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে টব পূর্ণ হইলে তাহা ঢালিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কারন মূলে অধিক জল বসিলে গাছ পচিয়া যাইবার সম্ভব। এ জন্য বৃষ্টির জলে যাহাতে উহা পচিয়া যাইতে না পারে তদ্‌পক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

কলার আদর।

—০:::০—

তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে।
থাক গৃহী ঘরে শুয়ে॥
রুয়ে কলা না কাট পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥

কলা গাছ দ্বারা আমাদের বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। ইহার আবাদে বিলক্ষণ লাভ হয়। সহজ উপায়ে ইহার যেমন চাষ হইয়া থাকে অন্য কোন গাছ সেরূপ হয় না। সামান্য ব্যক্তি মাত্রেই ইহার আবাদ করিয়া ফলভোগ করিতে পারেন। বঙ্গ দেশের প্রায় সর্ব্ব স্থলেই কলার আবাদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতে কলা এদেশে প্রচলিত আছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কলা অনেক মাঙ্গলিক কার্য্যে লাগিয়া থাকে। কলার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। কলা তরকারী ও জলপানের সময় ব্যবহার হয়। এক এক জাতীয় কলার এক এক প্রকার আস্বাদন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন জাতীয় কলার আস্বাদন এত উৎকৃষ্ট যে একবার উহা ব্যবহার করিলে সে মধুরতা আর ভুলিতে পারা যায় না। একটু সামান্য যত্ন করিলেই কলার আবাদ করিতে পারা যায় সত্য বটে কিন্তু কি কি উপায়ে আবাদ করিলে ফল উৎকৃষ্ট হয় তদ্‌সম্বন্ধে এদেশে কোন প্রকার যত্ন নাই। যে সকল ফল স্বাভাবিক উপাদেয় যত্ন করিয়া তাহার চাষ করিলে আরও যে উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহা অনেকেই অবগত নহেন। এ পর্য্যন্ত এদেশে যে প্রণালীতে কলার আবাদ হইয়া থাকে, তাহাতে উন্নতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেবল মাত্র গাছ করিয়া পাতা, থোড় এবং কলা বিক্রয় দ্বারা কলা আবাদের লাভ হয় না। লাভ করিতে হইলে উহা দ্বারা অন্য দ্রব্য উৎপাদন করিবার উপায় আবিষ্কার করিতে হয়। কলা গাছের উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটী এ স্থলে উল্লিখিত হইল। *

* ২০ এ আষাঢ় ১২৮৯ সালের নববিভাকর দেখ।

"কলার চাষে লোকে বড় মানুষ হইতে পারে। এক বিঘা ভূমিতে যেমন করিয়া হউক এক শত ঝাড় কলা সুন্দররূপে ফল প্রদান করিতে পারে। কলা গাছ একবার পুঁতিলেই বহুকাল চলে। একটী ক্ষুদ্র তেউড় পুঁতিলে এক বৎসরের মধ্যে সেই স্থানে একটী বৃহৎ ঝাড় হইয়া পড়ে। তেউড়টী ফলপ্রদ হইতে জোর আট মাস লাগে। এটী যত দিনে ফল-প্রদানোপযোগী হয়, তত দিনে আবার তাহারই পার্শ্ব দিয়া আট দশটী তেউড় গজাইয়া ক্রমে বড় হইতে থাকে। এমন বংশ বৃদ্ধি এত শীঘ্র আর কোন বৃক্ষেরই হয় না। একশত কলার গাছ পুঁতিলে একটী হাজার কলা গাছের সংস্থাপন করা হয়। আর চাষ করিতে কিছু মাত্র ক্লেশ নাই। জমিটি একবার কোদলাইয়া দেও ত বড় ভালই হয় না দিলেও গাছ হইবে। কলা নানা প্রকার, তন্মধ্যে কাঁটালী, মর্ত্তমান, চাঁপা ও কাঁচকলাই আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে জন্মে। বর্ত্তমান পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। মার্টাবান দ্বীপ হইতে এ কদলী এদেশে আনীত হইয়াছে, নামেই তাহা প্রকাশ। আর যাহারা রীতিমত শুদ্ধসিদ্ধি প্রথায় ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকেন, মর্ত্তমান বিদেশীয় ফল বলিয়া পূজা অর্চ্চনায় ইহার ব্যবহার করে না। কিন্তু খাদ্য কল্পে মর্ত্তমানেরই মূল্য অধিক। এরূপ পরিপুষ্ট আরকোন কলারই নাই; চাঁপা ইহার নীচে। অম্লরসের কিঞ্চিৎ আধিক্য প্রযুক্ত চাঁপা সাহেবদিরের অধিক প্রিয়। আমাদের মুখেও যে চাঁপার আদর নাই এরূপ নহে। কাঁচকলা ত একটী প্রধান তরকারী, বিধবাদিগের প্রধান অবলম্বন। কাঁটালীর যেমন মূল্য অল্প তেমনই ফলনে অধিক, এক দিকে না এক দিকে পোষাইয়া যায়। এখন যে আরও কত প্রকার সৌখীন কলা উদ্যান শোভাসম্পাদন করিয়া থাকে, তাহার নাম আর আমরা করিলাম না। যে সকল রম্ভাতরু দৈর্ঘ্য ও পুষ্টিতে শ্রেষ্ঠ, সেই গুলি লইয়াই এ প্রস্তাবের সম্পর্ক। আমরা কেবল কলার ফল লইয়া অদ্য তত ব্যস্ত নহি। ফল ত আছেই। এ ফল বড় সামান্য নহে। বড় বড় পুরন্ত চাটিম ও চাঁপা দেখিলে অনেকেরই রসনা রসিয়া যায়; বৈদ্যবাটীর হাটে যাইলে অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। কলার কাছে সাহেবদিগকেও মাথা নোয়াইতে হয়। পুষ্টিকরতাপক্ষেও কদলী বড় কম নহে। কেবল কলা খাইয়া কত লোকে জীবন ধারণ করিতে

পারে। এ হেন কদলীর চাষ বঙ্গে যত ইচ্ছা তত কর, ফলের আদর কিছু-তেই কমিবে না। এক বিঘা ভূমিতে সালিয়ানা যেমন করিয়া হউক ৫।৬ মণ কলা ফলিয়া থাকে। কাঁদী হিসাবে যেমন করিয়া হউক যদি ২৫ কাঁদী কলাও ফলে তাহা হইলেও লাভ কম নহে। ভাল মর্ত্তমান পয়সায় দুইটা করিয়া বিক্রয় হয়। ভাল চাঁপা চারিটার অধিক পাওয়া যায় না। পূরা এক কাঁদী কলা বেচিয়া ১৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে। এ বড় সামান্য লাভের কথা নহে। ঝড়ে ভাঙ্গিলেও কলার চাষ একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। পড়া গাছ তুলিয়া দিলে চলে, অফলন্ত ভাঙ্গা গাছের ভগ্নাংশ কাটিয়া দিলে আবার শীঘ্রই নূতন গাছ দেখা দেয়। ফল ছাড়া এখন আমাদের দেশে পাতারও আদর কম নহে। যত দিন ফলারের প্রাদুর্ভাব থাকিবে, কলা-পাতার আদর তত দিন থাকিবে। কলা গাছের থোড়ও বাঙ্গালীদের একটী খাদ্য। মোচার ত কথাই নাই। বীচেকলার মোচারই আদর। কদলী বৃক্ষের যে অংশে মানুষের প্রয়োজন নাই, তাহা গরুর খোরাক। কলা বাসনার ক্ষার রজকেরা সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। তবেই দেখা যাইতেছে, কলার আদর আমাদের দেশে এমনই বিলক্ষণ আছে। কিন্তু পশ্চাত্য সভ্যতা ইহার আদর আরও বাড়াইতে চলিয়াছে। বিলাতী কলের কল্যাণে কাপড়ে সকল জিনিশেরই ভেল চলিতে আরম্ভ হইয়াছে; এখন-কার বিলাতী বস্ত্র গুলি প্রকৃত প্রস্তাবে যৎকিঞ্চিৎ তুলার আভাযুক্ত, গাঢ় পাট বলিলেই হয়। পাট ছাড়া, শণ, তিসীর ছাল, মুগ্‌রা, বন-আনারস, ঘৃতকুমারী প্রভৃতি যে সকল বৃক্ষের ত্বকে আঁস আছে তাহাতেও বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। মাঞ্চেষ্টরের আর কিছুতেই মনস্তুষ্টি হইতেছে না। কিসে কাপড় শস্তা করিবেন বিলাতী তাঁতী মহাশয়দিগের নিরন্তর এই চিন্তা। সম্প্রতি অনেকের আবার কলারদিগে নজর পড়িয়াছে। কলার আঁসে বস্ত্র হইতে পারে; আঁস গুলি অতি সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল। বৎসর দুই হইল, বোম্বাই অঞ্চলে দুই জন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কলার সূতায় কাজ চলে। সূতায় কাপড় হয়, সূতা বাহির করিয়া লইলে যাহা পড়িয়া থাকে, তাহার অধিকাংশে আবার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। কলাবাসনায় যে বেশ কা-গজ হয় তাহার পরীক্ষাও হইয়াছে। ৮০০ কদলীবৃক্ষে ৪০০ টাকা লাভ হয়;—

সূতা	২৮ মণ	২০০ টাকা
ঝড়ুনী	১৪ মণ	৫০ ,,
কাগজের উপযুক্ত বাসনা	১৪ মণ	৫০ ,,
মোট	৫৬ মণ	৪০০ টাকা।

১৮৮০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহর হইতে লিভারপুলে এই মাল লইয়া গিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই মাল উৎপন্ন করিতে এখানে ৫২ টাকা খরচ পড়িয়াছে ;—

৮০০০ কলাগাছ শতকরা ২৲ হিঃ	১৬৲
গাড়ী ভাড়া ঐ	১৬৲
কাটা, ফাঁড়া, ধোয়া, শুকান, বস্তাবন্দী প্রভৃতি দঃ ৪০টা মজুর খরচ।০ হিঃ	১০৲
কলের কাট কয়লা	৫৲
হরেক রকম	৫৲
মোট	৫২ টাকা।

বোম্বাই সহর হইতে দূরবর্ত্তী বাসীন প্রদেশে সাহেবদের কলার কারখানা হইয়াছিল। সেখান হইতে বোম্বাই লইয়া যাইতে, এবং জাহাজ ভাড়া দিয়া লিভারপুলে পৌঁছিতে যে খরচটা পড়িয়াছিল, তাহা মাল তৈয়ারী খরচা ৫২ টাকার উপর চাপাইলেও ২০০ টাকার অধিক পড়িবে না। তবুও দেখ লাভ কত। সহযোগী ইংলিসম্যান ঠিক কথাই বলিয়াছেন, সাহেবদের যদি নিজের কলার চাষ থাকিত, তাহা হইলে খরচা আরও কম পড়িত। আমাদেরও সেইরূপ বিশ্বাস। নিজের চাষ থাকিলে ফল পাতা বিক্রয় করিয়াই বোধ হয় খরচটা উঠিয়া যাইত। আর কলার সুতা বাহির করিবার জন্য তাঁহারা যে কল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা হয় ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। ভাল কল হইলে হয়ত আঁস বাহির করিবার সুবিধা আরও হইতে পারে; হয়ত যাহা এখন রেজাটির সঙ্গে বাদ দিতে হইতেছে, ভাল কলে পড়িলে তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট সূতা বাহির হইতে পারে। বিজ্ঞান ও অধ্যাবসায়ের অসাধ্য কিছুই নাই। অদ্য যাহা দুই এক জনের

কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বোধ হইতেছে, দশ বিশ বৎসরের পরে তাহাই আবার একটী প্রকৃত কারবারে দাঁড়াইতে পারে। আমাদের বেশ বোধ হইতেছে, সাহেবেরা শীঘ্রই কলার চাষে প্রবৃত্ত হইবেন। নিম্ন বঙ্গের প্রায় সকল ভূমিতেই কদলীর চাষ হইতে পারে। সাহেবেরা আসিয়া এই সকল ভূমিতে কলা অজ্জাইয়া, কলা ফলাইয়া, কলা বেচিয়া, কলার গাছে কাপড় ও কাগজের উপযোগী মাল মসলা প্রস্তুত করিয়া স্বদেশে বিপুল অর্থ লইয়া যাইবেন, আর তোমরা চিরকাল কলাপোড়া খাইয়া কাল কাটাইবে, এইটাই কি দেখিতে ভাল ?"

কলা দ্বারা যেরূপ আয় হইতে পারে তাহা উল্লিখিত হইল। যাহা আমরা সামান্য গাছ মনে করিয়া চাষে অবহেলা করিয়া থাকি তদ্বারা আমাদের কত উপকার হইয়া থাকে। অতএব এই সময় কলার আবাদে মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এদেশে শিল্প কার্য্যের উন্নতি না থাকায় কৃষিজাত দ্রব্যাদির অনেক অংশ বৃথা নষ্ট হইয়া থাকে। যে সকল অংশ বৃথা নষ্ট হয় কিম্বা সামান্য কার্য্যে ব্যবহার হয় তাহা কোন শিল্প কার্য্যে ব্যবহার হইলে তদ্বারা প্রভূত আয় হইতে পারে। মনে কর পূর্ব্বে আমাদের দেশে পাটের বিশেষ আদর ছিল না সুতরাং উহার চাষে তত লাভ দেখা যাইত না। এক্ষণে পাট শিল্পে ব্যবহার হওয়াতে উহার যেরূপ আদর এবং যেরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। যে পাট কেবল দড়ী থলে প্রভৃতিতে ব্যবহার হইত আজকাল সেই পাট নানাপ্রকার পরিধেয় বস্ত্রে ব্যবহার হইয়া সভ্য সমাজের পরিচ্ছদের কার্য্য করিতেছে। বাস্তবিক বিজ্ঞানের সম্যক অনুশীলন না হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হয় না। পাটের ন্যায় কলার বাসনায় কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার উপায় দেশ মধ্যে প্রচলিত হইলে কৃষি কার্য্যে প্রকৃত লাভের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক কৃষিজাত দ্রব্য শিল্প ও বাণিজ্যে পরিণত করিতে না পারিলে লাভের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশ যে কৃষি কার্য্যে সুন্দররূপ লাভ দেখিতে পাওয়া যায় না শিল্পাদির উন্নতি না থাকাই তাহার এক মাত্র কারণ।

আম্রে কীট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১২০ পৃষ্ঠার পর।)

"কৃষিতত্ত্ব পাঠে অবগত হইলাম সংপ্রতি পূর্ব্ব বাঙ্গালায় আম গাছে পোকা ধরিয়া ডাল ও গাছ নষ্ট করিতেছে তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে অতএব মৎলিখিত উপায়টি অবলম্বন করিয়া আমাকে পত্র লিখিবেন গাছের অবস্থা কিরূপ থাকে। প্রথমতঃ অগ্রে একটী গাছে পরীক্ষা করিয়া অন্য গাছের পক্ষে পরে চেষ্টা করিবেন, ১৫ দিবসের মধ্যে গাছে পোকা থাকিবে না।

গাছের গোড়ার মৃত্তিকা অর্দ্ধ হস্ত হইতে এক হস্ত পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া তাহার আস্থানিক সরু শিকড় কাটিয়া দিবেন (এক বা অর্দ্ধ হস্ত মধ্যে যত পাওয়া যায়) সেই শিকড় সামান্য তৃণের ন্যায় পাতলা যেন হয়, মোটা শিকড় কাটিবেন না। পরে ধান্য ক্ষেত্র হইতে মৃত্তিকা আনিয়া তিলের খৈল ১ ভাগ ও মৃত্তিকা তিন ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ দিবস রৌদ্রে এবং শিশিরে দিয়া তাহার পর সেই মৃত্তিকাতে পচাপুঁটি মাছ এবং পুরাতন ইষ্টকের চূর্ণ ও শঙ্খ আলুর বীচি কিছু চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বের মৃত্তিকায় মিশাইয়া এক দিন রৌদ্র ও হীমে শুষ্ক করিয়া গর্ত্তপূর্ণ করিবে। (সেই গর্ত্ত ২ দিনের অধিক আল্‌গা রাখা উচিত নহে) পরে সেই গর্ত্তে মাদা বান্ধিয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ার /১ সের ভেরেণ্ডার খৈল দিয়া জল দিবে, ইহাতে যদি পোকা সম্পূর্ণ নষ্ট না হইয়া বৃক্ষ সতেজ না হয় তবে সেই ভেরেণ্ডা রান্ধিয়া এদেশে যে তৈল বাহির করে সেই জল উক্ত ক্ষত স্থানে দিনে দুইবার প্রদান করিবে এবং একটি হাঁড়িতে সেই জল রাখিয়া গাছের গোড়ায় অথবা যে যে স্থানে পোকা লাগিবার সম্ভব সেই ডালের নীচে বসাইয়া দিলে সেই পোকা হয় সে ডাল হইতে চলিয়া যাইবে নচেৎ সেই জলপূর্ণ হাঁড়িতে আসিয়া মরিবে, ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

আমাদের ইহা পরীক্ষিত ঔষধ, অতএব এ বিষয় অধিক কিছু করিতে হইবে না, এক সপ্তাহ মধ্যে ভাল মন্দ জানিতে পারিবেন।"

আমরা আশা করি আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদিগের আম্র গাছে

উপরিউক্ত কীট লাগিয়া অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাঁহারা যেন এই ঔষধটী পরীক্ষা করিয়া দেখেন। ঔষধের যেরূপ ব্যবস্থা তাহা অতি সহজ; চেষ্টা করিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আম্র অতি উৎকৃষ্ট ফল, যাহাতে এই ফলবৃক্ষ সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়া ফল প্রসবে সমর্থ হয় তদ্‌পক্ষে সকলেরই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

আম্র গাছে পোকা লাগা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব বসু আমাদিগকে আর একটী ঔষধের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার যে সকল উৎকৃষ্ট আম্রের গাছ আছে, তন্মধ্যে একটী গাছে পোকা লাগিয়া অল্পদিনের মধ্যে গাছটী মারিয়া ফেলে। অসময়ে বৃক্ষটী নষ্ট হওয়ায় আমি বিশেষরূপ দুঃখিত হই এবং তদবধি আম্র গাছের ঐ পোকা নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার ঔষধ অনুসন্ধান করি। এই ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পরে দেখি আর একটী গাছে ঐ প্রকার কীট লাগিয়াছে। কীটে গাছের কিয়দংশ কুরিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে এবং ঐ ক্ষত স্থান হইতে এক প্রকার আঠা নির্গত হইতেছে। গাছের অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং সর্ব্বদা ভাবিতে লাগিলাম কি প্রকারে ঐ গাছটী রক্ষা করি। অনন্তর এক খানি ছুরী দ্বারা গাছের ক্ষত অংশ উত্তম করিয়া চাঁচিয়া পরিষ্কার করিলাম। ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে আলকাতরা লাগাইয়া দিলাম। কিছু দিন পরে দেখি ঐ সকল পোকা আর নাই এবং গাছেও আর আঠা পড়িতেছে না। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ গেল না, আশঙ্কা বশতঃ পুনর্ব্বার উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় আলকাতরা লেপিয়া দিলাম। দ্বিতীয়বার আলকাতরা দেওয়ার পর কীটের আর কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। বৃক্ষ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। এবং সেই গাছে প্রচুর আম্র ফলিয়াছে। এই সকল আম্রের আস্বাদনের কোন রূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। আমার এই বিশেষ অনুরোধ যাঁহাদিগের আম্র গাছে ঐ রূপ পোকা লাগিয়াছে, তাঁহারা যেন একবার ক্ষত স্থানে আলকাতরা দিয়া চেষ্টা দেখিবেন, এই ঔষধটী কতদূর উপকারী।"

আম্রে পোকা নিবারণ অপেক্ষা গাছে পোকা লাগা নিবারণ করা সহজ। গাছ সম্বন্ধে একটী নিয়ম জানা আবশ্যক, যে কোন ডালে পোকা ধরে,

সেই ডালটী কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। পোকা ধরা ডাল বাগানে কিম্বা কোন গাছের গোড়ায় রাখিলে ঐ পোকা পুনর্ব্বার অন্য গাছে ধরিতে পারে। আর্দ্র স্থানে গাছ রোপিত হইলে, কিম্বা টাটকা সার গাছের মূল দেশে দিলে পোকা হইবার সম্ভব। অতএব গাছে যাহাতে উত্তমরূপে রৌদ্র ও বাতাস লাগিতে পায় তাহার উপায় ব্যবস্থা করা উচিত। বড় গাছে পোকা লাগিলে তত অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু চারা গাছে পোকা লাগিলে গাছের প্রভূত অনিষ্ট করিয়া থাকে। যে চারায় পোকা ধরে, সেই গাছ স্বাভাবিক নিয়মে বৃদ্ধি হইতে পারে না। যে কোন গাছ স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্দ্ধিত না হইলে আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় না।

গাছের পোকা অপেক্ষা আম্রের পোকা নিবারণ যে অত্যন্ত কঠিন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আম্রে আবার দুই প্রকার পোকা লাগিয়া থাকে। এক প্রকার শাদা শাদা সোরু লম্বাকৃতি অন্য প্রকার কালবর্ণের। শাদা পোকা প্রায় আম্রের ভাল অবস্থায় হয় না। আম্র পচিলে অথবা গাছে থাকিবার অবস্থায় কোন প্রকার আঘাত লাগিলে ফলে পোকা ধরিয়া থাকে। এই প্রকার পোকা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। দ্বিতীয় প্রকার কাল বর্ণের পোকা আম্রের ভাল অবস্থায় লাগিয়া থাকে। আম্রের কোন্ অবস্থা হইতে যে ইহার সঞ্চার হয় তাহা নিরূপণ করা বড় কঠিন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, আম্রের মুকুলাবস্থায় পোকা জন্মিয়া থাকে এবং আম্র যেমন বাড়িতে থাকে উহাও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এই পোকা আঁটির মধ্যে জন্মে না, উহার উপরে হইয়া থাকে। আম্র দেখিয়া তাহার মধ্যে পোকা আছে কি না তাহা বলা যায় না। পোকা দ্বারা ফলের বাহ্য চেহারা কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না। ফলের মধ্যে আবার পোকা থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। আঁটির উপর উভয় পৃষ্ঠে পোকা জন্মিয়া থাকে, পার্শ্বে জন্মে না। পোকা সম্পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হইলে কখন কখন দেখা যায় আম্রের কোন স্থান ছিদ্র করিয়া উহা বাহির হইয়া গিয়াছে। গুটি পোকা যেরূপ ছিদ্র করিয়া উড়িয়া যায়, এই পোকাও সেই রূপ উড়িয়া যাইতে পারে। পোকা সম্পূর্ণ পরিবর্দ্ধিত না হইলে উড়িয়া যাইতে পারে না।

আম্রে এই কীট হওয়াতে অনেক স্থানের আম্র অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে এই পোকা দেখা যাইত না এক্ষণে সেই সকল স্থানে উহা দেখা যাইতেছে। যে নিয়মে এই পোকার বংশ বৃদ্ধি হইতেছে, সেই নিয়মে যদি বৃদ্ধি হয়, তবে অল্প দিনের মধ্যে অনেক স্থানের আম্র অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আম্রের মুকুলিতাবস্থায় মুকুলে ধূমা লাগাইলে উহা বিনষ্ট হইতে পারে। ফলতঃ কোন্ প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে যে উহা নিবারিত হইতে পারে তাহা এপর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই। যদি কেহ ইহার উপযুক্ত ঔষধ প্রকাশ করিতে পারেন, তবে একটী মহৎ উপকার সাধিত হইবে।

বাতাবী লেবুর কলম।

—ঃঃ০ঃঃ—

বাতাবী লেবু এদেশীয় ফল নহে; উহা বটেবিয়া হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। এক্ষণে দেশ মধ্যে যেরূপ উহার বৃদ্ধি হইয়াছে, তদ্বারা অনেকেরই বিশ্বাস বাতাবী দেশীয় ফল।

বীজ ও কলম দুই প্রকার নিয়মে বাতাবী লেবুর চারা উৎপন্ন হয়। বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারায় শীঘ্র ফল ফলিয়া থাকে, এবং মূল গাছের অনুরূপ ফলের গুণ হইতে দেখা যায়। বীজের চারা অন্তত ৬। ৭ বৎসরের কমে ফল ধরে না। কিন্তু কলমের চারায় দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফল হইয়া থাকে। এ জন্য শীঘ্র ফল ভোগের নিমিত্ত কলমের চারাই উৎকৃষ্ট। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে, সকল কলমের চারায় শীঘ্র ফল হয় না। ডাল নির্ব্বাচন জন্য অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অনেক কলমের গাছেও ফল ধরিতে অধিক দিন বিলম্ব হয়। যে কোন ফল বৃক্ষের কলম করিতে হইলে অগ্রে শাখার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিতে হইলে যেমন বীজের গুণাগুণের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়, অর্থাৎ বীজ পরিপুষ্ট এবং তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে কি না

তাহা যেমন দেখা আবশ্যক, সেইরূপ যে কোন গাছের ডালে কলম বাঁধিতে হইলে দেখা উচিত কোন্ প্রকার শাখায় কলম বাঁধিলে শীঘ্র ফল উৎপন্ন হইতে পারে। যে সকল শাখা নীচের দিকে মুখ করিয়া লম্বিত থাকে, সেই সকল শাখায় কলম বাঁধিলে প্রায়ই ফল ধরে না। যদিও কোন কোন গাছে ফল ধরিয়া থাকে তাহাও অধিক দিন বিলম্বে ফলিতে দেখা যায়। যেমন সকল বীজে অঙ্কুরজননশক্তি থাকে না সেইরূপ অনেক শাখারও ফলোৎপাদিকা শক্তি দেখা যায় না। গাছের যে সকল শাখা সরল ভাবে উপরের দিকে মুখ করিয়া উঠে এবং দেখিতে উত্তম তেজাল থাকে, সেইরূপ ডাল কলম বাঁধিবার পক্ষে প্রশস্ত। ফলতঃ কলমের উপর যখন ফলাফল সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তখন ফলোৎপাদক শাখা নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে কলম বাঁধা একান্ত আবশ্যক।

ভিন্ন ভিন্ন ফল বৃক্ষের কলম বাঁধিবার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপিত আছে। সেই সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কলম বাঁধিলে শীঘ্রই ফল ভোগ করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে কলমাদি বাঁধিবার পক্ষে কোন রূপ বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় না। বাজারে যে সকল চারা বিক্রয় হইয়া থাকে, মালিরা তাহার প্রতি কোন রূপ মনোযোগ করে না। তাহারা গাছের যে কোন ডাল হউক না কেন তাহাতেই কলম বাঁধিয়া থাকে। এবং ক্রেতাগণও সেই সকল চারা খরিদ করিয়া প্রতারিত হয়েন। এই দোষ নিবারণ করিতে হইলে স্বয়ং দেখিয়া কলম বাঁধা উচিত। পল্লীগ্রামে ভালরূপ মালী পাওয়া যায় না এবং অনেকেই কলম বাঁধিতে অনভিজ্ঞ। এই সকল কারণে দেশ মধ্যে কলমের চারার সংখ্যা অল্প। আমরা আশা করি আমাদের পাঠকগণ কৃষিতত্ত্বের লিখিত প্রণালী অনুসারে কলম বাঁধিবার উপায় শিখিয়া চারা উৎপাদন করতঃ ফল ভোগ করিয়া সুখী হইবেন। বাড়ীর গাছে সুখাদ্য ফল ফলিলে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি আছে?

যে সকল গাছের লেবু আকারে বড় এবং সুখাদ্য সেই সকল গাছে কলম বাঁধিতে হয়। সকল গাছের লেবুর আকার ও অস্বাদন সমান নহে। কোন কোন গাছের লেবু অত্যন্ত সুখাদ্য। উৎকৃষ্ট বাতাবী লেবু অম্লমধুরতারবিশিষ্ট। সকল লেবুর এক রূপ বর্ণ নহে, কোন কোন জাতীয়

বাতাবীর মধ্যভাগ উজ্জ্বল লাল ও কোন কোন জাতীয় লেবুর মধ্যদেশ আবার শাদা দেখিতে পাওয়া যায়।

বীজ হইতে লেবুর চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, সুপক্ক বীজ কোন গামলায় কিম্বা টবে পাতো দিতে হয়। মাটিতে বীজ পুঁতিলেও কোন বিশেষ হানি হয় না।

বীজ ফাক ফাক করিয়া রোপণ করা ভাল। কারণ উহা ঘন রোপিত হইলে, চারা সকল পাতায় পাতায় ঠেকাঠেকি হওয়াতে উহাদের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভব। বীজ রোপণের পর যদি বৃষ্টি না হয় তবে মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার অবস্থা বুঝিয়া অল্প অল্প জল দেওয়া উচিত। এই রূপ অবস্থায় থাকিলে শীঘ্রই বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারা বাড়িতে আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিস্কার রাখিতে হয়। চারার অবস্থায় পশ্বাদিতে পাতা খাইলে গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত জন্মে। এ জন্য উহা উত্তম রূপে ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। ভূমি অপেক্ষা টবে বীজ রোপণ করিলে তাহার কোন অনিষ্ট হইতে পারে না। মাটিতে নানা প্রকার শত্রু আছে অর্থাৎ ভূমিতে পিপীলিকা, রুই এবং কেঁচো প্রভৃতি নানা প্রকার উৎপাতে হয় বীজ কিম্বা চারা নষ্ট করিতে পারে। কিন্তু টবে উহা রোপিত হইলে আবশ্যকমত স্থানান্তরে সরাইয়া ঐ সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়। পাতো দেওয়া চারা বড় হইলে উহা তুলিয়া নিয়মিত স্থানে স্থায়ীরূপে রোপণ করা উচিত। গাছের বিশেষ কোনরূপ পাইট করিতে হয় হয় না তবে বৎসরান্তে কার্ত্তিক মাসে অন্যান্য বৃক্ষের যেমন গোড়া খুঁড়িয়া সার দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয় ইহার সম্বন্ধেও সেই রূপ নিয়ম।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কলম বাঁধিতে হইলে অগ্রে ডাল মনোনীত করিতে হয়। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস কলম বাঁধিবার পক্ষে প্রশস্ত সময়। বাতাবী লেবুর কেবল গুলও জোড় কেলম হইয়া থাকে। নিচু, বকফুল প্রভৃতির কলম বাঁধিলে যেমন শীঘ্র শিকড় বাহির হইয়া থাকে, বাতাবী লেবুর কলমে যেরূপ শীঘ্র শিকড় নির্গত হয় না। শিকড় নির্গত হইতে বিলম্ব হইলে ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। অন্যূন তিন মাসে কলম

প্রস্তুত হইয়া থাকে,। গাছের সরল ঊর্দ্ধমুখ শাখা যে কলমের পক্ষে ভাল তাহা জানা আবশ্যক। ঐ রূপ ডাল ঠিক করিয়া তাহাতে কলম বাঁধিতে হয়। অত্যন্ত পাকা কিম্বা নিতান্ত কোচি ডালে কলম না বাঁধিয়া উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী সময় কলম বাঁধিলে সে চারা প্রায়ই মরে না। গাছের কোন কোন ডালে কলম বাঁধিলে শীঘ্র শিকড় নির্গত হয় আবার কোন কোন ডালে কলম বাঁধিলে শিকড় হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। কঠিন ডালে কলম বাঁধিলে, তাহা হইতে শিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে কিন্তু কোচি ডালে কলম বাঁধিলে তাহা শীঘ্র লাগিয়া যায়। কোচি ডালের কলমের এই দোষ যে অধিকাংশ চারা মরিয়া যায়। কঠিন ডালে সেরূপ হয় না। এ জন্য নিতান্ত কঠিনও নয় অথচ বড় কোচি নয় এরূপ অবস্থার ডাল ঠিক করিয়া তাহাতে কলম বাঁধিতে হইবে। গাছের যে সকল ডাল দেড় কিম্বা দুই হাত লম্বা সেই সকল ডাল কলম বাঁধার পক্ষে ভাল। ডালের মধ্যস্থলে কলম না বাঁধিয়া যেখান হইতে পত্র বা পত্রসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেঁকড়ী ডাল নির্গত হয় তাহার পাঁচ ছয় আঙুল নীচে যেখানে গাঁইট দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থানে ডালটী বেড়িয়া ছুরী দ্বারা একটী গোল দাগ দিতে হইবে এবং ঐ দাগের তিন চারি অঙ্গুলি নিম্নে ঐ রূপ গোল ভাবে আর একটী দাগ দিতে হইবে। অনন্তর উপর হইতে নীচের দাগ পর্য্যন্ত লম্বালম্বী ভাবে সেই ডালের ছাল চিরিতে হইবে। উহা চিরা হইলে আস্তে আস্তে কাষ্ঠাংশ হইতে তুলিতে হইবে, তুলিবার সময় এরূপ সাবধান হইতে হইবে ছালের সঙ্গে যেন কাটের গা হইতে সোরু সোঁরু আঁশ উঠিয়া না যায়; কারণ ঐ সকল আঁশ তুলিয়া ফেলিলে ডালে রস সঞ্চার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। রস সঞ্চারে ব্যাঘাত হইলে ডাল শুষ্ক হইবে এবং কলম লাগিবে না। এ জন্য ছাল তুলিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হয়।

(ক্রমশ।)

হার্টস্-ইজ্ পুষ্প।

(HEARTS EASE.)

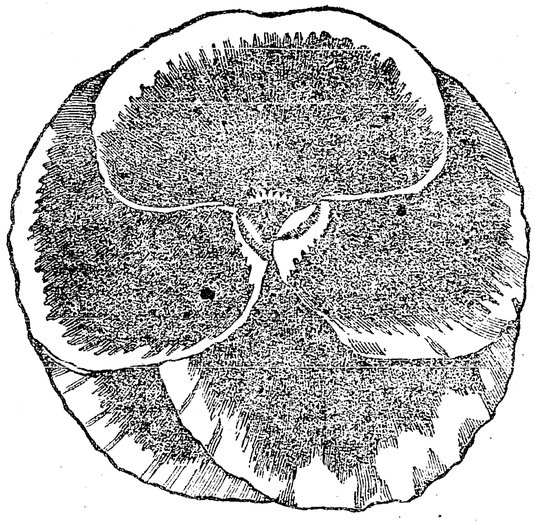

হার্টস্—ইজ্ পুষ্প দেখিলে হৃদয়ের অত্যন্ত তৃপ্তি হয় এ জন্য হার হার্টস—ইজ নাম হইয়াছে। নতুবা উহার আরও কয়েকটী নাম আছে যথা;—প্যানসি, ভায়োলা, ট্রাইকলার।

হার্টস্-ইজ্ ইহাকে সচরাচর হার্টস্-সিস্ ও বলিয়া থাকে। এই পুষ্প শীত কালে ফুটিয়া থাকে। ইহাও এক প্রকার ঋতু পুষ্প মধ্যে পরিগণিত। এই ফুলের যে কি চমৎকার সৌন্দর্য্য তাহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কাহাকেও লিখিয়া বুঝান যায় না। পুষ্পেতে ঈশ্বরের যে কি অত্যাশ্চার্য্য মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে তাহা হার্টস্—ইজ্ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এমন মনুষ্য নাই যিনি ইহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হয়েন। অশেষ সৌন্দর্য্যের আধার জগদীশ্বর পুষ্পে সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতে ত্রুটি প্রকাশ

করেন নাই। এক একটী পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখিলেই তাঁহাকে মনে হয়। পূর্ব্বকালে এই ফুল এদেশে ছিল না। ইউরোপীয়দিগের আগমন হইতে দেশ মধ্যে হার্টস্—ইজ্ আনীত হইতেছে। হার্টস্ ইজ শীতল দেশের পুষ্প সুতরাং আমাদের দেশে শীতকালে হইয়া থাকে। হার্টসিসের কোনরূপ গন্ধ নাই, সৌন্দর্য্য জন্য উহা বিখ্যাত। ঋতু পুষ্প বা জেড়ুয়া ফুল নানা জাতীয়, হার্টস্—ইজের মধ্যেও আবার নানা জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক জাতীয় ফুলের সৌন্দর্য্য ও বর্ণ বিভিন্ন প্রকার।

হার্টস্—ইজের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। এ জন্য বিশেষ যত্নসহকারে উহা রোপণ করিতে হয়। একটু যত্ন না করিলে জেড়ুয়া ফুলের চারা করা বড় কঠিন। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সময়ে উহা রোপিত হইয়া থাকে, এদেশে ঠিক সেইরূপ সময়ে রোপণ করিলে চলে না। এদেশে বীজ রোপণের পক্ষে আশ্বিন মাসের শেষ হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগেই উত্তম সময়। বর্ষা থাকিতে উহা রোপণ করা উচিত নহে। বর্ষা শেষ হইয়া শীতের সঞ্চার আরম্ভ হইলে জেড়ুয়া ফুল রোপণ করিলে প্রায়ই বীজ নষ্ট হয় না। জলীয় বাতাস এবং স্যাঁতা স্থান বীজের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী এ জন্য অগ্রে বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। বীজ বাক্সের মধ্যে উত্তম করিয়া কাপড় জড়াইয়া রাখিতে হয়, বর্ষাকালে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেই সে বীজে প্রায়ই গাছ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতির উদ্ভিদাদি ভিন্ন দেশের জল, বায়ু ও উত্তাপে উৎপাদন করিতে হইলে অত্যন্ত যত্ন করিতে হয়। যত্ন শৈথিল্য হইলে উহার উন্নতি হয় না।

হার্টস্—ইজ্ বপন করিতে হইলে অগ্রে মাটি তৈয়ার করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি মাটির দোষে অনেক স্থলে অনেক গাছ নষ্ট হইয়া থাকে। হার্টস্—ইজের মাটি তৈয়ার করিতে হইলে অগ্রে মৃত্তিকা তুলিয়া ঘরের মেজেতে ছড়াইয়া দিতে হয়। এই রূপ ভাবে দুই চারি দিন ছড়াইয়া রাখিলে তাহা এক প্রকার শুষ্ক হইয়া উঠে। রৌদ্রে শুষ্ক করিলে এককালে নীরস হইয়া যায় এজন্য ঐ রূপ করিয়া শুকাতে হয়। অনন্তর উহা শুষ্ক হইলে অল্প জল দ্বারা মুড়কি মাখার ন্যায় রসাল করিতে হয়, মুড়কি মাখার ন্যায় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উহা যেন একেবারে কাদা কিম্বা শুকনা না

হয়। এই রূপ মাটি প্রস্তুত হইলে, তদ্বারা টবের তিন ভাগ পূর্ণ করতঃ সিকি ভাগ খালি রাখিতে হয়। পরে অপর শুষ্ক মাটি অর্থাৎ যাহার কতকাংশে জল মিশাইয়া টব ভর্ত্তি করা হইয়াছে, ঐ মাটিতে জল মিশ্রিত না করিয়া উত্তমরূপে হাওয়াতে শুষ্ক করিতে হইবে। মাটি শুষ্ক হইলে তাহা যতদূর পারা যায় গুঁড় করিতে হইবে এবং চালনী দ্বারা কিম্বা হাতে করিয়া উত্তমরূপ চালিতে হইবে। এই রূপ ভাবে চালিলে উহা ধূলার ন্যায় হইবে। ঐ চালা মাটির দ্বারা টবের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিতে হইবে। উল্লিখিত নিয়মে টব ভর্ত্তি করিলে নীচের সরস মৃত্তিকার জলীয় ভাগ উপরিকার শুষ্ক মৃত্তিকায় সঞ্চারিত হইয়া বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলে।

অনেকে এরূপ ভাবে মাটি তৈয়ার না করিয়া শুদ্ধ এই মাটিতে টব ভর্ত্তি করিয়া বীজ বপন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মাটি শুষ্ক করিয়া লইলে উহার ঝাঁজ বা তেল নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং বীজের কোন অনিষ্ট হয় না। অনেক সময় দেখা যায় মাটির ঐ রূপ তেজ বশতঃ বীজ নষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং চারা বাহির হয় না। টবে গুঁড় মাটি দিয়া তাহার উপর আস্তে আস্তে বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ ছড়াইবার সময় উহা যেন এক স্থানে জমা হইয়া না থাকে, চারি দিকে পাতলা করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ বপনের পর পুনর্ব্বার গুড়া মাটি অল্প অল্প করিয়া তাহার উপর ছড়াইয়া হাতে করিয়া আস্তে আস্তে চাপিয়া দিতে হয়। এই রূপ নিয়মে বীজ বুনা শেষ হইলে টব বারাণ্ডায় রাখিতে হয়। দিবসে উহা বারাণ্ডায় এবং রাত্রিকালে বাহিরে শিশিরে রাখিবার ব্যবস্থা করা উচিত। টব শিশিরে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যদি বৃষ্টি হয় তবে জলে সমুদায় চারা একেবারে মরিয়া যাইবে। বৃষ্টির জল, বীজ কিম্বা চারার খুব ছোট অবস্থায় যার পর নাই অপকারী। এ জন্য বৃষ্টির সময় উহা ঘরে তুলিয়া রাখিতে হয়। টবের অবস্থা বুঝিয়া জল দিলে চলিতে পারে। জল দেওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত দিতে হয়। একেবারে অধিক জল ঢালিয়া দিলে বীজ সমূহ অধিক মাটির নীচে কিম্বা স্থানান্তরে সরিয়া গিয়া একত্রিত হইতে পারে। আবার চারার অবস্থায় জোরে জল পড়িলে উহা হেলিয়া কিম্বা উপড়িয়া যাইতে পারে। এ জন্য হাতে

করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে জল দিলে চলিতে পারে। যদি চারার শিকড় বাহির হইয়া পড়ে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক গুঁড় মাটি অল্প অল্প করিয়া ছড়াইয়া দিলে উহা ঢাকিয়া যাইবে। হার্টস্-ইজের বীজ তিন চারি দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। টবে চারা তিন চারি পাতা বাহির হইলে তখন তাহা তুলিয়া অন্য টবে দুই একটী করিয়া চারা রোপণ করিয়া দিতে হয়। চারা যত বড় ও তেজস্কর হইতে থাকিবে সেই হিসাবে তাহা রৌদ্রে রাখিয়া তাপ সহ্য করাইতে হইবে, নতুবা প্রথম অবস্থায় রৌদ্রে রাখিলে উহা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইবে। টবের মাটি অধিক শুষ্ক হইতে দেওয়া উচিত নহে। উহা শুকাইবার উপক্রম হইলেই জল দিয়া নরম রাখিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে মাটি খুসিয়া দিতে হয়, কারণ গোড়া আলগা হইলে শিকড় সমূহ সহজেই চারি দিকে বিস্তারিত হইতে পারে। জেড়ুয়া ফুল মাত্রেরই শিকড় অতিশয় কোমল সুতরাং উহা কঠিন মৃত্তিকার মধ্যে গমন করিতে সমর্থ হয় না। গাছ যখন বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখা যায় তখন উহা রৌদ্রে রাখিলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। শীত কালে সকাল বেলা এই ফুলের অত্যন্ত বাহার হয়। যে সময় নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া টব আলো করিয়া থাকে, সে সময় তহো দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ জন্মে। হার্টস্-ইজের যে পরিমাণ আকার হইয়া থাকে, এই প্রস্তাবের শিরোভাগে তাহার চিত্র প্রদর্শিত হইল।

আমরা পাঠকবর্গকে ফুলের আয়তন আঁকিয়া দেখাইতে পারিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উহার যে আনন্দজনক সৌন্দর্য্য তাহা দেখাইতে সমর্থ হইলাম না।

এদেশে হাটস্-ইজের বীজ হয় না। যদিও বা দুই একটা গাছে বীজ দেখিতে পাপয়া যায় কিন্তু তদ্বারা ভাল রূপ ফুল হয় না। এ জন্য প্রতি বৎসর ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে উহার বীজ এদেশে আনীত হইয়া থাকে। সমস্ত শীতকাল ফুল ফুটিয়া থাকে এবং ফাল্গুণ চৈত্র মাসে রৌদ্র প্রবল হইলে উহা মরিয়া যায়।

বাতাবী লেবুর কলম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ১৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

ছাল তুলিবার পূর্ব্বে মাটি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। মাটির দোষেও আবার অনেক স্থলে কলম নষ্ট হইয়া থাকে। দো-আঁশ মাটিতেই কলম ভাল হয়। যে মাটি দ্বারা কলম বাঁধিতে হয় কেহ২ তাহাতে খৈলের সার দিয়া থাকেন। সার না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সার দিলে যদিও মাটির তেজ বৃদ্ধি হয় কিন্তু তাহার একটী দোষ আছে, অনেকে তাহা লক্ষ্য করেন না। উক্ত প্রকার সার মাটি দ্বারা কলম বাঁধিলে যদি বৃষ্টি হইতে বিলম্ব হয়, এবং নিয়মিত রূপে কলমে জল দেওয়া না যায়, তবে উক্ত মৃত্তিকা অত্যন্ত কঠিন হইয়া এরূপ ভাবে আঁটিয়া ধরে যে শিকড় সমূহ বাড়িতে পারে না ও শীঘ্র মরিয়া যায়। এজন্য সার দেওয়া মাটিতে কলম বাঁধিলে সর্ব্বদা তাহাতে জলের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। জল পাইলে তদ্বারা সম্পূর্ণ উপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু সার না দিয়া কেবল মাত্র দো-আঁশ মাটিতে কলম বাঁধিলে দুই এক দিন জল দিতে বিলম্ব হইলে কোন ক্ষতি হয় না। অতএব যেখানে জল দেওয়া গোলযোগ ঘটিবার সম্ভব সে স্থলে কেবল মাত্র মৃত্তিকা দ্বারা কলম বাঁধিলে চলিতে পারে। মাটি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা যেন অত্যন্ত কঠিন না হয় এবং নিতান্ত তরল না থাকে। এই রূপ অবস্থাপন্ন মৃত্তিকা দ্বারা একটী দলা প্রস্তুত করিতে হয়। এই দলাটীর পরিমাণ এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, তদ্বারা ঐ ছাল তুলা স্থানটী ঢাকিয়া যাইতে পারে। ডাল হইতে ছাল তুলিলে সেই স্থানে এক প্রকার রস নিঃসৃত হইতে থাকে। অনন্তর উক্ত দলাটী ভাঙ্গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ দুই হাতে দুই দলা লইয়া এককালে ছাল তুলা স্থানে চাপিয়া দিতে হইবে। মাটি এরূপ হিসাবে দিতে হইবে যেন কাটের গা হইতে রস নষ্ট হইতে না

পারে। মাটি চাপিয়া দেওয়ার পর বেশ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া ডাল ও মাটির যোগ মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই রূপ ভাবে আঁটিয়া দেওয়া হইলে চট বা নারিকেল ছোবড়া দ্বারা ঐ মৃত্তিকা উত্তম করিয়া জড়াইয়া বাঁধিতে হইবে। চট অপেক্ষা নারিকেল ছোবড়া দ্বারা বাঁধা ভাল; কারণ কলম কাটিয়া চারা রোপণের সময় ঐ চট বা ছোবড়া খুলিয়া ফেলিতে হইবে। চটে একটী অসুবিধা এই উহা খুলিবার সময় ডালের কোমল শিকড় সকল ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। শিকড় ছিঁড়িলে চারা মরিয়া যাইবার সম্ভব। কিন্তু নারিকেল ছোবড়া দ্বারা জড়াইলে উহা খুলিবার সময় আস্তে আস্তে ছোবড়া সরাইয়া লইতে গেলে শিকড় প্রায় ছিঁড়ে না। এজন্য ছোবড়া দ্বারা জড়ানই ভাল। অনন্তর ছোবড়া বা চট দ্বারা উহা জড়াইয়া দড়ী দিয়া আস্তে আস্তে বাঁধিতে হইবে। এই বন্ধন যেন অধিক কসিয়া বাঁধা না হয়। কারণ কসিয়া বাঁধিলে বন্ধন সময়ে মাটি সরিয়া যাইতে পারে এবং সেই সঙ্গে ডালের রস নষ্ট হইবার সম্ভব। কাষ্টের ঐ রস কলমের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। চট বা ছোবড়া বাঁধা হইলে ঐ মৃত্তিকা সরস রাখিবার জন্য সর্ব্বদা উহাতে জল দিতে হয়। যদি কলম বাঁধার পর সুবৃষ্টি হয়, তবে জল না দিলেও তত হানি হয় না। ডালে জল দিতে হইলে তাহার উপর আন্দাজ এক হাত উচ্চ একটী ভাঁড় কিম্বা অন্য কোন জলপাত্র ঝুলাইয়া রাখিতে হয় এবং তাহার তলায় ছিদ্র করিয়া ঐ পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ ভাবে জল দিলে ফোটা ফোটা করিয়া জলবিন্দু সকল কলম বাঁধা স্থানে পড়িতে থাকে। জল পাইলে শীঘ্রই শিকড় নির্গত হয়।

কলম বাঁধা স্থান হইতে প্রথমে শিকড় সকল ছোবড়া বা চট ভেদ করিয়া বাহির হয়, অধিক রৌদ্র লাগিলে সে গুলি শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু জড়িত স্থানের মধ্যে তাহার যে অংশ থাকে তাহা প্রায় নষ্ট হয় না। পুনরায় জল পাইলে আবার ঐরূপ শিকড় নির্গত হইয়া থাকে। প্রথম বারে যে শিকড় বাহির হয়, তাহা দেখিয়া কলম কাটা উচিত নহে। কারণ এই অবস্থায় শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে অনেক চারা প্রায় মরিয়া যায়। প্রথম বার অপেক্ষা দ্বিতীয় বার যখন শিকড় দেখা যায়, তখন শাখা কাটিয়া

ভূমিতে রোপণ করিলে অল্প সংখ্যকই মরিয়া থাকে কিন্তু তৃতীয় বার যে সকল শিকড় বাহির হয় সেই সময় শাখা কাটিয়া রোপণ করিলে প্রায়ই মরে না। কলম বাঁধা শাখা কাটিয়া প্রথমে হাপোরে রোপণ করিতে হয়। হাপোর একটু ঠাণ্ডাস্থানে করা আবশ্যক, কারণ এই অবস্থায় প্রথম রৌদ্র পাইলে চারা মরিয়া যায়। এজন্য যে স্থানে অধিক রৌদ্র না লাগে এরূপ স্থানে হাপোর প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। হাপোরে ফাক ফাক করিয়া চারা পুঁতিতে হয়। হাপোরে গাছ ঘন করিয়া রোপণ করিলে উহা তুলিবার সময় অন্যান্য চারার শিকড় কাটিয়া যাইতে পারে। হাপোরে মাটির অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদা জল দিতে হয়। মাটি অধিক শুষ্ক কিম্বা চির ধরিতে দেওয়া উচিত নহে। মধ্যে মধ্যে চারার গোড়া খুসিয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। এস্থলে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, কলম হাপোরে পুঁতিবার সময় যে চট বা ছোবড়া জড়ান থাকে তাহা অতি সাবধানে খুলিয়া দিতে হয়। এই সময় চারার অতি শৈশবাবস্থা সুতরাং শিকড়াদি ছিঁড়িয়া গেলে উহা মরিবার সম্ভব। প্রথমে কলম কাটিয়া হাপোরে পুঁতিবার সময় অনেক চারা ঝিম ধরা মত হয় অর্থাৎ পাতাসমূহ শুষ্ক প্রায় এবং দেখিলে বোধ হয় যেন মরিয়া যাইতেছে। এই অবস্থা হইতে রক্ষা পাইলে চারা প্রায় মরে না। কলম বাঁধার পর প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় বার শিকড় নির্গত হইলে সেই অবস্থায় শাখা কাটিয়া পুঁতিলে ঐরূপ অবস্থা হয়। হাপোরে চারা কিছু দিন থাকিলে উহার তেজ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হাপোরে এক বৎসর চারা রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না। হাপোর হইতে চারা তুলিয়া বাগানে বা যেখানে স্থায়ীরূপে পুঁতিতে হইবে সেখানে রোপণ করা আবশ্যক।

মাটির দোষেও অনেক ভাল লেবু মন্দ হইতে দেখা যায়। সকল প্রকার মাটি সকল প্রকার গাছ গাছড়ার পক্ষে ভাল নহে। মৃত্তিকার দোষগুণে ফলের আস্বাদনের অনেকটা তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য মৃত্তিকা নির্ব্বাচন করিয়া লেবুর চারা রোপণ করিলে আস্বাদনের এবং আকারের কোন বলক্ষণ্য হয় না। এঁটেল ও দো-আঁশ মৃত্তিকাতে লেবু ভাল হইয়া থাকে। বেলে মাটিতে গাছ হইলে রসের ভাগ অল্প হয়। বীজের গাছ অপেক্ষা কলমের গাছে যে শীঘ্র লেবু ফলিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত

হইয়াছে। ফাল্গুণ মাসে বাতাবী লেবুর ফুল হইতে থাকে। যে সময় গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে, সে সময় সে স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ হয়। লেবুর ফুলের মনমুগ্ধকর গন্ধ। এই গন্ধে এত আনন্দ জন্মে যে গাছে ফল না ফলিলেও কেবল মাত্র সৌরভ ভোগ করিয়াই বৃক্ষ রোপণাদির ক্লেশ নিবারিত হইয়া থাকে। বাতাবী লেবু যে কেবল মুখ-প্রিয় সুখাদ্য ফল তাহা নহে, উহার গুণও বিস্তর। অনেক স্থলে উহা ঔষধের কার্য্য করে। গৃহস্থদিগের বাড়ীতে দুই একটী গাছ থাকিলে অনায়াসেই ফল ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারা যায়। এমন সুখাদ্য ফল কেবল মাত্র যদি ঔদাস্য করিয়া বাড়ীতে রোপণ করিতে পারা না যায়, তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? এই গাছ করিতে বিশেষ কোন রূপ পরিশ্রম, কিম্বা ব্যয় অথবা পাইট করিতে হয় না। বাঙ্গালা-দেশের প্রায় সকল জেলাতেই বাতাবী লেবু হইয়া থাকে। কোন গাছে বৎসরের মধ্যে দুইবার লেবু ফলিতে দেখা যায় কিন্তু সাধারণত বৎসরের মধ্যে এক বার মাত্র ফলিয়া থাকে।

যাঁহারা গুল কলম বাঁধিতে অসুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা যোড় কলম দ্বারা চারা তৈয়ার করিতে পারেন। সেটে বা তরল বাজ নামে এক প্রকার লেবু আছে, সেই লেবুর চারার সহিত বাতাবীর ডালে যোড় কলম বাঁধিলে সহজেই কলমের গাছ হইয়া থাকে। আম্রের যোড় কলম যে নিয়মে বাঁধিতে হয়, ইহারও যোড় বাঁধিবার সেই নিয়ম।

ভারতবাসীর দরিদ্রতা।

ভারত ভূমি স্বর্ণ প্রসূ; যথেচ্ছা বীজ নিক্ষেপ কর, চাষ করিও না, সলিল সিঞ্চন করিও না, তথাপি ভারতের উর্ব্বর ক্ষেত্র শস্য পূর্ণ হইবে। তবে আমরা এত দরিদ্র কেন? আমাদের অন্ন যোটে না কেন? যে কোন বিদেশী ভারত-ভূমি স্পর্শ করে, সে দরিদ্র হইলেও ধনেশ্বর হয়। তবে আমরা কেন মুখে অন্ন, গাত্রে বস্ত্র প্রদান করিতে পারি না? কে এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবে? আমরা পরাধীন জাতি বলিয়াই কি অমাদের এত দরিদ্রতা? আমরা উষ্ণদেশবাসী, অলস প্রকৃতি, প্রেমাশক্ত তাই কি এত নিরন্নতা? রাজনৈতিক পরাধীনতা ও শরীর গত অলসতা অথবা কার্য্য-বিমুখতা যে অংশতঃ এই ভীষণ দারিদ্রের কারণ এ কথা কেনা স্বীকার করিবেন? অন্যান্য অনেক কারণ সত্ত্বেও যে দেশীয়দিগের কৃষি * বাণিজ্য এবং শিল্প প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে হতাদর, ইহাও একটী প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভারত বহুশত বৎসর বিদেশীয় রাজগণের শাসনা-ধীনে প্রপীড়িত হইয়া, অসার ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারত-মাতার সন্তানগণের সে স্বাধীনতা, সে বল বিক্রম আর কিছুই নাই। যে ভারত সন্তান এক সময়ে কি বল বিক্রমে, কি যুদ্ধকৌশলে, কি বাণিজ্য ব্যবসায়ে, কি শিল্প-কার্য্যে, কি কৃষিবিদ্যায় সকল বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন; সেই ভারত সন্তান আজ কিনা বিদেশীয়গণের পদলেহনকে আপনা-দের সারব্রত ও কর্ত্তব্য কার্য্য মনে করিয়া, তৎপ্রাপ্তির জন্য লালায়িত হইয়াছেন! যে ভারত জননী এক দিন অন্যান্য অনেক দেশের কত্র হইয়া. কতই না গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভারতমাতা আজ কিনা অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধা, অন্নের জন্য লালায়িতা, ও পথের ভিখারিণী হইয়া

---

* কৃষিতত্ত্ব কৃষিকার্য্যের আলোচ্য বিষয় বলিয়া শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধে অধিক কথা না লিখিয়া, আমরা এই প্রস্তাবে অধিক পরিমাণে কৃষি কার্য্যের উপকারিতা দর্শাইতে থাকিব।

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন! ভারত মাতার ক্রন্দন শুনিয়াও যে তাঁহার সন্তানগণের চৈতন্য হইতেছে না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

সাত আট শত বৎসর কাল আমরা বিদেশীয় রাজগণের আধীন থাকায় আমাদের স্বাধীন প্রবৃত্তি গুলি অন্তঃকরণ হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমাদের আর স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়া পড়ি। এক্ষণে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অধিক পরিমাণে অর্থের আবশ্যক করে, এ কারণ বাণিজ্য ব্যবসা ধনীদিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়াই সম্ভবপর। কিন্তু কৃষিকার্য্যের জন্য প্রথমতঃ তাদৃশ মূল ধনের আবশ্যক করে না। অল্প মূল ধনেই কৃষি কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। কৃষি কার্য্যের দ্বারা ক্রমশঃ যত লাভ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত মূলধন বৃদ্ধি করিয়া, কৃষিকার্য্যের বিস্তার করা যাইতে পারে।

কৃষিই জগতের উন্নতির মূল। কৃষি ব্যতীত কি বাণিজ্য কি শিল্প কিছুই সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেক সভ্য দেশেই প্রভূত পরিমাণে কৃষির উন্নতি হইতেছে। কৃষি ব্যতীত কখন কোন দেশ উন্নতি সোপানে উত্থিত হইতে পারে না;—ইতিহাস তাহা স্পষ্টাক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অসভ্যাবস্থায় সকল দেশেই মৃগয়ালব্ধ আম মাংস ভক্ষণ, তদ্‌পরে পশুপালন দ্বারা আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ হইত; পরে দেশ যত সভ্য পদবীতে উত্থিত হইতে আরম্ভ হয়, ততই কৃষি, বাণিজ্য, এবং শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি সোপানে আরোহণ করে। চাকরী দ্বারা কখন কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে না;—প্রত্যেক সভ্য দেশের ইতিহাসই তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় লোকের চাকরীর প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও যত্ন এবং কৃষি ও বাণিজ্য এবং শিল্প প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ে যে প্রকার অশ্রদ্ধা লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেশের উন্নতি নিতান্ত সুদূরপরাহত। যত দিন না দেশীয় লোকের ঐ সকল স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা না হইবে, তত দিন দেশের এই

ভীষণ দারিদ্রতা কোন ক্রমেই দূরীভূত হইবে না; বরং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমাদের দেশ স্বভাবতঃ যেরূপ উর্ব্বরা, তাহাতে অল্পায়াসেই কৃষি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে লাভ করা যাইতে পারে। ভারতের ন্যায় উর্ব্বরা দেশ পৃথিবীতে অতি বিরল। অল্প পরিশ্রমে অল্প ব্যয়ে এ দেশে শস্য জন্মে বলিয়া এদেশীয় লোক এত অলস প্রকৃতি। হলণ্ড প্রভৃতি সমুদ্র গর্ভস্থ দেশে যথায় আবদোপযোগী মৃত্তিকার অভাব, স্কটলণ্ড প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দেশে যথায় বহু পরিশ্রমে অল্প শস্য উৎপন্ন হয়, ঐ সমস্ত দেশবাসীরা স্বাভাবিক পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু। দেশের জল বায়ু ও ভূমির উর্ব্বরতার সহিত দেশীয় লোকের ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধ আছে। যে দেশ অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে শস্য ফল মূল প্রসব করে, সে দেশবাসিগণ স্বভাবতঃ কঠিন পরিশ্রমে বিমুখ ও অধ্যবসায়শূন্য হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল ভূমি পতিত আছে, দেশীয়গণ যদি পরিশ্রমী, কষ্ট সহিষ্ণু হইত, এবং যদি দেশীয়গণের কৃষির প্রতি যত্ন ও ভক্তি থাকিত; তাহা হইলে ঐ সমস্ত ভূমি হইতে প্রচুর পরিমাণে ফল মূল ও শস্যাদি লাভ করা যাইতে পারিত। আসাম প্রদেশ ও ধুলীয়ান অঞ্চলে বড় গঙ্গার সন্নিকট (দেওয়াড়া জমী) যে সকল নূতন পয়স্তী ভূমি আছে, তাহা রীতিমত আবাদ হইলে ও কর্ষিত ভূমি সকল উপযুক্ত মতে আবাদ করিলে, আমাদের দেশের দুঃখ দরিদ্রতা যে অনেক পরিমাণে ন্যূন হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পরিশ্রমের মূল্য এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, আমাদের দেশে দেশীয়দিগের দ্বারা যে সকল ফসল উৎপন্ন হয় তাহাতে খরচ বাদে লাভের ভাগ অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে পূর্ব্ব প্রণালী মতে কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ হইলে লাভের মুখ অতি অল্পই দৃষ্ট হইবে; কারণ আমি চাষ করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিব তাহার অধিকাংশ আবাদ ইত্যাদিতে ব্যয়িত হইয়া যাইবে। আমাদের দেশে ধান্যের চাষ অধিক;—খরচ বাদে ধান্য চাষে লাভ বড় অধিক থাকে না। এরূপ প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে যাহাতে লাভের ভাগ অধিক ও ব্যয়ের ভাগ কম হয়। এক্ষণে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বিজ্ঞানের সাহায্যে অল্প ব্যয়ে অল্প

পরিশ্রমে, কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি কৃষি প্রত্যেক সভ্য জগতেই সুসম্পাদিত হইতেছে। আমাদের দেশীয়দিগের দ্বারা লাভজনক ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি কিছুই সম্পাদিত হয় না; তদ্‌সমস্ত বিদেশীয়গণের এক চেটিয়া বলিলেই হয়। আমাদের দেশে চা, সিনকোনা, নীল প্রভৃতি চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে কিন্তু দেশীয় কয়জন লোক ঐ সকলের চাষ করিয়া থকেন?

ঐ সকলের চাষ প্রায় বিদেশীয়গণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। অনেকে বলিতে পারেন ঐ সকল চাষে অধিক পরিমাণে মূল ধনের আবশ্যক করে অতএব মূলধন পাই কোথায়? আমাদের দেশে কি এমন কোন ধনী নাই যাঁহাদের দ্বারা ঐ সকলের চাষ হইতে পারে? ধনী অনেক আছেন তাঁহাদের সে বিষয়ে চেষ্টা ও যত্ন কৈ? ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কৃষি বিষয়ে অমনোযোগিতাই যে কৃষি জগতের অবনতির প্রধান কারণ, তাহা বোধ হয় অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তাঁহারা কৃষককে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। কৃষি নীচ জনের কার্য্য বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই কুসংস্কারেই দেশের অবনতির একটী প্রধান কারণ। যত দিন না দেশীয় লোকের এই কুসংস্কার অপনীত হয় তত দিন দেশের ধন সঞ্চয় কি উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। যদি দেশীয়গণের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি যত্ন থাকিত তাহা হইলে দেশের এত দুরবস্থা ঘটিত না। দেশীয়গণ হা অন্ন যো অন্ন করিয়া দশ পোনর টাকার দাসত্বের জন্য লালায়িত হইত না। স্বহস্তে হল চালনা করা আমাদের দেশের ভদ্র সমাজে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য বলিয়া অনেকেরই সংস্কার আছে। ভদ্র সমাজস্থ কোন ব্যক্তি স্বহস্তে হল চালনা করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি সমাজচ্যুত, জাতি ভ্রষ্ট এবং সমাজ মধ্যে নিতান্ত ঘৃণিত হইবেন। দেশীয়গণের এই সকল কুসংস্কার অপনীত হইতে এখনও বহু কাল সাপেক্ষ। সমাজস্থ ভদ্র আখ্যাধারী মহাশয়েরা শত শত দুষ্কর্ম্ম করিয়াও সমাজের নেতা হইতেছেন কিন্তু জগতের জীবনোপায় শস্য উৎপাদন জন্য সমাজস্থ কোন ব্যক্তি স্বহস্তে হল চালনা করিলে তিনি সমাজচ্যুত ও জাতি ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন!!

এই সকল নানা কারণে আমাদের দেশে কৃষির এত অবনতি হইয়াছে। কৃষি, বাণিজ্য শিল্প ব্যতীত কখন কোন দেশ উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না। সমস্ত সভ্য দেশেই কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পের বহুল উন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সকল সভ্য দেশেই কৃষকেরা অত্যন্ত সম্মানের পাত্র—ইংলণ্ডের [illegible] পার্লিয়ামেণ্টের অনেক সভ্যই কৃষক। সেখানকার কৃষকেরা দেশীয়দিগের ন্যায় ঘৃণিত চক্ষে দৃষ্ট হন না—বরং সম্মানিত হইয়া থাকেন। আমাদের দেশে যাঁহারা কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা ভদ্র সমাজের নিতান্ত হেয় হইয়া থাকেন। পাঠক! ইংলণ্ড ও আমাদের দেশে কৃষি বিষয়ে কত প্রভেদ এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন।

যাঁহারা বলেন;—কৃষি কার্য্যের দ্বারা কিছু লাভ হয় না, তাঁহাদের কথায় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। এমন কৃষক অনেক আছেন, যাঁহারা কৃষি কার্য্যের দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিয়া, সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন, তাঁহারা চাকরী উপজীবী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে সুখী। উগ্রক্ষত্রিয় সৎগোপ প্রভৃতি কতক গুলি জাতি স্বহস্তে হল চালনাদি দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের এ প্রদেশে দেখান যাইতে পারে। এ প্রদেশের অনেকেই কৃষিজীবী। কৃষি দ্বারা তাঁহাদের সুখে কালাতিপাত হইতেছে। তাঁহারা চাকরী উপজীবীদিদের ন্যায় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কৃষি কার্য্য দ্বারা অঋণী অপ্রবাসী হইয়া, নির্ম্মল আনন্দের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অন্যান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা কৃষকেরাই অধিক সুখী, বলিষ্ট ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। যখন কৃষিই জগতের উন্নতির মূল—কৃষি ব্যতীত যখন শিল্প, কি বাণিজ্য কিছুই সম্পাদিত হয় না, তখন কৃষি বিষয়ে ঔদাসিন্য প্রকাশ করিলে যে আমাদের দরিদ্রতা কখনই দুরীভূত হইবে না, তাহা বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন।

কৃষি কার্য্যের এরূপ লাভ স্বত্বেও আমরা কৃষি বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া যে চাকরীর জন্য লালায়িত হই;—ইহা অপেক্ষা আমাদের মূঢ়তার

বিষয় আর কি হইতে পারে। আমরা ১২০।২৫ টাকার চাকরীর জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, এবং দাসত্ব শৃঙ্খল বহন করি, সেই রূপ পরিশ্রমের সহিত স্বাধীন ভাবে যদি আমরা কৃষি বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহা হইলে চাকরী অপেক্ষা যে অধিক লাভবান হই, এবং আমাদিগকে [illegible] অত [illegible] হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা ভারত গর্ভে নিহিত রত্ন উদ্ধৃত করিতে সক্ষম নহি, কিন্তু দাসত্ব ভার বহন করিতে বিলক্ষণ মজবুত! যত দিন না আমাদের স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না জন্মিবে, তত দিন আমাদের উন্নতি ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত থাকিবে এবং দুঃখ দরিদ্রতাও আমাদিগের কখন দূরীকৃত হইবে না।

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস।

টবে চারা রোপণের নিয়ম।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৯৭ পৃষ্ঠার পর।)

বৎসরান্তে যে, গাছের আকার বড় হইয়া থাকে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। অতএব বৎসরান্তে টবের গাছ যে অপেক্ষাকৃত বড় টবে লাগাইতে হয়, তাহা উদ্যানকারীগণের জানা আবশ্যক। বড় টব যে গাছের পক্ষে অনুকূল তাহা বলা বাহুল্য। বৎসরান্তে টবের মাটি না বদলাইলে, গাছের তেজ হ্রাস হইয়া পাতা সকল কুঁকড়াইয়া যায়। সুতরাং ভালরূপ পাতা ও ফুল হয় না।

গাছের প্রকৃতি অনুসারে টব প্রস্তুত করা উচিত। কারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ গাছের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আকারের টব উপকারী। গাছের প্রকৃতি না-জানিয়া,

কোন গাছ টবে পুঁতা কর্ত্তব্য নহে। অর্থাৎ কোন্ গাছ কত বড় আকারের হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে কি পরিমাণ মাটির আবশ্যক, তাহা অগ্রে অবগত হইয়া টবে রোপণ করিলে ভাল হয়। যে সকল গাছ স্বভাবতঃ বড় আকারের হইয়া থাকে, তদ্সমুদায় টবে রোপণ করিলে, কেবল যে গাছের বৃদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে তা[illegible] গাছ অধিক তেজ করিয়া উঠিবার সময় টব ভাঙ্গিয়া শিকড় সকল বাহিরে আসিয়া পড়ে। ফলতঃ যে কোন গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির রোধ করা উচিত নহে।

কোন্ জাতীয় গাছের পক্ষে কোন্ প্রকার মৃত্তিকা উপকারী তাহা না জানিয়া অনেকে গাছ মারিয়া ফেলেন। এজন্য সে পক্ষেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

মৃত্তিকাই উদ্ভিদের জীবন, মৃত্তিকা হইতে দেহ পোষণোপযোগী রসাদি লইয়া উহারা জীবিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সুতরাং টবে এরূপ পরিমাণে মৃত্তিকা রাখিতে হয় যে, তদ্দ্বারা যেন বৃক্ষের বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন ব্যাঘাত না জন্মে। যে টবে অল্প পরিমাণে মৃত্তিকা ধরে, সেই টবে বড় আকারের গাছ রোপণ করিলে সে গাছ সম্যক বৃদ্ধি হয় না। যখন দেখা যায় টবে গাছ ভাল রূপ বাড়িতেছে না এবং তেজ তত বর্দ্ধনশীল নহে, তখন বিলম্ব না করিয়া তাহা টব হইতে তুলিয়া ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। মৃত্তিকার দোষে অনেক সময় টবের গাছ হীনতেজ দেখিতে পাওয়া যায়। আবশ্যকীয় মৃত্তিকার অভাব এবং টবে নিয়মিত রূপে জল না পাইলে মৃত্তিকা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে ব্যাঘাত জন্মায়। টবের মাটিতে যদি কেঁচো প্রভৃতি কীট সঞ্চার হয় তাহা হইলে টবের চারার অবস্থা ভাল থাকে না। অতএব টবের মৃত্তিকা যাহাতে উপরি লিখিত দোষযুক্ত না হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টি কিম্বা জল সেচনের সময় যদি টবের চারার গোড়ার মৃত্তিকা আলগা হইয়া পড়ে এবং শিকড় দেখা যায় তাহা হইলে স্বতন্ত্র মৃত্তিকা দ্বারা তাহা ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। টবের মাটির অবস্থা ভাল রাখিবার জন্য সর্ব্বদা তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ অল্প পরিমিত মৃত্তিকায় যখন টবে গাছ রাখিতে হয়, তখন যাহাতে মৃত্তিকার অবস্থা ভাল থাকে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। টবের মাটিতে

ঘাস মুথা প্রভৃতি যদি আগাছা জন্মে তাহ[illegible] হইলে মূল গাছের উন্নতি সম্বন্ধে ব্যাঘাত হয়, কারণ মৃত্তিকার যে যে অংশ [illegible] ইয়া গাছ জীবিত ও বর্দ্ধিত হয়, টবে আগাছা জন্মিলে তাহারাই ঐ সক[illegible] পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করাতে মূল গাছের বিস্তর অনিষ্ট হইয়া উঠে। জন্য টবের মাটি সর্ব্বদা পরিষ্কার [illegible] দেখা দিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা [illegible] উহাতে, কোন্ক সময় [illegible] শ্যক। হাপোর ভাল করিয়া কোদলাইয়া [illegible] অবস্থা মন্দ হয় মিশ্রিত হইতে পারে। এই রূপে হাপোর প্রস্তুত হ[illegible] [illegible]র নিবারণ পূর্ব্বে হাপোরের মাটি উত্তম রূপ গুঁড় করিতে হয়। মাটি [illegible] গুঁড় করিতে হইবে, তাহা যেন ঠিক ধূলার ন্যায় হয়। পূর্ব্বেই ব[illegible] হইয়াছে, সেলারি চাষ করিতে হইলে দুইটী হাপোর প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথম হাপোরের মাটি এই রূপ গুঁড় করিতে হইবে। দ্বিতীয় হাপোর সেরূপ করিতে হয় না। প্রথম হাপোরে মাটি উত্তম রূপে গুঁড় করা হইল তাহাতে বীজ বপন করিতে হয়।

বীজবপন—আষাঢ় মাসের অর্দ্ধেক লাগাইদ সেলারি বপনের প্রশস্ত সময়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে উহা জলে ভিজাইতে হয়। ভিজাইবার নিয়ম এই যে প্রতি দিন বেলা ১০টার সময় জলে ভিজাইয়া ৪ টার সময় উহা জল হইতে তুলিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এবং পর দিন আবার উহা কাপড় হইতে খুলিয়া পূর্ব্ব দিনের ন্যায় জলে ভিজাইতে হয়, এবং ৪টার সময় উহা জল হইতে তুলিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া কোন স্থানে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এই রূপ ভাবে তিন দিন ভিজান হইলে, চতুর্থ দিনে হাপোরে বীজ বুনিতে হয়। বৈকাল বেলা বীজ বুননের প্রশস্ত সময়। বীজ খুব পাতলা করিয়া বুনিতে হয়। বীজ বপনের পর আস্তে২ অল্প পরিমাণে হাপোরে জল ছিটাইয়া দিতে হয়। এই জল এরূপ ভাবে দিতে হইবে যেন তদ্বারা বীজ অধিক মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে। জল দেওয়ার পর হাপোরে প্রস্তুত করা পূর্ব্বোক্ত পিন মাটি বীজের উপর অল্প পরিমাণে ছড়াইয়া দিতে হইবে। হাপোরে প্রতি দিন প্রাতে আস্তে আস্তে জল দিতে হয়। দিবসে হাপোর ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। রাত্রি কালে উহা খুলিয়া দিতে হয়। হাপোরে কোন সময়ে যেন বৃষ্টির জল

উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। [illegible] এদেশে ইহার চাষ অধিক হয় না। সেলারি খাদ্যে ব্যবহার হইয়া থা[illegible]। সাহেবেরা চীজ, মাখন ও লবণ দিয়া কাঁচা অবস্থায় আহার করি[illegible] থাকেন। বাঙ্গলীর মুখে মাখন ও লবণ দিয়া খাইলে চলিতে পরে[illegible] সেলারি অত্যন্ত পুষ্টিকর, বিশেষতঃ, মস্তিষ্কের পুষ্টিক[illegible] [illegible] থাকে [illegible]লের শোভায় থাকে বিলক্ষণ। কলিকাতা[illegible] থাকিতে হয়। হাপোরে নিয়মিত রূপে সেলারি থাকে আমরা [illegible]র মধ্যে বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হইয়া থাকে।

[illegible] চা[illegible]—প্রথম হাপোর যেরূপ খৈলের সার দিয়া প্রস্তুত করিতে হয় দ্বিতীয় হ[illegible]পোরি প্রস্তুত করারও সেই রূপ নিয়ম। তবে প্রভেদের মধ্যে এই প্রথম হাপোরে মাটি শুষ্ক করিয়া গুঁড় করিতে হইবে। দ্বিতীয় হাপোরে জল দিয়া মাটি কাদা করিতে হয়। প্রথম হাপোরে চারা ছয় আঙুল বড় হইলে অর্থাৎ চারার "জিবে পাতা" বাহির হইলে তাহা তুলিয়া দ্বিতীয় হাপোরে রোপণ করা আবশ্যক। চারার মাথায় দুইটী পাতা বাহির হইয়া তাহার মধ্যস্থল হইতে তৃতীয় পাতার কতকাংশ নির্গত হইলে সেই মধ্যবর্ত্তী পাতাটীকে "জিবে পাতা" কহিয়া থাকে। বড় চারা তুলিয়া পুঁতিলে তাহা হেলিয়া পড়ে। হাপোরে দুই দুই আঙুল ফাক করিয়া উহা রোপণ করা আবশ্যক। ঘন করিয়া চারা রোপিত হইলে ক্ষেতে তুলিয়া পুঁতিবার সময় উহা তুলিতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। চারা রোপনের পর তিন দিন হাপোর ঢাকিয়া রাখা উচিত এবং রাত্রিকালে ঐ আচ্ছাদন খুলিয়া দিতে হয়। চারি দিনের দিন উহা আর না ঢাকিয়া রোদ লাগাইতে হয়। এই রূপ হাপোরে রৌদ্র ও শিশির লাগাইলে চারা বাড়িয়া উঠিতে থাকে। রৌদ্রে যদি হাপোরের মাটি শুষ্ক হইয়া সূতার ন্যায় চির ধরে, তবে হাপোরের প্রথম অবস্থার সার মাটির ধুলার ন্যায় গুঁড়া তাহাতে ছড়াইয়া দিতে হয়। এই রূপ গুঁড় মাটি দিলে উক্ত চির বন্ধ হইবে। এবং চারার গোড়া আঁটিয়া গাছ মজবুত করিবে। হাপোরের অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। হাপোর নারিকেল পাতা দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া ভাল। কারণ বৃষ্টি হইলে পাতা বহিয়া জল সরিয়া

জ্যৈষ্ঠ মাসের ২০ এ লাগাইদ হা[illegible]র কোদলাইয়া তাহাতে খৈল ছড়াইয়া দিতে হয়। জমিতে খৈ[illegible] দেওয়ার সময় তাহা ঢেঁকিতে উত্তম রূপে গুঁড়া করিয়া দেওয়া উচিত। গুঁড়া খৈল সহজেই মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইতে প[illegible]। সার যতই মাটির সহিত [illegible]ত করা আব[illegible]শ্রত হয় [illegible]। এক সময় [illegible]ল সার মাটির সহিত জমি ভাদ্র মাসে কোদাল দিতে হয়। কে[illegible]ল বীজ বপনের ভূমিতে লাঙ্গল দিতে হইবে। অনন্তর বিঘা[illegible] খৈলের সার দিতে হইবে। খৈল দেওয়া হইলে সমুদায় এরূপ [illegible] মৈ দিয়া রাখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় হা[illegible]চারা ছয় অঙুল বড় হইলে উহা ক্ষেতে রোপণ করিতে হইবে; চারা ঠিক লাইন করিয়া রোপণ করা আবশ্যক। প্রত্যেক চারার চারি ধারে তিন পোয়া ফাক রাখিয়া পুঁতিতে হইবে। চারা ঘন করিয়া রোপিত হইলে, গাছ বড় হইয়া পরস্পরের বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মায় এবং অধিক অন্তর অন্তর রোপিত হইলে অনর্থক অনেকটা স্থান পড়িয়া থাকে। রোপণের দিন হইতে তিন দিন অল্প অল্প জল দিতে হইবে।

পাইট--ক্ষেতে চারা রোপনের ১৫ দিন পরে সমুদায় গাছের গোড়া এক বার খুসিয়া দিতে হইবে। যে দিন ক্ষেত খুসিবে সে দিন উহাতে জল দেওয়া অনাবশ্যক। হাপোরের মাটি যদি অত্যন্ত শুষ্ক দেখা যায় অর্থাৎ জল দেওয়ার আবশ্যক বোধ হইলে একটা সিঁচ দিতে হইবে। প্রথম সিঁচের আট দিন পরে পুনরায় ক্ষেত খুসিয়া দিতে হইবে। খুসার পর পুনর্ব্বার জল সিঁচিতে হইবে। এই রূপ নিয়মে দুই তিন বার ক্ষেত খুসা ও জল সিঁচা হইলে দাঁড়া রাখিয়া জমিতে এক বার কোদাল দিতে হইবে। কোদাল দেওয়ার অষ্টাহ পরে বিঘা প্রতি পঁচ মোণ রেড়ী খৈলের গুঁড় দিতে হইবে। প্রত্যক গাছের গোড়ায় চারি ধারে তিন আঙুল ফাক রাখিয়া দু আঁজলা খৈল দিয়া নিড়ানী দ্বারা তাহা মাটির সহিত উস্কিয়া দিতে হইবে। এই রূপ নিয়মে খৈল দেওয়া হইলে জমিতে এক বার সিঁচ দেওয়া আবশ্যক। এই জল সিঞ্চনের পর জমির অবস্থা বুঝিয়া মধ্যে ২ ক্ষেত্রে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। সেলারি এক কিম্বা দেড়

লাগিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। বৃষ্টির জল এই অবস্থায় অত্যন্ত অপকারী; কারণ বীজ বপনের পর কিম্বা অঙ্কুর নির্গত হইলে বৃষ্টির জলে বীজ অধিক মাটির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহার অঙ্কুরোৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে এবং চারার অবস্থায় জল লাগিলে গাছ হেলিয়া পড়ে এবং উহা মরিয়া যাইবার [illegible] তাহার মধ্যে রৌদ্র [illegible] থাকে [illegible] আসিতে পারে তজ্জন্য সতর্ক[illegible]রির উভয় পাশ জড়াইয়া বাঁধিলে মাথা চূড়ার বপন করিলে ১৫ দি[illegible] ঠোঙ্গা দিয়া বাঁধিবার তাৎপর্য্য এই যে উহার মধ্যে দ্বিতীয় হাপে[illegible] বাতাস প্রবেশ করিতে না পাওয়ায় গাছ শাদা হয়; শাদা সেলারির অত্যন্ত আদর, সেলারি যে পরিমাণ শাদা হইবে বাজারে তাহার সেই পরিমাণ মূল্য অধিক হইয়া থাকে। সেলারি স্বভাবতঃ শাদা ও লাল দুই বর্ণের হইয়া থাকে। শাদা জাতীয় গাছ ঠোঙ্গা দিয়া বাঁধিলে আরও অধিক শাদা হয়। ফল কথা ইহার গুভ্রবর্ণ অনুসারে মূল্যের হারবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঠোঙ্গা বাঁধিলে আর একটী উপকার এই হয় যে, গাছ পাশে বাড়িতে না পারিয়া ঊর্দ্ধে বাড়িতে থাকে। গাছ যদি উপরের দিকে অধিক বৃদ্ধি হইয়া ঠোঙ্গা ছাড়াইয়া উঠে, তবে যেখান হইতে ঠোঙ্গার বাহির হইবে সেইখান হইতে আবার স্বতন্ত্র ঠোঙ্গা বাঁধিয়া গাছ ঢাকিতে হইবে। ঠোঙ্গা বাঁধার প্রায় দশ দিন পরে উহা শাদা হইয়া থাকে, এই শাদা হওয়ার অবস্থায় সেলারি খাদ্যের উপযুক্ত। ক্ষেত্রে ঠোঙ্গা বাঁধিবার সময় একবারে সমুদায় গাছে ঠোঙ্গা না বাঁধিয়া অগ্র পশ্চাৎ করিয়া বাঁধিতে হইবে। একেবারে সমুদায় গাছ বাঁধিলে এক সময় সমুদায় খাদ্যের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে, অগ্র পশ্চাৎ ভাবে খাদ্যের উপযুক্ত হইলে উহা অনেক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক দিনে সমুদায় সেলারি বাঁধার আর একটী দোষ এই যে যদি গরম হইয়া কিম্বা বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে গাছ পচিয়া উঠিতে থাকে, তবে এককালে ক্ষতি হইবার সম্ভব; এজন্য এরূপ হিসাবে ঠোঙ্গা বাঁধিতে হইবে যে কতক বেশ ধরিয়া গিয়াছে, আবার কতক বাঁধিলে নষ্ট হইবার সম্ভব নাই। ক্ষেত্রে সেলারি রোপণের সময় আর একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি

যায় এবং পাতার ফাক দিয়া রৌ[illegible] লাগিতে পারে। এই হাপোরে চারা ছয় আঙুল বড় হইলে তাহা তু[illegible]য়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়।

চারা রোপণ ও ভূমি নির্ব্বাচন—এঁটেল মাটি সেলারির পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দোঁয়াশ মাটিতে বার আন পরিমাণ ফসল আদায় হইয়া থাকে, [illegible] এক সময় [illegible] আদৌ ভাল হয় না। সেলারির মধ্যে পুঁতিয়া অবশিষ্ট বাহিরে রাখিতে হইবে[illegible] দেওয়ার পর এক বার করিয়া নারিকেল পাতা শোওইয়া ঢাকিয়া দিতে হ[illegible] জমিতে দশ মণ বাহিরে রাখিবার কারণ এই যে মাচা অপেক্ষা কৃত[illegible]মিতে এক বার প্রাতে ও অপরাহ্নে ক্ষেতে রৌদ্র লাগিয়া গাছের অনিষ্ট [illegible]পারে। আর মাচা অপেক্ষাকৃত নীচ করিলে ক্ষেত্রের মধ্যে পাইট [illegible]বার জন্য লোক গমনাগমন করিতে ব্যাঘাত জন্মে;

সেলারি চাষে ব্যয়। *

এক বিঘা জমির খাজনা	১২৲
খৈল ১৬ মোণের কাত কিঃ মোণ ১৲ টাকা হিঃ	১৬৲
গাড়ী ভাড়া	১৲
৪ জন চাকর ৫ মাসের কাজ ফিঃ লোকের মাসিক বেতন ৭॥০ টাকা হিসাবে	১৫০৲
সিমনী ছয়খান ৶০ হিসাবে	১৸০
বাঁশ, দড়ী, পাতা ইত্যাদি বাবদ	১৬৲
বীজ খরিদ	৪৲
মোট ব্যয়	২০০৶০

* কলিকাতায় চাষের পক্ষে এই রূপ ব্যয় পড়িয়া থাকে, কিন্তু মফঃস্বলে ইহা অপেক্ষা খরচ অনেক কম হয়।

হাত বড় হইলে বাঁশের চোঙ্গার দ্বারা গাছ বাঁধিয়া দিতে হয়। বাঁশের কোঁড় হইতে যে খোলা নির্গত হইয়া পড়িয়া যায়, তাহাকে বাঁশের ঠোঙ্গা কহে। ঐ ঠোঙ্গা উচ্চ ভাবে গা[illegible] জড়াইয়া দিতে হয়। ঠোঙ্গার নিম্নভাগ কতক মাটির মধ্যে পুঁতিয়া দিতে হইবে। উভয় ঠোঙ্গার দুই পাশ অর্থাৎ জোড়ের মুখ উত্তম করিয়া [illegible]দ্ধ করিয়া দিতে হইবে, উহা এরূপ হিসাবে বাঁধিতে হ[illegible] [illegible] থাকে[illegible]নর দো[illegible]য়া থা[illegible] যে গাছ হইয়া থাকে, তাহাতে ভাল বীজ করিতে না পারে। [illegible]ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর সেলারি ন্যায় বাঁধা পড়ি[illegible]য়া থাকে। সেলারি বীজ সাঁতা স্থানে রাখিলে কিম্বা [illegible] লাগিলে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। এ জন্য শিশির মধ্যে উত্তম রূপ মুখ বন্ধ করিয়া কাপড় কিম্বা তুলা জড়াইয়া বাক্স মধ্যে তুলিয়া রাখিতে হয়। বীজ মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দেওয়া উচিত। পুরাতন বীজে চারা জন্মে না, এ জন্য প্রতি বৎসর নূতন বীজে চাষ করিতে হয়।

এদেশে এক প্রকার সেলারি হইয়া থাকে, তাহা তত উৎকৃষ্ট নহে। গাছের আকার ছোট এবং আস্বাদনের বিস্তর প্রভেদ এ জন্য বাজারে উহার মূল্য অত্যন্ত শস্তা। দেশী সেলারি চাষে লাভ তত হয় না। চাষীরা দেশী সেলারি বলিয়া যে এক প্রকার সেলারি চাষ করিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক দেশী নহে। উহা প্রথমে বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল, এদেশে উহার বীজ ধরিয়া চাষ করা হইয়া থাকে। এক্ষণে আমেরিকা ও ইয়ুরোপ খণ্ডের সেলারির সহিত তুলনা করিলে উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বোধ হইয়া থাকে। এদেশে ক্রমে ক্রমে উহা হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক প্রকার তরকারী আছে, তাহাদিগের বীজ এদেশে ধরিলে উহা ভাল হয় না। এজন্য ঐ সকল তরকারীর বীজ বিদেশ

* আমরা যে হিসাব দেখাইলাম তাহাতে প্রত্যেক সেলারির গাছের এক আনা মূল্য ধরা হইল। কিন্তু কলিকাতায় এক আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত মূল্যে উহা বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং সেই হিসাবে এক বিঘা জমিতে অধিক আয় দেখা যায়।

রাখিতে হইবে। সেলারির ক্ষেত্র কোন প্রকার আচ্ছাদন দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঢাকিয়া না দিলে অধিক রৌদ্র কিম্বা বৃষ্টিপাতে সেলারির ক্ষতি সাধন করিতে পারে। এজন্যে গাছের উপর মাচা বাঁধিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের চারিপাশে খুঁটি পুঁতিতে হইবে। এই খুঁটির পরিমাণ চারি হস্ত হওয়া আবশ্যক। তাহার আধ হাত মাটির [illegible] সেই খুঁটির উপর মাচা [illegible] প্রকার বিদেশীয় শাক সবজীর বীজ এদে[illegible] খুঁটির চৌদ্দ পোয়া সকল বীজের মধ্যে কোন কোন জাতীয় শাক সব[illegible]ধিক উচ্চ হইলে হইয়াছে। অপর কতক গুলির অদ্যো উন্নতি হয় নাই। [illegible] পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন বিদেশীয় তরকারীর উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য বৎসর বৎসর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ঐ সকল সবজীর বীজ আনাইয়া এদেশে চাষীরা চাষ করিয়া থাকে। কেবল মাত্র যে বীজ ভাল হইলে সবজী ভাল হয় তাহা নহে। বীজ ভাল হওয়া যেমন আবশ্যক, ঐ বীজ আবার সুচারু রূপে চাষ করিতে জানাও সেই রূপ প্রয়োজন। চাষ প্রণালী ভাল রূপ জানা না থাকিলে অনেকেই চাষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। আমরা বৎসর বৎসর দেখিয়া থাকি পাইকপাড়া নর্শরি হইতে অনেকেই এক প্রকার বীজ লইয়া চাষ করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ ঐ বীজে উৎকৃষ্ট রূপ সবজী উৎপন্ন করিয়া থাকেন, আবার অনেকে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া বীজের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। ফলতঃ যে কোন চাষে একটু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোক যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন না কেন, তাহাতে সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে পারেন না। অন্যান্য শাক সবজী এক প্রকার মোটামুটি চাষ করিলে ফসল আদায় করিতে পারা যায় কিন্তু সেলারি চাষ সেরূপ নহে। ইহাতে বিশেষ রূপ পাইট করিতে হয়। সেলারি চাষ সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইল, তাহার অন্যথা হইলে ফসল ভাল হইবে না। ফসল ভাল না হইলে লাভ যে উপযুক্ত পরিমাণে হয় না তাহা বলা বাহুল্য। এজন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ অগ্রে চাষ প্রণালী শিক্ষা করিয়া পরে চাষে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

এক বিঘা জমিতে অন্যূন ছয় হাজার সেলারি গাছ হইয়া থাকে। গড়ে প্রত্যেক গাছ এক আনা মূল্যে বিক্রয় হইলেও ৩৭৫৲ টাকা হইতে পারে।* সেলারি চাষে যে লাভ অধিক তাহা আমরা বিলক্ষণ দেখিয়াছি। দেশ মধ্যে এই রূপ নূতন নূতন শা[illegible] সবজী চাষ করিলে কৃষকদিগের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। কলিকাতার নি[illegible]টবর্ত্তী অনেক সবজীওয়ালা সেলারি চাষে উত্তম লাভ করিয়া থাকে। [illegible] থাকে[illegible]লের শোভায় থাকে।

বীজ—এদেশে সেলা[illegible] উৎপন্ন হয় না। [illegible] বীজ আনীত [illegible]

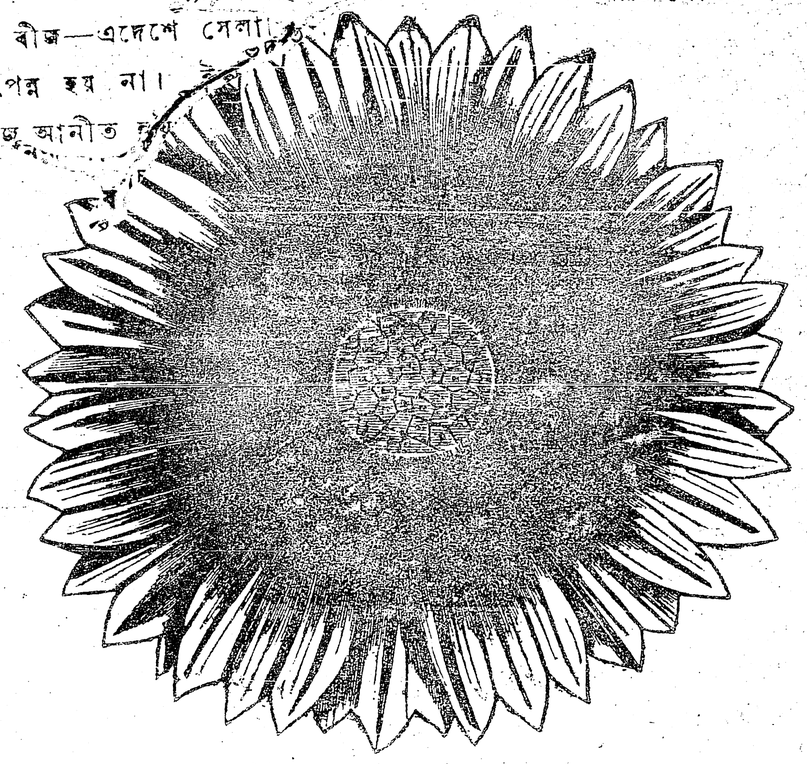

গেইলার্ডিয়া এক প্রকার পুষ্প, এই পুষ্পের সৌন্দর্য্য দেখিলে মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মে। উদ্যান-প্রিয় ব্যক্তিগণ বাগানের শোভার জন্য গেইলার্ডিয়া রোপণ করিয়া থাকেন। গেইলার্ডিয়ার যেরূপ আকার হইয়া থাকে তাহার একটী চিত্র উপরে প্রদর্শিত হইল। পাঠকগণ এই চিত্র দেখিয়া গেইলার্ডিয়ার অনেকটা ভাব বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এই চিত্র দেখিলে হটাৎ সূর্য্য-মুখী ফুল বলিয়া ভ্রম জন্মে কিন্তু বাস্তবিক

হইতেই আনয়ন করা ভাল। যে কোন উদ্ভিদাদি, হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, যাহাতে তাহার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। জল বায়ু এবং উত্তাপাদির উপর যে উদ্ভিদের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে তাহা জানা উচিত। যে পরিমাণে উত্তাপাদি প্রাপ্ত হইলে উহা সম্যক বৃদ্ধি পায় এবং আকারগত ও আস্বাদগত উন্নতি হইতে পারে তাহার অভাব [illegible] যেরূপ চিত্র [illegible] পারেন। কয়েক যে সকল গেইলার্ডিয়া ফুটিয়া থাকে, তাহা[illegible] ধরা হইয়া থাকে, ঐ হয় না। এ দেশের জল বায়ুতে উহার আকার কিছু [illegible] উত্তম উন্নতি যায়। তবে বিশেষরূপ পাইট করিলে দুই এক বৎসর [illegible] দেশ [illegible]রের ফুলও দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু সচরাচর অপেক্ষাকৃত ছোট [illegible] দেখা যায়। কমলালেবুর ন্যায় বর্ণ, গাঢ় লাল এবং বেগুণে এই তিন প্রকার রঙের গেইলার্ডিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার মধ্যস্থল বেগুণে, দল সমূহ সোণার রঙের ন্যায় এবং দলের পাশে ঘোর লালের দাগ থাকে, তাহাকে পিক্‌টা (Picta) কহে। যাহার দল লাল বর্ণের এবং দলের পার্শ্বে শাদা তাহাকে য়্যালবামার্জিনেটা (Albamarginata) কহে। আর যাহার মধ্যভাগ বেগুণে, দল লাল এবং দলের পার্শ্ব হরিদ্রা বর্ণের তাহাকে হাইব্রিডাগ্রাণ্ডিফ্লোরা (Hybrida Grandiflora) কহিয়া থাকে। যে তিন শ্রেণীর গেইলার্ডিয়ার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহাদিগের প্রত্যেকের সৌন্দর্য্য পৃথক্ পৃথক্। কিন্তু তিন শ্রেণীই দেখিতে অতি মনোহর। গেইলার্ডিয়ার সটিক সৌন্দর্য্য না দেখিলে, কাহাকেও সহজে লিখিয়া বুঝান বড় কঠিন; কারণ অনেক প্রকার ফুলের দলের গঠন এবং রঙের এরূপ কৌশল আছে যে ঠিক সেইরূপ প্রকাশ করা অত্যন্ত অসুবিধা। এজন্য কোন পুস্তকেই ফুলের ঠিক অবস্থা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যে কোন ফুলের শোভা ও আকার গত কৌশল এবং বর্ণ যোজনায় চমৎকারিত্ব স্ব চক্ষে দর্শন করিতে হয়।

গেইলার্ডিয়াও এক প্রকার ঋতু পুষ্পের মধ্যে পরিগণিত। তবে অন্যান্য ঋতু পুষ্পের গাছ যেমন শীঘ্র মরিয়া যায়, গেইলার্ডিয়া সেরূপ নহে। অনেক দিন পর্য্যন্ত গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে। ঋতু পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে যে শীত শেষ হইলেই গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয়

গেই-ল[illegible]র্ডিয়া।

(Gaille[illegible]dia)

[illegible] হইয়া থাকে [illegible]লের শোভায় থাকে [illegible]

[illegible]য়ার করিয়া উহা অন্য স্থানে পুঁতিলে ভাল [illegible] পক্ষে বালি ও পচা গোবর উত্তম সার। প্রথমতঃ [illegible]য়াশ মাটি দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। গোবর সার ভিন্ন পাতা [illegible]চা সার দিলেও চলিতে পারে, কিন্তু পাতা সার অপেক্ষা গোবর সার ইহার পক্ষে ভাল। ঋতুপুষ্প মাত্রেরই পক্ষে পাতা সার প্রশস্ত। যে কোন সারই হউক উহার টাট্‌কা অবস্থা গাছের পক্ষে ভাল নহে। টাটকা সারে গাছের তেজ নষ্ট করে এবং পোকা হইতে পারে। কীটাদি হইলে গাছ বাঁচান বড় কঠিন। গাছে পোকা হইলে ছাই, হুঁকার জল দিতে হয় এবং হাত দিয়া ডলিয়া মারাও আবশ্যক। এ জন্য যাহাতে পোকা লাগিতে না পারে তাহার উপায় করা উচিত। সময় সময় কোন স্থানে পিপীলিকা দ্বারাও বিস্তর অনিষ্ট হইয়া থাকে, পিপীলিকার পক্ষে হরিদ্রা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দিতে হয়। গেইলার্ডিয়ার বীজ ক্ষুদ্র, অনেকটা য়্যাষ্টারের বীজের ধরণের। ঋতু পুষ্প মাত্রেরই চারা প্রস্তুত পক্ষে একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। কারণ ঐ সকলের বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সামান্য কারণেই উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। বীজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র এজন্য বীজ রোপণের পর যদি তাহাতে জোরে জল ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে উহা অধিক মাটির নীচে প্রবেশ করে এবং সেই মাটি ভেদ করিয়া অঙ্কুর বাহির হইতে অসমর্থ হয়। এ জন্য বীজ রোপণের পর চারা একটু বড় হইয়া জোর ধরা পর্য্যন্ত খুব আস্তে আস্তে অল্প পরিমাণে জল দিতে হয়। এই সকল গাছের পক্ষে সোরু ধার বোমা দ্বারা জল ঢালিয়া দেওয়া ভাল। বোমাতে জল বিন্দুসমূহ এরূপ ক্ষুদ্র ধারে পড়িতে থাকে যে তদ্বারা উহার কোন অনিষ্ট হয় না। অর্থাৎ বীজ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইতে কিম্বা অধিক মাটির মধ্যে

উহা সূর্য্য-মুখী নহে। সূর্য্য-মুখী যেমন নয়ন তৃপ্তিকর সৌন্দর্য্য গেইলার্ডিয়ারও সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। লেইলার্ডিয়া যে সময় গাছে ফুটিয়া থাকে, তখন তাহার শোভা দেখিতে অতি মনোহর। সূর্য্য-মুখীর আকারের সহিত ইহার গঠনের [illegible] এরূপ চিত্র [illegible] হইল, এ দেশে প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন। টবে মাটি আকার প্রায় তত বড় হইতে ঘাস মুথা এবং ইঁটের কুচি প্রভৃতি ভাল করিয়া ছোট হইতে দেখা হইবে। মাটি অত্যন্ত ঝুরা করা আবশ্যক। মাটি এরূপ [illegible] উহাতে আঙুল দিলেই তাহা যেন বসিয়া যাইতে পারে, এবং [illegible] পরিমাণে জল পাইলেই সমুদায় মাটি যেন ভিজিয়া যায়। এঁটেল মাটিতে এরূপ অবস্থা হয় না, উহা রৌদ্র পাইলে অত্যন্ত কঠিন হয় এবং জল পাইলে খুব কাদা হইয়া থাকে, এজন্য এঁটেল মাটিতে কোন প্রকার পুষ্প জন্মে না। কারণ বীজ রোপনের পর যদি মাটি কঠিন হইয়া আঁটিয়া যায়, তবে আদৌ অঙ্কুর নির্গত হইবে না, আর যদি অত্যন্ত কাদা হয় তাহা হইলে মাটির জলীয় অংশে বীজ পচিয়া যাইবে। এজন্য পূর্ব্বোক্ত রূপ মাটি দ্বারা টবপূর্ণ করিতে হয়। টবের মাটি চারাইয়া তাহাতে পাতলা করিয়া বীজ ছড়াইতে হইবে, বীজ ছড়াইবার পর খুব ঝুরা মাটি অল্প পরিমাণে তাহার উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, এই মাটি এরূপ ভাবে দিতে হইবে তদ্বারা যেন বীজ সম্পূর্ণরূপে অধিক মাটির নীচে না পড়িতে পারে, কেবল মাত্র অল্প পরিমাণে যেন ঢাকা পড়ে। টবে বীজ রোপণ করিয়া ঐ টব রৌদ্রে রাখা ভাল নহে; উহা এরূপ স্থানে রাখিতে হইবে, রাত্রি কালে যেন উত্তমরূপ শিশির পায় এবং প্রাতে যেন সামান্যরূপ রৌদ্র পাইতে পারে। এঅবস্থা হইতে চারার ক্ষুদ্রাবস্থা পর্য্যন্ত মধ্যাহ্নকালের প্রখর রৌদ্র লাগিলে অত্যন্ত অপকার হইয়া থাকে। পরে যখন চারা বড় হইতে থাকে অর্থাৎ রৌদ্র সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, তখন ক্রমে ক্রমে রৌদ্র সহাইতে হইবে। গাছে রৌদ্র আদৌ না লাগাইলে চারা অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়ে। বীজ ভাল এবং মাটির উত্তম পাইট হইলে ৫। ৭ দিনের মধ্যেই উহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বীজ রোপণ

আর ফুল ফুটে না। কিন্তু গেইলার্ডিয়া সেরূপ নহে, জিনিয়ার ন্যায় বর্ষা হইতে শীত পর্য্যন্ত প্রচুর ফুল হইয়া থাকে। ইহা তত কোমল প্রকৃতির গাছ নহে, গাছের স্বভাব অনেকটা আগাছার ন্যায়।

গেইলার্ডিয়া টব ও ভূমি উভয় স্থানেই হইয়া থাকে। ভূমিতে কিছু ভাল হয়। ইহার গাছ, উত্তম ঝাড়াল হইয়া থাকে। গাছ শোভায় থাকিতে হইলে, অগ্রে টবে চারা [illegible] সোজা কথা একটা জানা আবশ্যক যে মাটি হয়। গেইলার্ডিয়া [illegible] ব্যবস্থা করা বিধেয়; অর্থাৎ মাটি শুষ্ক হইলেই একটী টব [illegible] হইবে। মাটি রসাল না থাকিলে বীজ অঙ্কুরিত কিম্বা চারা তেজ [illegible] হইবে না। রসই উদ্ভিদের খাদ্য; আমরা যেমন আহার দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়া থাকি, উদ্ভিদ্‌গণও সেইরূপ মৃত্তিকাস্থ রস গ্রহণ করিয়া দেহ পুষ্ট এবং জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। আবার আবশ্যকের অধিক আহার করিলে যেমন শরীর অসুস্থ হয় এবং নানারূপ রোগ জন্মে সেই রূপ উদ্ভিদ্‌গণ অধিক সার কিম্বা অধিক জল পাইলে রুগ্ন হইয়া পড়ে। ফল কথা অধিক কিছুই ভাল নহে। গাছের গোড়ার মাটি কঠিন হইলে মধ্যে মধ্যে তাহা খুসিয়া দেওয়া উচিত। গোড়া আলগা না হইলে গাছ সম্যক বাড়িতে পারে না, গাছের বৃদ্ধি বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে উহা রোপণ করা বৃথা।

গেইলার্ডিয়ার চারা প্রথমে আমরুল শাকের ন্যায় সোরু হইয়া উৎপন্ন হয়। সেই চারার গা হইতে অনেকগুলি ডগা বাহির হয়, এইরূপ ভাবে ডগা হইয়া বড় একটি ঝাড় হইয়া উঠে। এবং সেই ডগার মাথায় ফুল ফুটিয়া থাকে। এক একটি গাছে যে অধিক পরিমাণে ফুলের উপযুক্ত ডগা উঠিয়া থাকে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এইরূপ অধিক ফুল ফুটিলে গাছের একটি মনোহর শোভা হয়। ইচ্ছা করিলে বাগানে অথবা বারাণ্ডায় উভয় স্থানেই গেইলার্ডিয়া রোপণ করিয়া শোভা ভোগ করিতে পারা যায়। গেইলার্ডিয়ার ফুলে গন্ধ নাই, উহা কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য লোকে আদর করিয়া থাকে। গেইলার্ডিয়ার বীজ এদেশেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভাল ভাল বীজ আনীত হইয়া থাকে। এদেশের বীজে যে ফুল হয় তাহার আকার তত বড়

প্রবেশ করাইতে অথবা চারার অবস্থায় তাহাকে শোয়াইয়া ফেলিতে পারে না। বোমার অভাব হইলে হাতে করিয়া সাবধানে জল দিলেও চলিতে পারে। যে টবে বীজ ফেলিতে হইবে, সেই টবের মাটি উত্তমরূপ গুঁড় করিতে হইবে। মাটির পাইট যতই উত্তম হইবে, বীজের পক্ষে ততই [illegible] রূপ চিত্র ৬। মাটির দোষে অনেকে গাছ যত উত্তম হইবে চারার পক্ষে ততই ভাল। গে[illegible] পুরিবার পূর্ব্বে অগ্রে উহা দুই বার রোপণ করিতে পারা যায়। জিনিয়া ফুলের [illegible] বাছিয়া ফেলিতে কালে দুই সময়ে ফুল হইয়া থাকে। গাছে ফুল ফুটিতে আর [illegible] আবশ্যক প্রচুরতা দেখা যায়। অন্যান্য ঋতু পুষ্পের ন্যায় গেইলার্ডিয়া [illegible] ততটা পাইট না করিলেও চলিতে পারে। এমন কি অনেক সময় দেখা গিয়াছে। মাটিতে বীজ ছড়াইয়া দিলেও গাছ হইয়া থাকে তবে বিশেষ রূপ পইট করিলে ফুলের উৎকর্ষ সাধিত হইতে দেখা যায়। যে কোন উদ্ভিদ্ বিনা যত্নে রোপণাদি করিলে এক প্রকার ফুল ফল হইয়া থাকে, যত্নের সহিত তাহাদিগের রোপণাদি করিলে ফুল ও ফল যে অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ যে সকল উদ্ভিদ্ ভিন্ন দেশীয় তদ্সমুদায়ের চাষে বিশেষরূপ পাইট করিতে হয়। ভূমির পাইটের উপরই উদ্ভিদের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি এক প্রকার বীজাদি লইয়া যেরূপ ফুল ও ফল উৎপাদন করিতে পারেন অন্য ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা ঘটে না ইহার কারণ কি? চাষাদি সম্বন্ধে যত্ন শৈথিল্য যে তাহার প্রধান কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এ দেশে যে সকল মালী বাগানের কাজ করিয়া থাকে, তাহারা বিদেশীয় উদ্ভিদের পক্ষে এক প্রকার অনভিজ্ঞ। এজন্য অনেকে মালী দ্বারা অনেক সময় ভালরূপ কাজ পাইতে পারে না। অতএব এ সকল কাজে কেবল মাত্র মালীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। ফুল ও ফল উত্তম আকারে করিতে হইলে এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তকাদি আছে, তদ্সমুদায় পাঠ করিয়া তাহাদিগকে রোপণাদির উপদেশ দিতে হয়। আমাদের অপেক্ষা অনেক ইংরাজদিগের বাগানে যে ফুলাদি ভাল হইয়া থাকে. তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সাহেবরা সর্ব্বদা তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহারা

পক্ষে কোন প্রকার ত্রুটি হইলে কখন কখন দশ বার দিনেও উহা অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। টবে চারা ৫। ৬ আঙুল বড় হইলে উহা তুলিয়া ভূমিতে অথবা টবে রোপণ করিতে হয়। বীজ রোপণের টবে মাটি যেরূপ পাইট করিয়া সার দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, চারা রোপণের মৃত্তিকাও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। বীজ রোপণের পর দিন হইতে সর্ব্বদা জল দেওয়া উচিত। জল দেওয়া উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে গেইলার্ডিয়া একটী ও গাছের অবস্থা [illegible]। সামান্য যত্ন করিলে যখন উহার শোভা দেখিয়া [illegible] করিতে পারা যায়, তখন তাহাতে উদাসীন থাকা যারপর নাই দুঃখের বিষয়। এই পুষ্প দেখিলে মনে যেমন আনন্দ জন্মে, সেই সঙ্গে ইহাতে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিলে অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-স্রোত স্বতই প্রবাহিত হইতে থাকে। বাস্তবিক সংসারে নির্ম্মল পুষ্পাদি লইয়া আমোদ উপভোগ করার ন্যায় পবিত্র কার্য্য আর কিছুই নাই। আমরা অনুরোধ করি আমাদের পাঠকবর্গ এই সকল পুষ্প রোপণ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকুন। নিজে একটু যত্ন ও সামান্য রূপ পরিশ্রম করিলে সকলেই এই সুখের ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন। বাস্তবিক একটু পরিশ্রমের অভাবে এমন নির্ম্মল সুখভাণ্ডার পরিত্যাগ করা নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় বলিতে হইবে।

রূপ হয় না। এ জন্য চারা রোপণের পক্ষে বিদেশীয় বীজই উৎকৃষ্ট। বিদেশীয় যে সকল বীজ আসিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত যত্ন করিয়া রাখিতে হয়। কারণ বর্ষাকালের জলীয় বাতাস লাগিলে বীজ নষ্ট হইয়া থাকে। বিদেশীয় বীজ মাত্রই কাপড়াদি জড়াইয়া বাক্স মধ্যে রাখা উচিত। বীজ কাপড়ে জড়িয়া না রাখিয়া শিশি মধ্যে মুখ বন্ধ করিয়া রাখা ভাল। বীজ যত উত্তম হইবে চারার পক্ষে ততই ভাল। গেইলার্ডিয়া বৎসরের মধ্যে দুই বার রোপণ করিতে পারা যায়। জিনিয়া ফুলের [illegible] বর্ষা ও শীত কালে দুই সময়ে ফুল হইয়া থাকে। গাছে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইলে ফুলের প্রচুরতা দেখা যায়। অন্যান্য ঋতু পুষ্পের ন্যায় গেইলার্ডিয়া [illegible] ততটা পাইট না করিলেও চলিতে পারে। এমন কি অনেক সময় দেখা গিয়াছে। মাটিতে বীজ ছড়াইয়া দিলেও গাছ হইয়া থাকে তবে বিশেষ রূপ পইট করিলে ফুলের উৎকর্ষ সাধিত হইতে দেখা যায়। যে কোন উদ্ভিদ্ বিনা যত্নে রোপণাদি করিলে এক প্রকার ফুল ফল হইয়া থাকে, যত্নের সহিত তাহাদিগের রোপণাদি করিলে ফুল ও ফল যে অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ যে সকল উদ্ভিদ্ ভিন্ন দেশীয় তদ্‌সমুদায়ের চাষে বিশেষরূপ পাইট করিতে হয়। ভূমির পাইটের উপরই উদ্ভিদের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি এক প্রকার বীজাদি লইয়া যেরূপ ফুল ও ফল উৎপাদন করিতে পারেন অন্য ব্যক্তির ভাগ্যে তাহা ঘটে না ইহার কারণ কি? চাষাদি সম্বন্ধে যত্ন শৈথিল্য যে তাহার প্রধান কারণ তাহা বলা বাহুল্য। এ দেশে যে সকল মালী বাগানের কাজ করিয়া থাকে, তাহারা বিদেশীয় উদ্ভিদের পক্ষে এক প্রকার অনভিজ্ঞ। এজন্য অনেকে মালী দ্বারা অনেক সময় ভালরূপ কাজ পাইতে পারে না। অতএব এ সকল কাজে কেবল মাত্র মালীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। ফুল ও ফল উত্তম আকারে করিতে হইলে এ সম্বন্ধে যে সকল পুস্তকাদি আছে, তদ্‌সমুদায় পাঠ করিয়া তাহাদিগকে রোপণাদির উপদেশ দিতে হয়। আমাদের অপেক্ষা অনেক ইংরাজদিগের বাগানে যে ফুলাদি ভাল হইয়া থাকে. তাহার কারণ আর কিছুই নহে, সাহেবরা সর্ব্বদা তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহারা

সেই উপদেশানুসারে কাজ করিয়া থাকে। তজ্জন্য সাহেবদিগের বাগানে উৎকৃষ্ট পুষ্পাদি হইতে দেখা যায়। গেইলার্ডিয়া সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইল এইরূপ নিয়মে রোপণ করিলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট আকারের ফুল উৎপাদন করিতে পারা যাইবে। এ দেশে কএক বৎসর হইতে এই ফুলের রোপণাদি হইতেছে। অতি সহজ উপায়ে ইহার গাছ করিয়া ফুলের শোভায় [illegible] করিতে পারা যায়। উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে গেইলার্ডিয়া একটী প্রধান আদরের ফুল। সামান্য যত্ন করিলে যখন উহার শোভা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়, তখন তাহাতে উদাসীন থাকা যারপর নাই দুঃখের বিষয়। এই পুষ্প দেখিলে মনে যেমন আনন্দ জন্মে, সেই সঙ্গে ইহাতে ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিলে অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি-স্রোত স্বতই প্রবাহিত হইতে থাকে। বাস্তবিক সংসারে নির্ম্মল পুষ্পাদি লইয়া আমোদ উপভোগ করার ন্যায় পবিত্র কার্য্য আর কিছুই নাই। আমরা অনুরোধ করি আমাদের পাঠকবর্গ এই সকল পুষ্প রোপণ করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে থাকুন। নিজে একটু যত্ন ও সামান্য রূপ পরিশ্রম করিলে সকলেই এই সুখের ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পারেন। বাস্তবিক একটু পরিশ্রমের অভাবে এমন নির্ম্মল সুখভাণ্ডার পরিত্যাগ করা নিতান্ত বিড়ম্বনার বিষয় বলিতে হইবে।

কুলিবেগুণের চাষ।

—:•:—

চাষিদিগের তরকারী আবাদে বিলক্ষণ লাভ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকার তরকারী এরূপ আছে যে, তাহাদিগের চাষে পরিশ্রম ও ব্যয় অল্প কিন্তু লাভ অধিক। আমরা অদ্য কুলিবেগুণের আবাদে লাভের হিসাব পাঠকবর্গকে দেখাইব।

এই বেগুণের গাছ একবার রোপণ করিলে সম্বৎসর ফল লাভ করিতে পারা যায়। কুলি বেগুণের আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, গাছে প্রচুর বেগুণ ফলিয়া থাকে। দো-আঁস জমিতে ইহার ফসল অধিক হয়। পৌষ মাসে ইহার রোপণের সময়।

বীজ বপনের নিয়ম—প্রথমতঃ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তলা ফেলিতে হয়। তলা ফেলা কাহাকে বলে অনেকেই তাহা না জানিতে পারেন। কোন স্থান উত্তম করিয়া কোদলাইয়া ঘাস মুথা প্রভৃতি পরিষ্কার করিতে হয়। কোদলান মাটির চাপ হাতে করিয়া ভাঙ্গিয়া মাটি গুঁড়া করিতে হয়, সেই গুঁড়া মাটিতে বীজ ছড়াইয়া স্বতন্ত্র গুঁড়া মাটি (ধূলার ন্যায়) তাহার উপর ছড়াইয়া হাত দিয়া চাপিয়া দিতে হয়। উহা এরূপ করিয়া চাপড়াইতে হইবে যেন বীজ মাটির মধ্যে উত্তম রূপ ঢাকিয়া যাইতে পারে। এই রূপ নিয়মে বীজ মাটির মধ্যে চাপিয়া দেওয়া হইলে উহা কলার পাতা কিম্বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা ঐ বীজ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। সাত দিন পর্য্যন্ত বীজ ঐ রূপ নিয়মে ঢাকা থাকিবে। ৭ দিনের দিন ঐ আচ্ছাদন খুলিয়া দিতে হইবে। এবং হাতে করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে সেই রোপিত বীজের উপর জল দিতে হইবে। জল দেওয়ার সময় এরূপ হিসাবে উহা দিতে হইবে যে তদ্বারা মাটি যেন কাদার ন্যায় না হয়, কেবল মাটি অল্প পরিমাণে আর্দ্র হইবে। জল দেওয়ার পর পুনর্ব্বার উহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঢাকিয়া দিতে হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত বীজ অঙ্কুরিত না হইবে তত দিন ঐ আচ্ছাদন সমভাবে রাখিতে হইবে।

অনন্তর অঙ্কুর বাহির হইলে, আচ্ছাদন খুলিয়া দিতে হইবে, উহা আর ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। চারার এই অবস্থায় বিশেষ কোন পাইট নাই। তবে জমির অবস্থা বুঝিয়া কোন কোন দিন অল্প পরিমাণে জল দিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। এই সময় প্রায় জল আবশ্যক করে না, রাত্রিকালের শিশিরে চারার বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকা রসাল করিয়া তুলিয়া থাকে। রাত্রের শিশির ও দিবসের রৌদ্রে চারা দিন দিন তেজাল হইয়া উঠে।

রোপণ প্রণালী—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, কুলি বেগুণ দো-আঁশ মৃত্তিকায় ভাল হইয়া থাকে। সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে এই বেগুণের চাষ করিলে ভাল হয়। বেগুণের জমি চারা রোপণের পূর্ব্বে একবার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। চারা সোজা লাইন করিয়া পুঁতিতে হয়। প্রত্যেক চারা এক হাত অন্তর অর্থাৎ চারিদিকে এক হাত ফাঁক করিয়া পুঁতিলে ভাল হয়, গাছ ঘন হইলে উহা ঝাড়াল হইতে পারে না, সোরু হইয়া উঠে। সোরু গাছে ফল অধিক হয় না। যে গাছ অধিক ঝাড়াল, বেশ ঝেঁকড়া ঝেঁকড়া সেই গাছ ফলনের পক্ষে ভাল। তলাফেলা স্থান হইতে মাঘ মাসের ১৫ই ১৬ই লাগাইদ চারা তুলিয়া রোপণ করিতে হয়। চারা তুলিয়া তাহার গোড়ার মূল শিকড়ের কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা আবশ্যক। চারার শিকড় কাটিয়া দিলে সেই কর্ত্তিত স্থান হইতে শীঘ্রই শিকড় বাহির হইয়া গাছ লাগিয়া থাকে। এজন্য শিকড় কাটিবার ব্যবস্থা। চাষিরা সকলেই বেগুণের চারা পুঁতিবার সময় উহার শিকড় কাটিয়া রোপণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেন যে উহা কাটিতে হয় এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাহার উত্তর দানে সমর্থ হয় না। তাহারা দেখিয়া আসিতেছে, চিরকাল হইতেই ঐ নিয়মে চারা রোপিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারাও সেই বিধির অনুকরণ করে। চাষ সম্বন্ধেও স্থানে স্থানে চাষী প্রজাদিগের মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে চাষিরা চারা রোপণ নিজে না করিয়া যে সকল স্ত্রীলোকদিগের হাতে পৈঁছা গহনা পরা থাকে, তাহাদিগের দ্বারা উহা রোপণ করিয়া লয়। স্ত্রীলোক দ্বারা সমুদায় ক্ষেত রোপণ করা অসম্ভব হইলে প্রথমতঃ কিয়ৎ পরিমাণ চারা রোপণ করিয়া লইয়া থাকে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য

এই তাহাদের মনে বিশ্বাস পৈঁছের যেমন গড়ন এবং উহা যেরূপ ঘন গাঁথা থাকে। ক্ষেত্রস্থ বেগুণও সেইরূপ ঘন ঘন থোলো থোলো ফলিবে। ফলতঃ পৈঁছার সহিত ফলনের যে কোন সম্বন্ধ নাই তাহা অজ্ঞ কৃষকেরা জানে না। গাছ উপযুক্ত নিয়মে চাষ করিলেই তাহাতে উত্তম ফল হইয়া থাকে।

চারা রোপণের দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত গাছের গোড়ায় অল্প অল্প জল দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় অপেক্ষা প্রাতঃকালে জল দিলে অধিক উপকার হইয়া থাকে। অনন্তর ১৫ দিন পরে ক্ষেতে একবার ছিঁচ দিলে ভাল হয়। এই জল সিঞ্চনের পর আর জল দেওয়ার আবশ্যকতা হয় না। গাছ যেমন বাড়িতে থাকিবে মধ্যে মধ্যে দুই একবার গোড়া খুসিয়া দিতে হইবে। তাহার পর কিছু দিন পরে একবার সমুদায় ক্ষেত উত্তমরূপ কোদলাইয়া দিতে হইবে।

পাইট———পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কুলিবেগুণের অধিক পাইট করিতে হয় না। অন্যান্য শাকসবজীর ন্যায় ভূমিতে কোন প্রকার সার না দিলে কোন ক্ষতি হয় না। তবে পুরাতন খৈলের সার দিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। খৈলের সার পুরাতন হওয়াই আবশ্যক। টাট্‌কা সার দিলে তাহার ঝাঁজে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে। আর এস্থলে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, যে গাছের অধিক তেজ হয় সে গাছে ফলন অধিক হয় না। গাছের তেজ যাহাতে অধিক না হয় তদ্‌পক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বিঘা করা পাঁচ মণ খৈল সার দিলেই যথেষ্ট হইবে। যে বৎসর বৃষ্টি ভালরূপ না হয় সে বৎসর পৌষ মাসে একবার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়। ক্ষেতে গাছ রাখিলে এক বৎসর ফল লাভ করা যাইতে পারে। সুতরাং পৌষ মাসে যে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা লিখিত হইল তাহা দ্বিতীয় বৎসরের পৌষ মাস জানিতে হইবে। কেহ যদি বেগুণ জমিতে অন্য কোন প্রকার চাষ করিতে ইচ্ছা করেন তবে উহা এক বৎসর রাখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যে সময় অন্য কোন চাষের সময় উপস্থিত হয়, তখন উহা কাটিয়া স্বতন্ত্র আবাদ করিলেই চলিতে পারে।

ফলন—কুলি বেগুণের গাছ না কাটিয়া ফেলিলে বৎসরের সকল সময় যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। ইহার যেমন ফলন আর কোন জাতি বেগুণের সেরূপ ফলন হয় না। গাছে এত ফল ফলিয়া থাকে যে প্রতি দিন তুলিয়া শেষ করা যায় না। বৈশাখ মাস হইতে বেগুণ ফলিতে আরম্ভ হয়। নূতন গাছে বেগুণ ধরিতে আরম্ভ হইলে প্রথম এক সপ্তাহ অল্প পরিমাণে ফলিয়া থাকে, তাহার পর ক্রমে ক্রমে এত ফলিতে থাকে যে চাষীদের ক্রমেই লাভ বৃদ্ধি হয়। বর্ষা কালে যে সময় অধিক বৃষ্টি হইতে থাকে সেই সময় বৃষ্টির জলে ফুল পচিয়া যায় তজ্জন্য অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় অন্যান্য সময় অপেক্ষা ফলন কিছু কম হয়। নতুবা সকল সময়েই অধিক ফলন হইয়া থাকে। এমন কি গড়পড়্‌তা প্রতিদিন তিন মণ বেগুণ গাছ হইতে তুলিতে পারা যায়। মনে কর খুব কম অর্থাৎ আদ পয়সা হিসাবেও প্রত্যেক সেরের দর হইলে এক বিঘা ভূমি হইতে প্রতিদিন ৸৶০ আনার বেগুণ বিক্রয় হইতে পারে। এক বিঘা জমিতে কুলি বেগুণের চাষ করিলে যেরূপ খরচ পড়ে নিম্নে তাহার একটী হিসাব প্রদর্শিত হইল।

ব্যয়।

এক বিঘা জমির খাজনা	১১৲
জল দেওয়া, কোদলান পাইট ইত্যাদি বাবদ খরচ	১০৲
প্রতিদিন বেগুন বিক্রয় ও সর্ব্বদা ক্ষেত তত্ত্বাবধান জন্য একটী লোকের ৭॥০ টাকা হিসাবে এক বৎসরের বেতন	৯০৲
খৈল পাঁচ মণ ১৲ হিসাবে	৫৲
মোট খরচ	১১৬৲
প্রতি দিন তিন মণ বেগুণের ফিঃ সের ৲২॥০ হিঃ ...	৸৶০

উপরি যে হিসাব দেখান হইল, তাহা কলিকাতার পক্ষে। মফঃস্বলে চাষ করিলে উহার ব্যয় বিস্তর কম হইবে। তথায় জমির খাজনা এবং লোকের বেতন প্রভৃতি খরচ অতি অল্প সুতরাং অল্প খরচে অধিক ফসল পাওয়া যাইবে। আজ কাল বেগুণের যেরূপ দর, অর্দ্ধ পয়সা সের প্রায়ই পাওয়া যায় না। সুতরাং উহার চাষে লাভ অধিক ভিন্ন অল্প হইবার সম্ভব নাই। কুলি বেগুনের বিশেষ গুণ এই যে উহা নিত্য ব্যবহার্য্য অথচ ফলন

অধিক এবং পাইট সামান্য। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী দুই চারিটী গাছ থাকিলে তদ্বারা নিত্য ব্যাবহার্য্য তরকারীর কাজ চলিতে পারে।

বীজরক্ষা———যে গাছ ভালরূপ তেজাল সেই গাছের পরিপুষ্ট ফল বীজের জন্য রাখিতে হয়। বীজ ভাল হইলে তাহাতে যে গাছ হইবে সেই গাছে উত্তম বেগুন জন্মে। বীজ বেগুণ যতদিন পর্য্যন্ত সুন্দররূপ সুপক্ক না হয় ততদিন তাহা তোলা উচিত নহে। গাছে উহা উত্তমরূপ পাকিলে তখন তুলিয়া সেই বেগুন লম্বা ভাবে চিরিতে হইবে এবং তাহার মধ্যস্থ বীজাদি সমুদায় অংশ বাহির করিয়া জলে উত্তম করিয়া ধুইতে হইবে। বীজ এরূপভাবে ধুইতে হইবে উহার গাত্রে যেন অন্য কোন পদার্থ লাগিয়া না থাকে। অনন্তর উহা রৌদ্রে উত্তম করিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। যদি এক দিনের রৌদ্রে ভাল শুষ্ক না হয় তবে দুই তিন দিন শুষ্ক করিতে হইবে। এই শুষ্ক বীজ বোতল মধ্যে রাখিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপ বন্দ করিয়া দিতে হইবে। বোতলের মুখ ভাল করিয়া বন্দ না করিলে কীটাদি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজ সমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিবে। আমাদের দেশে অনেকেই বীজ কাপড়ে বাঁধিয়া রাখে কিন্তু তাহাতে উহা নষ্ট হইতে পারে; এজন্য বীজ রাখার পক্ষে বোতলই উত্তম। বোতলের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবেশ করিয়া উহার কোন প্রকার অপকার করিতে সমর্থ হয় না। যে কোন বীজ বর্ষাকালে দুই এক বার রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিলে ভাল হয়। বীজ যতই ভাল থাকে, গাছের পক্ষে ততই মঙ্গল।

কীটাদিনিবারণ———অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে বেগুণ ক্ষেতে পিপীলিকা এবং অন্যান্য কএক প্রকার কীটে বিস্তর অপকার করিয়া তুলে। এজন্য ঐ সকল উৎপাত উপস্থিত হইলেই তদ্‌সমুদায় নিবারণের চেষ্টা করা আবশ্যক। পিপীলিকা হইলে হরিদ্রা জলে গুলিয়া সেই স্থানে ঢালিয়া দিলে উহা নিবারিত হইয়া থাকে। আর এক প্রকার পোকা দেখা যায় তাহারা গাছে লাগিয়া উহার ডগা কাটিয়া ফেলে এইরূপ ডগা কাটিলে অন্যান্য জাতীয় বেগুণে অনিষ্ট হইয়া থাকে কিন্তু কুলিবেগুণের বিশেষ অপকার হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় এইরূপ ডগা কাটিলে গাছের

উপকার হইয়া থাকে। গাছের ডগা কাটিয়া ফেলিলে গাছ উপরদিকে অধিক বাড়িতে না পাইয়া চারিদিকে ডালপালা বাহির হইয়া উহা ঝাড়ল হইয়া উঠে। ঝাড়াল গাছে বেগুণ অধিক ফলিয়া থাকে। কেহ কেহ গাছে পোকা লাগিলে ছাই দিয়া থাকেন, কিন্তু ছাই সকল গাছের পক্ষে উপকারী নহে; কারণ উহার ঝাঁজে অনেক গাছ মরিয়া থাকে। যাহা না মরে ঝিনমরার ন্যায় হয়। এক বৎসর গাছ রাখিতে হইলে, গাছের যে যে ডাল শুষ্ক হইবে, তাহা কাটিয়া দেওয়া ভাল। কাঁচা ডাল যেন কাটা না হয়।

আদর্শ কৃষক।

বালক এবং স্ত্রীলোককে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যেমন দুষ্কর, বঙ্গদেশবাসীদিগকে কৃষি এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াও ততোধিক। যে উৎসাহ অনুসন্ধিৎসা এবং পরিশ্রম-কুশলতা থাকিলে কৃষি এবং বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়, বাঙ্গালীর তাহা নাই অথবা অত্যন্ত অভাব। বঙ্গদেশের প্রকৃতি হতভাগ্য বঙ্গবাসীকে কর্ম্মঠ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে দেয় না, সুতরাং কৃষি এবং বিজ্ঞানের ন্যায় কঠিন এবং আপাতঃ নীরস বিদ্যায় তাঁহারা মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে পারক হয়েন না। অনেকে বলিতে পারেন, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর এখনও কোটি কোটি মণ ধান্য উৎপন্ন হয়, এখনও বহুবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া অন্তর্বাণিজ্যের ও বহির্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে, কিন্তু কথাটী সত্য হইলেও তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষি শাস্ত্র শিক্ষার ফল বলা যায় না। বাঙ্গালী ইস্‌বরে, লাঙ্গল করে, কুদ্দাল পাড়ে সত্য; বাঙ্গালীর ছেলে মাঠে যাইয়া রৌদ্র ও জলে ধান্যক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করে সত্য; বঙ্গদেশের ভূমি স্বর্ণপ্রসূ এ কথাও অসত্য নহে—কিন্তু বাঙ্গালীর কেমন পোড়া কপাল যে তথাচ এ দেশের লোক খাইতে পায় না এবং ভাল করিয়া কৃষি-কার্য্য করিতে পারে না। কৃষি এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় বঙ্গবাসী অনেক দিন হইতে অবহেলা করিয়া আসিতেছেন, এখন তাহার বিষময় ফল তাহারা হাতে হাতে ভোগ করিতেছে। কিন্তু কৃষি এবং বিজ্ঞান শীঘ্র যে বাঙ্গালীর মনঃহরণ করিতে পারিবে এমত বোধ হয় না। এ দেশে এ সকল বিষয়ের

আদৌ চর্চ্চা নাই বলিলেই হয়। পণ্ডিতেরা এই প্রকার অনালোচিত বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কতকগুলি হাতে ধরিয়া দেখাইয়া দিতে হয়, কতক গুলি পড়াইয়া শিখাইতে হয়, কতক বা গল্প চ্ছলে শিক্ষা দিতে হয়। আমি অদ্য "আদর্শ কৃষক" প্রস্তাবে একজন কৃষকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্ত উপলক্ষে গল্প চ্ছলে দেখাইব যে কেমন করিয়া কৃষক হইতে হয় এবং কষ্ট সহ্য করিয়া কৃষি বিদ্যা শিক্ষা করিলে পরিণামে কি সুখময় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বহু দিন পূর্ব্বে ফরাসী দেশে দর্‌বোঁ নামে একটি পিতৃ মাতৃ হীন অনাথ দরিদ্র বালক বাস করিত। একটী ছোট ভাই ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। ছোট ভাইটী প্রত্যহ আট ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিত, কিন্তু দর্‌বোঁ ৫ টা বাজিলেই শয্যা ছাড়িত। উভয়ে কখন ভিক্ষা করিয়া কখন মজুরী করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিত; সামান্য আয়ে ভাল রকম গুজ্‌রান হইত না। দর্‌বোঁ ভিক্ষা ছাড়িয়া দিয়া মজুরী করিতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু প্রতিবেশীদিগের ধন ও মর্য্যাদা দেখিয়া তাঁহার মনে উচ্চাভিলাষের সঞ্চার হইতে লাগিল। দর্‌বোঁ কৃষকদিগের স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া কৃষক হইবার বাসনা করিল। কিন্তু তাঁহার মূলধন নাই, ভূমি নাই এবং কৃষিকার্য্যে জ্ঞান নাই; সুতরাং এক জন ভাল কৃষকের নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। তথায় শুনিল, কৃষি কার্য্য করিতে হইলে প্রথমে শ্রমকাতরতা পরিত্যাগ করা উচিত এবং প্রতিদিন সূর্য্যদোয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা আবশ্যক। দর্‌বোঁর ভ্রাতাকে দর্‌বোঁ বলিল "তুমি কল্য হইতে আমার সহিত এক সময়ে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা কর; তাহা হইলে প্রতিদিন তোমার ৩ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রতি চল্লিশ বৎসরে ৫ বৎসর সময় বৃদ্ধি পাইবে।" ছোট ভাই তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। উভয়ে এক ধনবান কৃষকের ভূমিতে মজুরী করে এবং তদ্দ্বারা যাহা কিছু পায় তাহাতেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে দেখিয়া শুনিয়া কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান লাভ করিল। কিন্তু কিছু লেখা পড়া না শিখিলে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে যে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না এবং হিসাবাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না, তাহা তাহাদের প্রতীত জন্মিল। সুতরাং উভয়ে অবকাশ মতে গ্রাম্য পাঠ-

শালায় কিছু কিছু বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। দর্‌বোঁ প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; তাঁহার ছোট ভ্রাতা 'পাস' হইতে পারিল না বটে, কিন্তু লেখা পড়া শিখিল। অনন্তর চাকুরী করিয়া মূলধন সংগ্রহের জন্য তাহারা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের ন্যায় ফরসী দেশে তখন চাকুরীর বাজার বড় গরম ছিল; সুতরাং শীঘ্র চাকুরী যুটিল না। দর্‌বোঁ বলিল "যখন যেমন, তখন তেমন" এই নীতি অবলম্বন করাই উচিত, এই ভাবিয়া উভয়ে এক রেলওয়ে ষ্টেশনে মুটের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। কিছু দিনের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভূমি খরিদ করত চাষ করা স্থির হইল। কখন উভয়ে খাটে এবং কখন দাঁড়াইয়া মজুরদিগকে খাটায়। রৌদ্র, জল, শিশির শীত, গ্রীষ্ম কিম্বা দুর্ব্বায়ু তাহারা মানে না এবং সম্মান অসম্মানের তাহারা ভয় রাখেনা। উভয়ে প্রাণপণে চাষের তদ্বির করে। প্রথম বৎসরে সামান্য, দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যম গোছ, তৃতীয় বৎসরে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইল। তাহা দেখিয়া একজন মহাজনী কৃষক বলিলেন "এই ভ্রাতা দ্বয়ের প্রচুর অর্থ নাই, আমার তাহা আছে; ইহাদের উত্তম ঘোড়া কিম্বা বলদ নাই, আমাদের তাহা আছে, আমার অস্ত্র শস্ত্রাদি ইহাদের অপেক্ষা অনেক উত্তম। অথচ আমার অপেক্ষা ইহাদের ফসল কিরূপে উৎকৃষ্ট হইল?" দর্‌বোঁ উত্তর দিল "মহাশয়! আপনি আপনার চাকরদিগকে মাঠে পাঠাইয়া দিয়া গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকেন; আমরা চাকরদিগের সঙ্গে মাঠে যাইয়া প্রাণপণে উভয়ে মজুরের মত খাটি এবং নিজের চক্ষু দ্বারা সকল বিষয় দেখি। তাহাতেই এরূপ হইয়াছে।" প্রশ্নকর্ত্তা উত্তরে সন্তুষ্ট হইল, তিনিও সেই দিন হইতে দর্‌বোঁর ন্যায় নিজে চাষের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহারও দ্বিগুণতর ফসল জন্মিল। এই সময়ে চাষে দর্‌বোঁর বার্ষিক আয় ১৪ শত টাকা হইয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রতি মাসের দুই সপ্তাহ চাকরীতে, ১ সপ্তাহ কৃষি বিজ্ঞানে এবং আর এক সপ্তাহ মজুরদের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন। দুই সপ্তাহ চাকরী করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন; ফসলের টাকা ঘরে জমা থাকে। পর বর্ষে ঐ টাকায় আর কিছু জমি ক্রয় করিয়া "ক্ষিশি"

নামক শস্য বিশেষের আবাদ করিলেন, তাহাতে ক্ষতি হইল। সুতরাং এই জমি বন্ধক রাখিয়া ক্ষতি পূরণের জন্য কিছু টাকা ঋণ করিলেন। পর বৎসরের ফসলে বিস্তর টাকা লাভ হওয়ায় ক্ষতি পূরণ হইয়া গেল। তখন তাঁহার বার্ষিক আয় ২ সহস্র টাকা। গৃহে প্রায় ১৫ শত টাকা মজুত রহিল। তন্মধ্যে সহস্র টাকায় ভারতবর্ষজাত গুড়ের কারবার মানস হওয়ায় ফারন খুলিলেন। ঐ কারবার ৩ বৎসর চলিয়া আর চলিল না। তখন লভ্যের টাকা হইতে আবার জমি খরিদ করিয়া চাষের কার্য্যে মনোযোগী হইলেন। এবারে বার্ষিক আয় সার্দ্ধ চারি সহস্র টাকা। কিছু টাকার সঙ্গতি হইয়াছে দেখিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু মাঠে মজুরের সহিত খাটিতে আলস্য প্রকাশ করিলেন না। পর বর্ষে পোষাকের ব্যবসা খুলিয়া ছোট ভাইকে তাহার কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে একটী যুদ্ধ বাধিয়া উঠায় পরিচ্ছদ ও পোষাক দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। এই সুযোগে দর্‌বোঁ ভ্রাতাদ্বয় ফরাসী দেশের মধ্যে বড় ধনী হইয়া উঠিলেন, অনেক টাকা লাভ হইল। তখন সহস্র সহস্র বিঘা জমির আবাদ ও লক্ষ লক্ষ মণ ফসল জন্মিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, একবিংশতি বৎসর মধ্যে দর্‌বোঁ ভ্রাতাদ্বয় ফরাসী দেশের কুবের বলিয়া পরিগণিত পইয়া উঠিলেন। এদিকে তাঁহারা সাধারণের হিতার্থে বিদ্যালয়, ধর্ম্ম-মন্দির, কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সমাজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করিয়া দিলেন। ছোট ভাইটী নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। ঐ দর্‌বোঁর পরিবারের এখন বার্ষিক আয় দুই কোটি টাকা। মূলে দর্‌বোঁ মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কবরের প্রস্তরের উপরে উজ্জল স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে "আদর্শ কৃষক"।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ফুল ও ফল এবং শস্যাদির উন্নতি করিবার উপায়।

(পূর্ব্বে প্রকাশিত ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

বীজ রোপণ প্রণালী—কৃষিকার্য্যের লাভালাভ বীজের উপর নির্ভর করিয়া, থাকে; বীজ যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট হইবে, ফসলও যে সেই পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। অনেক স্থলে বীজের দোষে যে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয় তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। আমাদের দেশে বীজ সম্বন্ধে লোকের তত দৃষ্টি নাই। চাষিরা বীজের ভাল মন্দের প্রতি ততটা মনোযোগ করে না। চাষে বীজের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। কৃষকের লাভালাভ বীজের মধ্যেই লাভালাভ নির্ভর করে। হাজার পরিশ্রমই কর, হাজার টাকাই খরচ কর বীজ ভাল না হইলে যে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না তাহা নহে, উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত নিয়মে চাষাদি না করিতে পারিলে উহা রোপণে কোন লাভ দেখা যায় না। কি প্রকার বীজ, রোপণের পক্ষে উপযুক্ত, কোন প্রকার বীজ কি নিয়মে উৎপন্ন করিতে হয় এবং কোন জাতীয় বীজ হইতে কি নিয়মে চারা বাহির করিতে হয় তদ্‌সমুদায় নিয়ম জানা না থাকিলে কোন উপকার হয় না। সময় ও মৃত্তিকার প্রকৃতি জানিয়া বীজ রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমাদের দেশীয় বীজাদি অতি সহজেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অনেক প্রকার বীজ আছে, তদ্‌সমুদায় এ দেশে ভালরূপ জন্মে না, যদিও বীজ এক প্রকার জন্মে, কিন্তু তাহাতে ফসল ভাল হয় না। কারণ দেশের জল বায়ু এবং মৃত্তিকাদির উপর বীজের অনেকটা ভাল মন্দ নির্ভর করে। এজন্য অনেক প্রকার বীজ বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। বীদেশীয় বীজের প্রকৃতি এদেশের অনেকেই অবগত নহেন, সুতরাং তাঁহারা চাষে অকৃতকার্য্য হইয়া হয় বীজের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন নতুবা চাষে ভগ্নোৎসাহ হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহাদিগের একবার চিন্তা করা উচিত, যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ

করা আবশ্যক। যে কোন বিষয়েই উচিত জ্ঞানের অভাব যে সুফলপ্রদ নহে, তাহা অনেকেই মনে করেন না। কৃষিকার্য্য একটী সামান্য কাজ নহে, এই কার্য্যে যে পরিমাণে জ্ঞান লইয়া প্রবেশ করা যায়, সেই পরিমাণে যে লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশে বর্ণজ্ঞানশূন্য সামান্য কৃষকদিগের হস্তেই কৃষিকার্য্যের অপমৃত্যু হইতেছে, তাহারা কৃষি সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান রাখে না। চির-প্রচলিত রীতিই তাহাদিগের একমাত্র শিক্ষাগুরু। কোন বিষয়ে নূতন উপায় প্রকাশ করিতে তাহাদের জড় মস্তিষ্ক সমর্থ নহে। এ জন্য এ দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি না হইয়া দিন দিন অধোগতি হইতেছে। বীজই যখন কৃষকের আশা ভরসার সম্বল তখন তদ্বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। হ্যালেট নির্ব্বাচিত বীজ নির্ব্বাচন প্রণালী এদেশে কৃষকেরা আদৌ অবগত নহে। আমরা পূর্ব্বেই তাহার বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে কি প্রণালীতে অঙ্কুর নির্গত করিতে হয় তদ্বিষয় প্রকাশ করাই এই প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

বীজের অবস্থা অনুসারে অঙ্কুরোৎপাদন নির্ণয় হইয়া থাকে। যে কোন বীজ রোপণের পূর্ব্বে সেই বীজের অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। কারণ বীজ ভাল হইলে তাহা শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। সচরাচর বীজ তিন অবস্থায় সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সম্পূর্ণ পরিপক্কের প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ পরিপক্কের মধ্যম অবস্থা, তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ পরিপক্কাবস্থা। এই অবস্থায় বীজ রোপিত হইলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। অপরিপক্কাবস্থায় বীজ হইতে যদিও অঙ্কুর নির্গত হয়, কিন্তু সে গাছের তত তেজ হয় না। অপরিপক্ক বীজে অধিক জল পাইলে তাহা পচিবার সম্ভব। মধ্যম অবস্থায় বীজ রোপিত হইলে চারা অপেক্ষাকৃত সতেজ হয়। ইহাতেও অধিক জল সহ্য হয় না। সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় বীজ রোপণ করিলে নিয়মিত সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে এবং গাছ সতেজ হয় ফসল উত্তম রূপ লাভ করা যায়। ফলতঃ বীজের পরিপক্কাবস্থাই যথার্থ রোপণের উপযোগী। বীজ সংগ্রহ সময়ে এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেহ কেহ বীজ অত্যন্ত পরিপক্কাবস্থায়

তুলিয়া থাকেন। অত্যন্ত অরিপক্ক বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু অধিক সময় লাগিয়া থাকে। সকল প্রকার বীজ এক নিয়মে অঙ্কুরিত হয় না। কোন কোন বীজ টাট্‌কা ভাল, এক বৎসর অতীত হইলে তাহা হইতে আর অঙ্কুর নির্গত হয় না। কপি, শালগম, গাজর প্রভৃতি শাক সবজী এবং র‍্যাষ্টার, হার্টসইজ প্রভৃতি জেড়ুয়া ফুলের বীজ এক বৎসর অতীত হইলে আর অঙ্কুর বাহির হয় না। আবার কতক গুলি বীজ আছে তাহা অধিক পুরাতন হইলেই উত্তম রূপ অঙ্কুস্থিতি হইয়া থাকে। আবার কতকগুলি বীজ এরূপ আছে যে তদ্‌সমুদায় জলে না ভিজাইয়া রপণ করিলে চলিতে পারে। কোন কোন জাতীয় বীজ শীতল জলে ভিজাইতে হয়। সকল বীজের প্রকৃতি একরূপ নহে, সুতরাং তাহাদিগের প্রকৃতি অনুসারে ভিজাইয়া রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুর বাহির হইতে দেখা যায়। যে সকল বীজের আবরণ কঠিন, তদ্‌সমুদায় জলে ভিজাইবার ব্যবস্থা করা উচিত, উহা না ভিজাইয়া রোপণ করিলে অঙ্কুর হইতে অধিক সময় অপেক্ষা করে। এমন কি অনেক প্রকার বীজ অল্প গরম জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটা কথা জানা আবশ্যক, যে সকল বীজের ছাল অত্যন্ত কঠিন, তদ্‌সমদায় উত্তমরূপ ভিজাইয়া রোপণ করিতে হয়। জল ও উত্তাপে বীজের আবরণ ভেদ করিয়া দেয়, সুতরাং অল্প গরম জলে উহা ভিজাইয়া রোপণ করিলে অঙ্কুরোৎপাদনের সহায়তা করিয়া থাকে। এই সকল নিয়ম অনেকে আদৌ অবগত নহেন। এজন্য অনেকেই অঙ্কুর বাহির করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বীজ বপনের পূর্ব্বে বীজ পরীক্ষা করা উচিত; কারণ যে বীজ লইয়া চাষ করিতে হইবে, সেই বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি আছে কি না তাহা দেখিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে প্রায়ই বিফল হওয়া যায় না। বীজ ভাঙ্গিয়া দেখা উচিত, যে বীজের মধ্যে শস্যের অবস্থা ভাল থাকে তাহার অঙ্কুর জন্মশক্তি নষ্ট হয় নাই মনে করিতে হইবে, বীজের মধ্যস্থ শস্য বিকৃত হইলে উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে জানিতে হইবে। এইরূপ বিকৃত অবস্থার বীজ রোপণ করিলে কোন ফল হয় না। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদের বীজের আবরণ ত্বক এত কঠিন যে তাহা ভেদ করিয়া অঙ্কুর

নির্গত হইতে অধিক দিন সময় অপেক্ষা করে, এজন্য তাহাতে নিয়মিত-রূপ জল ও রৌদ্র পাওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কঠিনত্বক নরম হইলে অঙ্কুর নির্গমের সহায়তা করে। যে সকল বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না তদ্‌সমুদায় ঈষৎ উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রোপণ করিলেও শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। কোন কোন বীজ ভিজাইয়া রোপণ করিলে উহা পচিয়া যায়। বীজের ঠিক প্রভৃতি নির্ণয় করা বড় কঠিন।

কতকগুলি বীজ এরূপ আছে, তাহা রোপণ করার পর সমুদায় ভূমি খড় দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া তাহার উপর জল দিতে হয়। এরূপ ভাবে ঢাকিয়া রাখায় কারণ, প্রখর রৌদ্রে বীজ শুষ্ক করিতে পারে না, খড়ের উপরিকার জল ক্রমে ক্রমে বীজ ভিজাইতে থাকে। বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির করিতে হইলে কোন্ কোন্ জাতীয় বীজের সহিত জলের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা জানা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন কোন বীজে অল্প পরিমাণ, কোন কোন বীজে অধিক পরিমাণ জল দিতে হয়, জল দেওয়ার ত্রুটি হইলে ঐ সকল বীজ অঙ্কুরিতে হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। শীতকালে অনেক প্রকার বীজ দুই তিন দিন ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে বীজ না ভিজাইলেও যে সহজে অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহার কারণ ঐ সময়ে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আর্দ্র মৃত্তিকায় বীজ বুনিলে উহা অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় না। শীতকালে যদি বৃষ্টি হয় না কিন্তু রাত্রিকালে প্রচুর শিশির পড়িয়া অঙ্কুর নির্গমের সহায়তা করিয়া থাকে। অধিকাংশ বীজ অঙ্কুরিত হইবার এক একটী নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ে বীজ রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত নির্গত হয়। সময় অতীত করিয়া বীজ বুনিলে অনেক সময় অঙ্কুর বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে। ফল কথা ঠিক বুঝিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে, সহজেই কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়।

(ক্রমশঃ।)

বাণিজ্য ও কৃষি।

১

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ"—
রাখ লিখে নাম দুটি জলদ অক্ষরে।
স্বাধীন মানস বৃত্তি-হৃদয়ের দৃঢ় ভিত্তি ;—
পরাধীন—বহ্নি মাঝে আহুতি কেন রে।

২

পুত্র হয়ে কমলার, স্বর্ণ পেয়ে অধিকার :—
তুচ্ছ ভস্ম জ্ঞান করি, ফেলি দিয়া দূরে ;
অন্ন লাগি হাহাকার, করিতেছ অনিবার ;
বহিছ পরের ভার অম্লান অন্তরে।

৩

কি আশ্চর্য্য অনুরক্তি গেছে কি জীবনী শক্তি ?
দাসত্বে বাঁধিলে দেহ আজীবন তরে ?
ধন্যরে আর্য্যের জাতি ভৃত্যের আচার নীতি,
ধন্য শিক্ষা করিয়াছ ধরণী মাঝারে !

৪

শ্রাবণের ধারামত বাক্যবাণ শত শত,
তদ্‌পরে পদাঘাত বক্ষের উপরে।
হইতেছে অবিরত নাহি তাহে দৃক্‌পাত
ভৃগু পদ চিহ্ন মত বক্ষ আছে ধরে !

৫

চমৎকার সহিষ্ণুতা চমৎকার একাগ্রতা
চমৎকার সর্ব্বস্বান্তকারী শিক্ষা ফল।

কাপুরুষ, চাটুকার, ভারত কলঙ্ক ছার,
লজ্জাহীন, হংসকুল নাশক, দুর্ব্বল।

৬

ভৃত্য ভাব এত কিরে তোদের নয়ন'পরে
দেখিতে সুন্দর ওরে কুলাঙ্গারগণ?
ভাব দেখি একবার, কি ছিলে কি হলে আর?
অন্নাভাবে করিতেছ অশ্রু বিসর্জ্জন!

৭

বৈদেশিক মহাজন ফরাসিস্, জরমণ,
নীলকর চা-কর যে কৃষকের দল,
কত মতে করি যত্ন তোমাদের গৃহ রত্ন
লুটিছে, করিছে পুনঃ বক্ষে পদাঘাৎ!

৮

ভারত প্রসূত যত অমূল্য রতন খাত
লয়ে ভোগে ইন্দ্র সুখ, দেখ আঁখি খুলে।
তোমরাই কিনা বল কমলার পুত্র হয়ে
পুড়িছ নিয়ত বসি দুর্ভিক্ষ অনলে।

৯

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ"
রাখ লিখে নাম দুটী জলদ অক্ষরে
বাণিজ্যে কি না করিল—বৃটিস্ জাতীর দল।
আসি স্বর্গসম, ভূমি ভারত ভিতরে।

১০

কোথা কুমারীকা পার লঙ্কেশের অধিকার
কোথা হিমালয় গিরি রাজার ভবন,
কোথা নদ ব্রহ্মপুত্র কোথায় রঞ্জিত ছত্র;
স্থাপিল বিশাল রাজ্য ভবে অতুলন।

১১

বাণিজ্য কৃষির কাযে, কমলা সদা বিরাজে,
করে স্বাধীন ভাব চিত্তে উত্তেজন।
সেই উত্তেজনাবলে অধীনতা যায় চলে
অধিকারে হৃদিমাঝে সন্তোষ রতন।

১২

সুধার সন্তোষবলে হৃদি বিকশিত হ'লে,
বিকাশিত হৃদি আভা, জ্ঞান দিকে ধায়।
হৃদয়ের আভা পেয়ে জ্ঞান আলোকিত হ'য়ে
উন্নতি সোপান প'রে ক্রমে অরো হয়।

১৩

দাসবৃত্তি দুঃখময় সব বিপরীত হয়
দেহ অন্ত অবসাদ করে একবারে।
বিকাশ না পায় হৃদি নিয়তই মুখ মুদি
কলিকায় শুষ্ক হয়ে যায় চির তরে।

১৪

অন্তরে বিমর্ষ হয় অভাব, যন্ত্রণা, ভয়
হৃদয় নিস্তেজকারী আনে ভাব সব
নিস্তেজ হৃদয় হ'লে নীচ কার্য্য মন মিলে
আনে কুটিলতা হিংসা নারকীয় ভাব।

১৫

ত্যাজিয়া কুক্কুর বৃত্তি স্থাপরে বঙ্গেতেকীর্ত্তি।
হল, বিদা, হাতে লও করিয়া যতন।
লও পণ্য ভার শিরে ভ্রম প্রতি দ্বারে দ্বারে
হবে—রে উন্নতি হবে না হবে পতন।

১৬

খৃষ্ট, জৈন, মহম্মদি, ইহুদি প্রভৃতি
দাসবৃত্তি প্রিয় এত নহে কোন জাতি

তোমরাই বঙ্গ ভ্রাতা তুলেছ বিজয় পতা
হিমালয় উচ্চ শিরে ভৃত্য ভাবে মাতি।

১৭

ভারতের অণুমাত্র সুবর্ণ মণ্ডিত গাত্র
না চিনিয়া পর হাতে করি সমর্পণ,
হা অন্ন, হা অন্ন করে, ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে ;
নিজ পঞ্জি পরে দিয়া দৈবজ্ঞ যেমন।

১৮

কর্ষরে ভারত মৃত্তি নিজ হস্তে করে,
লওরে ভারত জাত পণ্য ভার শিরে,
গেল বঙ্গ সিন্ধু গর্ভে, আর যে থাকে না,
বিদ্যার পবিত্র ফল, দাসত্বে বাসনা !

১৯

যাও উলঙ্ঘিয়া সিন্ধু পর্ব্বত কন্দর
দৃঢ়তা সহিষ্ণু'পরে করিয়া নির্ভর।
হবে রে উন্নতি হবে, না হবে পতন,
কর'না কলঙ্ক পতা আর উত্তোলন।

শ্রীবিভুপ্রসন্ন বসু।

দেবানন্দপুর

ময়দা।

চাউল বঙ্গবাসীর প্রধান খাদ্য, কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের—সমগ্র পৃথিবীর—লোক সংখ্যা করিয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, চাউল অপেক্ষা ময়দার প্রয়োজনীয়তা এবং উপাদেয়তা অত্যন্ত অধিক। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজও পর্য্যন্ত জগতের যে কিছু উন্নতি, যে কিছু সভ্যতা হইয়াছে, তাহা ময়দাভোজীদিগের দ্বারা হইয়াছে, চাউলভোজীদিগের দ্বারা হয় নাই। চাউল ভোজীদিগের "ভেতো" নাম আজও ঘুচে নাই, সে দুরপনেয় কলঙ্ক আর কখন ঘুচিবে কি না, সন্দেহ। সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণশক্তি এখনও ময়দা বা আট্টাভোজীদিগের করতলগত রহিয়াছে ; চাউলভোজী মহাশয়েরা যাহা ধারণ করিয়া আছেন, তাহা পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক মাত্র।! যে শক্তি ইউরোপীয় রাজনীতির কূট কৌশলকে পরাস্ত করিয়া আজিও সগর্ব্বে আরব্য, পারস্য, তুরস্ক. তাতার; মিসর, এসিয়ামাইনর, আফ্‌গানিস্থান এবং ভারতের কিয়দংশে অটলভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, তাহা ময়দার নিকট ঋণী ; যে ইউরোপীয় সভ্যতা সূর্য্যতলের সমগ্র স্থানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাও ময়দার মহিমায় মহিমান্বিত। যে রাজপুতবংশ প্রজাপ্রতাপান্বিত আকবর সম্রাটের যাবনিক গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে শিক জাতি চিলিয়ানালার মহা সমরে সমর বিশারদ ইংরাজের শতঘ্নীকে বালকের ক্রীড়নক বোধে তুচ্ছ করিয়াছিল, যে হিন্দু জাতি মহাবীর দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার বাদসাহের আসুরিক শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহাও ময়দার নিকট ঋণী ; আর সে দিন যে কাবুল জাতি লাল মুখকে চারি বার হারাইয়া দিয়া অট্টহাস্যে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল তাহারাও ময়দা ভোজী। সুতরাং আমি ময়দার মহিমা বর্ণনা করিব।

আজিকালি ইউরোপে ভারতবর্ষীয় ময়দার বড় আদর হইতে আরম্ভ হইয়াছে; গুণে ও মূল্যে কালিফর্ণিয়ার ময়দা হইতে ভারতবর্ষীয় ময়দা কম নহে। ১৮৭২ অব্দ হইতে ৭৫অব্দ পর্য্যন্ত ভারত হইতে ২৫,৯৩,৫০০ মণ ময়দা ইউয়োপে রপ্তানী হইয়াছিল; কেবল মাত্র বোম্বে হইতে ঐ চারি বৎসরে ১০,৭১০,০০ মণ ময়দা রপ্তানী হইয়াছে। আজিও ইউরোপের সওদাগারেরা ভারতীয় গম অথবা ময়দার জন্য এদেশে অনেক টাকা পাঠাইরা দিতেছেন, সুতরাং ময়দা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে গম হইতে ময়দা উৎপন্ন হয়, সুতরাং গমের কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আচার্য্য বেক সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক উত্তম প্রস্তাব লিখিয়া গিয়াছেন। (১)।

এদেশের কৃষকেরা যে জমিতে ধান্য, মশুর, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ করে, প্রায় সেই জমিতেই গম রোপণ করিয়া থাকে। কৃষিবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, তাহা ভাল নহে। যে জমিতে একবার কিম্বা দুইবার যব রোপণ করা হইয়াছে, গমের পক্ষে তাহাই উৎকৃষ্ট ভূমি। একেবারে পতিত জমিও গমের পক্ষে উত্তম নহে। জমিতে প্রথম লাঙ্গল দিয়া তাহার উপরে গরম জল ঢালিয়া দিতে হইবে, ঐ জলের সহিত কারবণিক আসিড থাকিলে ভাল হয়। এক কাঠা ভূমিতে অর্দ্ধ মণ পরিমিত অত্যুষ্ণ জল ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। জল ফেলিবার ১০ দিন পরে ভূমিতে সার দিতে হইবে, এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ ১ মণ ৩৫ সের সার দিলে যথেষ্ট হয়। আচার্য্য জনষ্টোন, হম্‌ফ্, স্প্রেঞ্জেন, মশুর বসিংগ্ এবং টমাস্ ওবে সাহেবগণ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকারিতা লাভ করিয়াছিলেন। রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটির মাসিক পত্রিকার ৭ম খণ্ডে

(১) "Vide Dr, Lewis C, Beck's S" Bread-stuffs of the united-States of America. The remarks that follow on the caltivation of wheat are for the most part quotations from this Book.

ওবে সাহেবের লিখিত গম সম্বন্ধে একটী সুন্দর প্রবন্ধ আছে। সাইরেনসেষ্টার কলেজের ছাত্রেরা তাঁহার মতাবলম্বন করিয়া গম রোপণ করিতেন। এই ছাত্রদিগের সমিতির এক রিপোর্টে লেখা আছে "ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা গোবিষ্ঠা ও গোমূত্র জমির উপর ছড়াইয়া দিয়া সারের কার্য্য সমাধা করে, আমরাও তাহা পরীক্ষা করিয়া ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। গোবিষ্ঠা যত পুরাতন হয় ততই ভাল। বিলাতের গরুর বিষ্ঠা অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় গরুর বিষ্ঠা অধিক উপাদেয়।"

ইউরোপে জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত গমের আবাদ চলে, ভারতে তাহা হয় না। এখানে পৌষ মাসে কৃষকেরা গম রোপণ করিয়া থাকে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে অথবা বৈশাখের শেষে তাহা জমি হইতে উঠাইয়া লয়। জুলাই মাসে কোন কোন স্থানের কৃষকেরা গম উঠাইয়া থাকে; অক্টোবর মাসে কলাই ও মটরের আবাদ হইয়া গেলে, পুনরায় গম ও তুলার চাস আরম্ভ হয়। কিন্তু এ প্রথাটী কেবল কঙ্কাণ প্রদেশে প্রচলিত আছে।——সাহেবেরা বলেন, জমিতে যে সকল গুণ থাকিলে, গমের আবাদ উত্তমরূপে হইতে পারে, ভারতের জমিতে তাহা নাই। ভূমিতে চূণ, য়্যামোনিয়া, ম্যাগ্‌নিশিয়া, সোডা থাকা চাই। নাইট্রোজন ও ফস্‌ফরাশ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। গমের ভূমির জন্য যে কোন সার করা হয়, তাহাতে শতকরা নিম্ন লিখিত দ্রব্যাদির মিশ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

সিলিকা	২.২৮
ফস্ফরিক আসিড	৪৫.৭৩
সলফিউরিক য়্যাসিড	০.৩২
চূণ	২,০৬
ম্যাগ্‌নিশিয়া	১০.৯৪
লৌহ (Peroxide)	২.০৪
পোটাশ	৩২.২৪
সোডা	৪.০৬
সোডিয়ম ক্লোরাইড	০.২৭

এ সকল দ্রব্য যাঁহাদের সহজে মিলিবার উপায় নাই, তাঁহারা লবণ ও লৌহচূর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ডাক্তার বোয়ে (২) একবার আট বৎসর ব্যাপিয়া গমের চাষ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতি একারে ২০ টন করিয়া ফসল ফলিয়া ছিল। তিনি বলেন যে, জমীর উপরে বালুকা, নিম্নে কিঞ্চিৎ প্রস্তর মিশ্রিত কর্দ্দম এবং তাহার নীচে জল থাকে, সেই জমিই উত্তম, বোয়ে সাহেব ১৮৪৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আবাদ করিয়া ১২ই আগষ্ট তারিখে গম কাটিয়া ছিলেন, ২০এ আগষ্ট তারিখে ঐ গম তাঁহার গৃহে গিয়াছিল। প্রত্যেক একারে তিনি ৬২ বুশেল ফসল প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। সাহেব বলেন "ইহাতে উত্তম শস্য হইয়াছিল এবং তৃণের আকার ৪২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।" বোয়ে সাহেবের মতে এক প্রকার ভূমিতে নিম্ন লিখিত পরিমাণে দ্রব্য পাওয়া যায়।

দ্রব্যের নাম	পাউণ্ড দরে ওজন।
গম শস্য	২,৬০৪
খোসা ভূষি	৪০১ ১/২
(খড়) তৃণ	২,৭৭৫ ৩/৪

এক বিঘা ভূমিতে গমের আবাদ করিতে হইলে ১২ ইঞ্চি পরিমাণে ভূমি গভীর করা উচিত। এক একার ভূমিতে সমুদয় খরচ বাদে বিলাতে

(2) Dr. Way gives the result of sixty two analysis of the ash of wheat, from as many samples of that grain, mostly grown on different soils and under different circumstances. The report gives the quantity of wheat per acre, the weight of straw cut near the ground, and also that of the chaff. These researches show that from 93 to 150 L.B S of soluble silica are required to form an acre of wheat Vida Ansted's Elementary Geology, P. 343.

১৩ বুশেল ফসল লাভ থাকে। বিলাতের লোকেরা চাষের জন্য উত্তম উত্তম পুস্তক পড়ে, আমাদের দেশের লোকেরা তাহা করে না। আমাদের কেতাব কিনিবার খরচাটা বাঁচিয়া যাইতে পারে। অনেকে গম রোপণ করিয়া তাহাতে "মই" দেয়, তাহা ভাল নহে। রোপণ করিবার পরে, জমির উপরে বালুকা ও দেশীয় কয়লার (কাষ্ঠ দগ্ধ কয়লার) চূর্ণ সামান্য মাত্রায় দিতে পারিলে বড় উত্তম হয়।

মধ্য ভারতবর্ষে জেলালিয়া, কুটিয়া, সোয়ারিয়া, বংগুশীয়া এবং পিশি এই পাঁচ প্রকার গমের চাষ হয়। জেলালিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গম। সোয়ারিয়াকে কেহ কেহ দাউদখানি কহিয়া থাকে। কুটিয়া শ্বেতবর্ণ এবং জেলালিয়া গাঢ় লোহিত বর্ণ ধারণ করে। মধ্য ভারতে গমের দর নিম্নে দেওয়া গেল। কেবল মাত্র দুই প্রকার গমের দর লিখিত হইতেছে।

তালিকা।

(১৮৬৫ অব্দ)

	জেলালিয়া	সোয়ারিয়া
হোসেঙ্গাবাদ	১৩৲	১১৲
সোহাগপুর	১০৲	৯॥০
সিউনী	১৪॥০	১৩॥০
হর্দুই	১৬৲	১৩॥০

মধ্য ভারতে রবুর, মোদা, খইরি এবং মুকলা জমিতেই উত্তম রূপে গমের আবাদ হয়। কমলপাসা, বেরু এবং উমুলপালা নামে তিন প্রকার কীট গম বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট করে। সংপ্রতি (Insect powder.) নামে যে ঔষধ উঠিয়াছে, তাহাতে এই পোকা নষ্ট হইয়া যায় (৩)

(3) Vide Ansted's Elementary Geology, P. 343.

কলিকাতা সন্নিহিত বরাহনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিত মান্যবর ওয়াল্‌ডি সাহেব পরগণা রাজোয়ারা, পরগণা হোশেঙ্গাবাদ এবং পরগণা চেয়োবাল হইতে একবার মৃত্তিকা আনাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন তাপ্তীনদীর নিকটস্থ স্থান সমূহ গম আবাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। থোকার ভূমিকে তিনি চিরযৌবনা বলিয়াছেন। বঙ্গ দেশের মধ্যে বীরভূম এবং বাঁকুড়া গমের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। (৪)

শ্রীরাঃ——

ফুল ও ফল এবং শস্যাদির উন্নতি করিবার উপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৪২ পৃষ্ঠার পর)

অসময়ে বীজ বুনিলে চারা বাহির হইতে যেমন কিছু বিলম্ব হয়, সেই চারা বাঁচাইয়া ফসল লইতেও সেইরূপ যত্ন করিতে হয়। যে কোন বীজ উপযুক্ত সময়ে রোপণ করিলে অঙ্কুর নির্গত হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। সময়ের অগ্র পশ্চাতে যে, অঙ্কুর নির্গত হইতে বিলম্ব হইয়া থাকে, তাহা জানা আবশ্যক। আমরা দেখিয়া থাকি অনেকে জেড়ুয়া ফুল ও কপি প্রভৃতি বিদেশীয় ফসল, সকল বৎসর সমান রূপে অঙ্কুরিত করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদিগকে অবগত করান। আমরা কারণ অনুসন্ধানে দেখিয়াছি, কেহ হয় ত মাটির উত্তমরূপ পাইট করিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত সময়ে রোপণাদি করেন নাই, কেহ হয় ত আবার মাটির উত্তম পাইট করিয়াছেন বটে কিন্তু সময় অতীত করিয়া বীজ রোপণ করিয়া বিফল যত্ন হইয়াছেন। কপি প্রভৃতির বীজ প্রথমে যখন এদেশে আসিয়া থাকে, সেই সময় যদি বীজ গুণিয়া একশতটী বীজ রোপণ করা যায়, তাহা হইলে প্রায় সমুদায়ই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে,

(4) Vide Mr. D, Waldse's (of the Baranagare chemical Works' near Calcutta) "Analysis of the Regur, or Black soil of the Deccan and The Principles of Rational Agriculturet applied to India aad its Staple products," By C, C, Schrottky, chap II, P, 228.

বীজ যতই এদেশে রাখা হয়, শীতল বাতাস প্রভৃতি নানা কারণে উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আইসে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, শিশি কিম্বা বোতল মধ্যে অধিক পরিমাণে বীজ রাখিলে প্রজনন শক্তি তত শীঘ্র নষ্ট হয় না, অধিক বীজ এক সঙ্গে থাকাতে শিশি কিম্বা বোতল মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং সমুদায় বীজ এক প্রকার গরমে থাকে। আর বীজের ভাগ অল্প হইলে, তাহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিয়া উহার তাপ নষ্ট করিয়া দেয়। বীজের স্বাভাবিক তাপ নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নহে। এ জন্য মধ্যে মধ্যে বীজ রৌদ্রে দিয়া গরম করা আবশ্যক। এদেশে কপি প্রভৃতি তরকারীর বীজ প্রায়ই বর্ষা শেষে অর্থাৎ ভাদ্র ও আশ্বিন মাস হইতে রোপণ আরম্ভ হইয়া থাকে।

ঐ সকল বীজ প্রথমে রোপিত হইলে যত শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, বিলম্বে রোপণ করিলে অঙ্কুর হইতে ক্রমেই বিলম্ব হইয়া উঠে। এদেশে কপি সম্বন্ধে একটী দোষ দেখা যায়, বর্ষাকালের শেষে বীজ রোপণ না করিলে শীঘ্র ফসল পাওয়া যায় না। এই সময় আবাদে চারা প্রায়ই লম্বা আকারে হইয়া থাকে, তজ্জন্য এক স্থানে চারা বড় হইতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ চারা বড় লম্বা হইলে গাছ হেলিয়া পড়ে, এবং সে চারা বাঁচান বড় কঠিন। এজন্য মধ্যে মধ্যে হাপোর হইতে চারা তুলিয়া পুঁতিতে হয়। কিন্তু একটু শীত পড়িলে যে চারা জন্মে তাহা প্রায় সে রূপ আকারে হয় না। প্রথম হইতেই উহা খর্ব্বকার হইয়া রীতিমত আকারে হইয়া থাকে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, শীতের সময় কপি বীজ বিশেষ যত্ন না করিয়া কেবল মাত্র মাটিতে ছড়াইয়া দিলেই উত্তম রূপ গাছ হইয়া থাকে। কিন্তু শীতের সময় কপি চাষ করিলে উহা খাদ্যের উপযুক্ত হইতে প্রায়ই গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মের সময় কপি তত সুখাদ্য হয় না এবং কীটাদি জন্মিয়া ফসল নষ্ট করিয়া দেয়। এজন্য এদেশে বর্ষান্তে কপির চাষ করা আবশ্যক। জল বায়ু এবং উত্তাপাদির উপর চাষের যে অনেকটা উন্নতি নির্ভর করে, তাহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। কপি যদিও ভিন্ন দেশীয় ফসল কিন্তু যত্ন করিলে এ

দেশেও উহার আকারগত বিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে। যে কোন চাষে যে পরিমাণে পাইট করা হইয়া থাকে, তাহাতে ফসলও সেই পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। আমরা দেখিয়াছি পুষ্করিণীর মাটি তুলিয়া ক্ষেতে দিয়া সেই মাটিতে যে সকল ফসল চাষ করা যায়, তদ্‌সমুদায় প্রায়ই বড় আকারের হইয়া থাকে। পাইটের গুণেও অনেক কৃষক অসময়ে নানাবিধ ফসল উৎপন্ন করিতে পারে। যে কোন ফসল অসময়ে উৎপাদন করায় কৃষকের পারদর্শিতা এবং সেই সঙ্গে লাভও যথেষ্ট হইতে দেখা যায়। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা এইরূপ পারদর্শিতানুসারে বিশেষরূপ ফল লাভ করিয়া থাকে। ফলকথা কেবল মাত্র চাষ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে কখন সুন্দররূপ ফসল লাভ ঘটে না। কৃষকের কর্ত্তব্য চাষের প্রতি সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবেন। শস্যাদির উৎপন্নের হার অল্প এবং আকারগত অবনতি দেখিলে, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা নিবারণ চেষ্টা করা উচিত।

এক জমিতে প্রতি বৎসর একরূপ শস্যাদি আবাদ করিলে চাষে বিস্তর ক্ষতি হইতে দেখা যায়। কারণ ঐ শস্যের পুষ্টি উপযোগী পদার্থ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে। সুতরাং শস্যাদির পুষ্টি সাধনোপযোগী পদার্থের অভাবে ভালরূপ ফসল জন্মে না। এজন্য প্রতি বৎসর এক জমিতে একরূপ চাষ করা উচিত নহে। তবে যদি এক জমিতে প্রতি বৎস এক রূপ ফসলের আবাদ করিতে হয়, তবে প্রতি বৎসর একরূপ হিসাবে সার দিতে হইবে, তদ্দ্বারা যেন ঐ অভাব বিমোচিত হইতে পারে। সার সম্বন্ধে একটী নিয়ম জানা আবশ্যক, সকল ফসলের পক্ষে এক রূপ সার উপকারী নহে। যে শস্যের পক্ষে যে সার আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিয়া দিলে, অনেক উপকার হইতে পারে। ফুল ফল এবং শস্যাদির উন্নতি করিতে হইলে মাটির পাইট, সার প্রদান, জলসেচন এবং উপযুক্ত সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক স্থানের ভূমির উৎপন্নের হার কমিয়া আসিতেছে। কেনই যে শস্যাদির উৎপন্নের হার কমিয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে অনেকেই দৃষ্টি করেন না।

পূর্ব্বে দেশ মধ্যে যেরূপ পতিত জমী থাকিত এক্ষণে সেরূপ পতিত জমী দেখা যায় না। প্রতি বৎসর জমিতে চাষ না করিয়া মধ্যে মধ্যে উহা অনাবাদী রাখা উচিত। কারণ প্রতি বৎসর চাষ করিলে ভূমির উৎপাদন শক্তি হ্রাস হইয়া আইসে। ভূমিতে যে যে শক্তি থাকিলে শস্যাদির বৃদ্ধি সাধন করিতে পারে তাহার অভাব হইলে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল এবং উপযুক্ত আকার হইতে পারে না। অনেক চাষী সে বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন। কারণ চাষের লাভালাভ ফসলের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। উপযুক্ত পরিমাণ ফসল উৎপন্ন না হইলে কৃষকের পরিশ্রম, জমির খাজনা এবং চাষের ব্যয় কোন মতে পোষাইতে পারে না। এ জন্য যে কোন উপায়েই হউক ভূমির প্রজননশক্তি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করা কৃষকের আবশ্যক। ফুল ফল এবং শস্যাদির উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ ভূমিই সমুদায় লাভালাভ এবং শস্যাদির উন্নতি ও অবনতির এক মাত্র অবলম্বন। চাষের উন্নতি করিতে হইলে আর একটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা অবশ্যক, অনেক স্থানে দেখা যায় সেই দৃষ্টির অভাবে ফুল ফল এবং শস্যাদির শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া দিন দিন অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। এক জমিতে যেমন প্রতি বৎসর এক রূপ শস্য রোপন করিলে উৎপন্নের হার কমিয়া আইসে, সেই রূপ আবার ভূমির প্রকৃতি না জানিয়া অর্থাৎ কোন্ প্রকার মৃত্তিকায় কোন্ প্রকার ফুল ফল এবং শস্যাদি সুন্দর রূপ জন্মিতে পারে তাহা না জানিয়া এক প্রকার শস্যাদির উপযুক্ত ভূমিতে অন্য প্রকার শস্যাদি চাষ করিলে কখনই ভাল রূপ ফসল হইবে না। মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের পক্ষে যেমন নিয়ম দেখা যায়, এক রূপ খাদ্য সকলের দেহে সমান পুষ্টিজনক নহে সেইরূপ এক রকম মৃত্তিকা সকল প্রকার শস্যাদির পক্ষে সমান উপকারী হইতে পারে না, অনেকে তাহা বিবেচনা না করিয়া চাষে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকেন। কেবল মাত্র ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলেই চাষ করা হইল তাহা নহে, চাষের উন্নতি করিতে হইলে অনেক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। এক্ষণে যে সকল বৈজ্ঞানিক উপায় দ্বারা চাষাদির উন্নতি সাধিত হইতেছে, সেই সকল উপায় দেশ মধ্যে প্রচলিত

করিতে পারিলে এদেশ ফুল ফল এবং শস্যাদির বিস্তর উন্নতি সম্পাদন করিতে পারা যায়। আমাদের দেশে ঐ সকলের উন্নতি সাধন যেরূপ সহজ পৃথিবীর মধ্যে আর কোন দেশে সেরূপ সহজ উপায় দেখা যায় না। এদেশের ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, তাহাতে আবার জল বায়ু এবং উত্তাপাদির যেরূপ সুনিয়ম, অল্প মাত্র উন্নতি চেষ্টা করিলে দেশীয় কৃষকেরা কৃষি কার্য্যে যারপরনাই উন্নতি করিতে পারেন। কৃষির উন্নতি বলিলে দুইটী বিষয়ে কৃষকের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, অর্থাৎ উৎপন্নের হার বৃদ্ধি এবং আকারগত সৌষ্টব সাধন। অনেক প্রকার ফুল ও ফল দেখা যায় ফলন অধিক হইয়া থাকে কিন্তু আকার তত বড় হয় না। সাধারণ নিয়ম এই যে, ফলন বেশী হইলে প্রায়ই আকার ছোট হইয়া থাকে। কারণ একটী ডালে অধিক ফুল কিম্বা ফল হইলে সেই ডাল হইতে যে রস সঞ্চারিত হইয়া উহাদিগের দেহপোষণ করিয়া থাকে, অধিক ফুল এবং ফল হইলে সেই রস বহুভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেকের শরীর পোষণ করে। সুতরাং রসের অভাব নিবন্ধন সেইরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। কিন্তু একটী শাখায় যদি অল্প পরিমাণে ফুল কিম্বা ফল জন্মে তাহা হইলে সমুদায় রস তাহাতে সঞ্চারিত হইয়া পুষ্ট করিয়া তুলিতে পারে। এজন্য ফুল ও ফলের আকারগত উন্নতি করিতে হইলে এক ডালে অধিক পরিমাণে ফলিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু অনেকে মায়া করিয়া স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিতে সমর্থ হয়েন না। এই রূপ মায়াতে একটী মহৎ দোষ হইয়া থাকে। বিবেচনা কর কৃষক বা অন্য কোন চাষী যদি তাহা না ভাঙ্গিলেন, তবে সেই ক্ষুদ্র আকারের ফুল ও ফল হইতে অরম্ভ হইল এবং সেই ফুল ও ফল বীজ হইয়া আবার চাষের কাজ চলিতে লাগিল। সুতরাং ঐরূপ ক্ষুদ্রাকারের বীজ হইতে যে গাছ হইবে, তাহারও ফুল ফল যে ক্ষুদ্র আকারের হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

দারুচিনি বৃক্ষ।

(CINNAMON TREE.)

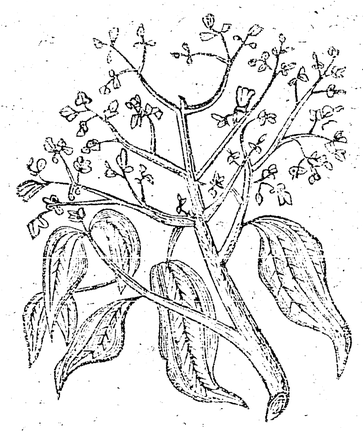

উপরিভাগে যে চিত্রটী প্রদর্শিত হইল, তাহা দারুচিনি বৃক্ষের একটী শাখা মাত্র। দারুচিনির বড় বড় গাছ হইয়া থাকে তেজপত্র আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছের ন্যায় দারুচিনিরও বৃহৎ আকারের গাছ হয়। দারুচিনি অতি প্রাচীন কাল হইতে এদেশে ব্যবহার হইতেছে, কিন্তু কোন্ সময় হইতে যে ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। তাহা নির্ণয় করা বড় কঠিন। দারুচিনি মসলা ও ঔষধ দুই কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। কি নিয়মে উহা ব্যবহার করিতে হয়, তাহা এদেশে সকলেই অবগত আছেন। দারুচিনির ত্বক অর্থাৎ ছাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে, বৎসর বৎসর প্রচুর দারুচিনি আমদানী হইয়া থাকে, তদ্‌সমুদায় সিংহল, জাবা, সুমাত্রা প্রভৃতি ভারত সাগরীয় দ্বীপ সমূহ হইতে আনীত হয়। বঙ্গদেশে দারুচিনির গাচ হইয়া থাকে কিন্তু এদেশে কেবল দারুচিনি

প্রস্তুত করে না। লোকে সখ করিয়া বাগানে দুই একটী গাছ রোপণ করিয়া থাকে। দারুচিনির জোড় ও গুটি কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। গুটি কলম অপেক্ষা জোড় কলমে সহজেই চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলমের নিয়ম এই যে, যে কোন গাছই হউক কলম বাঁধিলেই প্রায় চারা প্রস্তুত হয়। কলম বাঁধিবার নিয়ম জানা থাকিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই উহা প্রস্তুত করিতে পারেন। এদেশে কলমাদির গাছ সকল যত্নের সহিত প্রস্তুত করা হয় না। যত্ন করিয়া ঐ সকল গাছ রোপণ করিলে অনেক প্রকার মসলা এদেশে পাওয়া যাইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি এদেশে যে সকল মসলার গাছ রোপিত হইয়া থাকে, তদ্‌সমুদায় ভারত সাগরীয় দ্বীপজাত মসলার ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। এদেশে ঐ সকল চাষের কোন প্রকার উন্নতি চেষ্টা করা হয় না। চেষ্টা করিলে অনেকটা যে উপকার দেখা যায় তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দারুচিনির চারা কলম বাঁধিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। জোড় কলমই চারা প্রস্তুতের পক্ষে ভাল। কাবাবচিনির চারার সহিত দারুচিনির জোড় বাঁধিতে হয়। জোড় কলম বাঁধিবার পক্ষে একটী নিয়ম জানা আবশ্যক যে, যে কোন চারার সহিত মূল গাছের কলম বাঁধিতে হয়, তাহার প্রকৃতিগত যেন কতক মিল থাকা আবশ্যক। কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জাতীয় গাছের পরস্পর মিলন তত সহজ নহে। জোড় কলম বাঁধিবার পূর্ব্বে গাছের ডাল ঠিক করিয়া লইতে হয়, কারণ সকল ডাল কলমের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। সম্পূর্ণ পাকা কিম্বা নিতান্ত কচি ডালে সুন্দররূপ কলম হয় না। যে চারার সহিত কলম বাঁধিতে হইবে, তাহার অবস্থা মূল বৃক্ষের যে ডালে কলম বাঁধা হইবে তাহার সহিত মিল থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ চারার যত বয়স, যে ডালে কলম বাঁধিতে হইবে তাহারও সেই পরিমাণে বয়স হওয়া উচিত। দুইটী সম বয়স্কের যেমন সহজে মিলন হয়, পরস্পর অসমানের তত শীঘ্র মিলন হয় না। যদিও এক প্রকার মিলন হয় কিন্তু গুণের কিছু ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়। এজন্য সমান অবস্থাপন্ন ডাল ও চারার পরস্পর কলম বাঁধিতে হয়। কাবাবচিনির যে চারা লইয়া কলম বাঁধিতে হইবে, তাহা টবে রোপণ করা আবশ্যক।

কারণ চারা টবে না রাখিলে তাহা গাছের উপর তুলিয়া কলম বাঁধিবার অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। গাছের যে ডাল নধর, কোন প্রকার কীটাদি লাগে নাই কিম্বা ঝিমধরা গোছের নহে, সেই রূপ ডাল ঠিক করিয়া তাহার পাশে কাবাব চিনির টবটী স্থাপন করিতে হইবে। মাচা বাঁধিয়া যে টব রাখিতে হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই টব এরূপ উচ্চ ভাবে বসাইতে হইবে তদ্দ্বারা যেন চারার মাথা ঐ ডালের মাথার সহিত সম উচ্চ হয়। এই রূপ নিয়মে টব বসাইয়া তীক্ষ্ণধার ছুরী দ্বারা ডালের দশ আনা অংশ এবং চারার ছয় আনা অংশ কাটিয়া লইতে হইবে। উহা এরূপ ভাবে কাটিতে হইবে, তদ্দ্বারা যেন ছাল সমেত কিছু কাষ্ঠাংশ উঠিয়া আইসে। তদনন্তর কর্ত্তিত অংশ পরস্পর মিলাইয়া এক সঙ্গে সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই রূপ ভাবে বাঁধার নাম জোড় কলম। জোড় কলমের মধ্যে একটু কঠিন কাজ ডালের গা কাটা। ডাল কাটা বলিলে যেন কেহ এরূপ না বুঝিয়া লয়েন ঐ ডালটী একেবারে কিম্বা কতক অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ডাল কিম্বা চারার যেন মাথা কাটা না হয়। যে স্থানে কলম বাঁধিতে হইবে সেই স্থানের কতক অংশ অর্থাৎ আন্দাজ তিন আঙ্গুল স্থান কলম ছেওয়া ভাবে কাটিয়া তুলিতে হইবে। অনন্তর শাখা ও চারার কর্ত্তিত অংশ উত্তমরূপে জুড়িয়া বাঁধিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কিছুদিন বাঁধিয়া রাখিলে ডাল এবং চারা পরস্পর জুড়িয়া যাইবে। কলম বাঁধার পর চারার যে স্থানে জোড় বাঁধা হইবে তাহার কিছু উপর ঘেঁসিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কাটিবার কারণ এই যে উহা কাটিয়া না দিলে চারার সমুদায় রস উহার মাথায় পত্রাদিতে সঞ্চারিত হইয়া চারা বাড়িতে থাকে। যে শাখায় কলম বাঁধা হয় উহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। চারার মাথা কাটিয়া দিলে উহার সমুদায় রস শাখায় সঞ্চারিত হইয়া উহার দেহ পুষ্ট করিতে থাকে। কলম বাঁধা ডালে চারার সমুদায় রস গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া উঠে। চারা যে পরিমাণে সুস্থ ও সবল থাকিবে কলম বাঁধা ডালটীও সেই পরিমাণে বর্দ্ধনশীল হইবে। এইরূপে কিছুদিন থাকিলে জোড় কলম প্রস্তুত হইবে।

কলম লাগিয়া গেলে তাহা কাটিয়া বাগানে রোপণ করা উচিত। বাগানে চারা রোপণ করিতে যদি বিলম্ব হয় তবে কোন একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা পাতো দিয়া রাখিলে চলিতে পারে। লবঙ্গ, তেজপত্র গাছাদি যেরূপ নিয়মে রোপণ ও প্রতিপালন করিতে হয়, দারুচিনি রোপণ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ নিয়ম। আমাদের দেশে যে সকল দারুচিনি গাছ হইয়া থাকে, তদপেক্ষায় সুমাত্রা, জাবা এবং লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদিগের আকারগত এবং গুণের বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে দশ বার হাত উচ্চ বৃক্ষ হয় এবং সেই সকল গাছের উৎকৃষ্ট ছাল ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকেই দারুচিনি বা দারুত্বক কহে। গাছের উপরে যে ছাল জন্মে তাহা মসলার জন্য ব্যবহার হয় না। ঐ ছালের মধ্যে যে ছাল হয় সেই অন্তস্ত্বকেই উত্তম মসলা এবং উহাই বাজরে বিক্রয় হইহয়া থাকে।

দারুচিনির গাছ গুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এই গাছ বাগানে রোপণ করিলে মসলা গ্রহণ ব্যতীত উদ্যানের অত্যন্ত সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অত্যন্ত প্রাচীন বৃক্ষে দারুচিনি জন্মে না। দারুচিনির পক্ষে তিন বৎসরের গাছই উত্তম। বৎসরের মধ্যে দুইবার দারুচিনি সংগ্রহ করিতে হয়। এদেশে যে সকল গাছ আছে, তাহা হইতে প্রায় কেহই দারুচিনি সংগ্রহ করে না; চেষ্টা করিলে কিয়ৎপরিমাণে মসলা পাওয়া যাইতে পারে। দারুচিনি সংগ্রহ করিতে হইলে বৈশাখ হইতে ভাদ্র এবং দ্বিতীয় বার কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাসের মধ্য পর্য্যন্ত প্রশস্ত সময়। এই সময়ে বৃক্ষের যে ত্বক জন্মে তাহা দারুচিনির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।

দারুচিনি সংগ্রহ——যে সকল গাছ হইতে দরুচিনি সংগ্রহ করিতে হইবে অগ্রে তদ্‌সমুদায় ঠিক করিয়া রখা আবশ্যক। বৃক্ষ ঠিক হইলে শাখা সমূহ কাটিয়া দিতে হইবে। এই সকল কর্ত্তিত শাখার উপরিকার ছাল তুলিয়া ফেলিয়া অভ্যরস্থ ছালগুলি অতি যত্ন সহকারে লম্বালম্বিভাবে চিরিতে হইবে। অনন্তর তদ্‌সমুদায় তুলিয়া বড়গুলির মধ্যে ক্ষুদ্রগুলি স্থাপন পূর্ব্বক রৌদ্রে দিতে হইবে। কিছু দিন রৌদ্রে থাকিলে ছালগুলি গুটাইয়া পেন কলমের ন্যায় গোলাকার হইয়া উঠে।

এইরূপ গোলাকার হইলে, তখন ঐ সকল দারুচিনি বাছিয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মসলা পৃথক পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। উৎকৃষ্ট দারুচিনির মূল্য অধিক, সুতরাং উহা পৃথক বাছিয়া রাখিলে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। উৎকৃষ্ট দারুচিনি পরীক্ষার নিয়ম এই যে উহা কাগজের ন্যায় পাতলা এবং তাহার এক প্রকার নূতনতর গন্ধ ও স্বাদ থাকে। উৎকৃষ্ট দারুচিনি চিবাইলে জিহ্বা জ্বালা করে না, অধিকন্তু মুখের ভিতর এক প্রকার মিষ্টস্বাদ হয়।

ব্যবহার——দারুচিনি আমাদের অনেক কাজে লাগিয়া থাকে। উহা তাম্বুল ও ব্যঞ্জনের এক প্রকার মসলা। দারুচিনির যে কটুতা, মধুরতা এবং উষ্ণতা গুণ আছে, তজ্জন্য উহা বিস্তর ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। শুদ্ধ দারুচিনিতেও ঔষধ প্রস্তুত হয় এবং উহা অন্য দ্রব্যের সহিত যোগ করিয়াও চিকিৎসকেরা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। দারুচিনিতে এক প্রকার তৈলের অংশ আছে তন্নিমিত্ত উহা দ্বারা তৈলও প্রস্তুত করিতে হইলে দারুচিনি চোওয়াইতে হয়। দারুচিনির গন্ধ ভোগ করিতে হইলে উহা চর্ব্বণ বা মর্দ্দন করিতে হয়। দারুচিনির এক প্রকার মনোহর গন্ধ আছে। কিন্তু এলাইচ লবঙ্গের ন্যায় শুষ্ক অবস্থায় তাহা ভালরূপ অনুভব করিতে পারা যায় না। দারুচিনি পাটলবর্ণ, সুস্বাদু, মধুর এবং শুষ্ক ও সংকুচিত পদার্থ।

কুন্‌খুরা সূতা।

কৃষিতত্ত্বের ২য় খণ্ডে যে রিয়া গাছের আঁশের বিষয় লিখিত হইয়াছে। রংপুর অঞ্চলে তাহাকে কুন্‌খুরা সূতা কহে। উহার সূতাগুলি শোণ অপেক্ষায় অতি উত্তম নিহি ও পরিষ্কার এবং শক্ত; এ অঞ্চলে উহার বহুল প্রচার না থাকায় অধিকাংশ লোকে উহার চাষ আবাদে বিশেষ অনভিজ্ঞ। এপ্রদেশে ক্বচিৎ উহার ক্ষেতে আবাদ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন

কোন কোন জেলের বাড়ীতে দুইএকটী করিয়া গাছ দেখা যায় মাত্র। এই কারণেই কুন্‌খুরা সূতা একটী বিশেষ মূল্যবান জিনিস বলিয়া পরিগণিত। পাট ও শণের ন্যায় ইহার বহুল পরিমাণ আবাদ থাকিলে, ইহা এত দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইত না। ইহার চাষ আবাদ তেমন কঠিন না হইলেও একত্র অধিক সূতা প্রাপ্ত হওয়া বিস্তর সময় সাপেক্ষ সুতরাং কালব্যাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন, ইহা একরূপ "বারমেসে কারবার" বার মাসই বৃক্ষ পালন, কর্ত্তন, সূতা প্রস্তুত করণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। নচেৎ ক্ষেত্র হইতে লাভজনক বিস্তর সূতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে না। ইহার একবার চাষ করিলে অনেক দিন থাকিতে পারে। যতদিন ক্ষেত্রে গাছ তেজস্কর হইতে থাকিবে ততদিন ক্ষেতে আসিবার কোন দরকার নাই। যখন গাছ ক্রমে নিস্তেজ ও পাতলা হইতে থাকিবে তখনই ক্ষেতে আসিয়া জমি সারবান করিয়া পুনরায় নূতন ক্ষেত্র করা আবশ্যক। এক ক্ষেত্রে এক বৎসর কাল গাছ রাখাই ভাল এবং তাহারই সূতা ভাল হয়। বৎসর অতীত হইলে সূতা ক্রমে খারাপ হইয়া আইসে। সুতরাং লাভের আশয়ে যাঁহারা চাষ করিয়া থাকেন তাঁহারা প্রায় এক বৎসর পরেই নূতন ক্ষেত করিয়া থাকেন। প্রতি বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভেই উহা রোপণ করিতে হয়; বর্ষাকালের গাছ গুলি বেশ পুষ্ট হইয়া থাকে, শীতাধিক্যে উহা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইতে দেখা যায়। সুতরাং বর্ষাকালের গাছেরই সূতা অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয় এবং এই সময়েই বেশীর ভাগ সূতা পাওয়া যায়। শীতকালে কিছু কম হইয়া থাকে। কুনখুরার বীজ হয় না, গাছে মুকুলসদৃশ এক প্রকার ফলন দেখা যায়। ইহার বীজের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কিছুই জানিতে পারা যায় নাই, মুকুলে বীজ জন্মে কিনা ইহা কোন কৃষকেই বলিতে পারে না। তবে ইহার আবাদ যেরূপে হইয়া থাকে তাহাতে বীজের কোন দরকার নাই, গাছের মূলের কলম করিলেই গাছ জন্মিয়া থাকে। গাছ গুলি উচ্চে তিন হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উহা দূর হইতে দেখিলে শ্বেতভাণ্ডির গাছের অনুরূপ দেখায়, পাতাগুলিও শ্বেতভাণ্ডির পাতার ন্যায় টে কিন্তু নিস্তেজ, গাছগুলির পাতার আভা অতি উত্তম শ্বেতবর্ণ এবং হাত দিলে মখম-

মলের নাায় মোলাম জ্ঞান হয়। পত্র গুলি বহুতর শিরাবিশিষ্ট এবং চারি ধার করাতের দাঁতের ন্যায় সমান কাঁটা কাঁটা থাকে। বস্তুতঃ কুনখুরার পত্র গুলি দেখিতে অতি মনোরম এবং হাতে রগড়াইলে এক প্রকার তীব্র গন্ধ বাহির হয়, গন্ধটী অতি সুগন্ধবিশিষ্ট না হইলেও আঘ্রাণের অযোগ্য নহে।

সকল প্রকার জমিতে কুনখুরার আবাদ হয় না; এঁটেল ও কাইমী মাটি এবং মেটেল মাটি (অর্থাৎ বালুকাময় ভূমি নহে) তাহাতেই ইহার আবাদ হয়। ছায়াযুক্ত অথবা জলা কিম্বা নিম্ন ভূমিতে ইহা ভাল হয় না, সাধারণতঃ উচ্চ অথচ রসাল ভূমিতেই অতি উত্তম হয়। ইহার চাষে গোবরের সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জমি চাষের পূর্ব্বে ক্ষেত্রের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সার দিয়া রাখিতে হয়, বৈশাখ মাসে অন্যূন ছয় বার চাষ দিয়া মই দিলেই ইহার জমির উত্তম পাইট হইল। এই রূপ তৈয়ারী জমিতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর করিয়া কুনখুরার মূল রোপণ করিতে হয়। রোপণ করাণান্তর গবাদি পশু দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে না পারে এই সময়েই তদুপযোগী ঘেরা দিয়া রাখিতে হয়। তৈয়ারী জমিতে ২।১টা বৃষ্টিপাত হইলেই মূল রোপণ করা ভাল। রোপণের পর চারা বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত অত্যন্ত রৌদ্র হইলে ভূমির অবস্থা ও আবশ্যকানুযায়ী জল দেওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ যত দিন বৃষ্টির সাহায্য না পাইবে তত দিন গাছ সকল সতেজে বৃদ্ধি পাইতে বিলম্ব হইবে। গাছ জন্মিয়া উহা পূর্ণাবস্থা হইতে না হইতে গোড়া দিয়া কলাগাছের তেউড়ের ন্যায় দুইএকটী করিয়া চারা উঠিতে থাকে। এই ভাবে সমস্ত ক্ষেত্রে ৪।৫ মাসের মধ্যেই ক্ষুদ্র চারাও সূতা বাহির করণোপযোগী গাছের আকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ক্ষেত্রস্থ গাছ গুলি চারদিন অসম অবস্থায় অবস্থিতি করে বলিয়া অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় ইহার তাদৃশ শোভা হয় না। গাছটী সূতা বাহিরকরণ যোগ্য হইলেই উহা কাটিয়া লইয়াই সূতা বাহির করিতে হয়। প্রথমোত্থিত গাছটী কাটিয়া লইলেই চারিদিকে ক্ষুদ্র ও মধ্যম ৪।৫টী করিয়া এক এক মূলে থাকিয়া যায়, এ সকল চারা আবার যে যে সময় কর্ত্তনযোগ্য হইবে সেই সেই সময় কাটিয়া লইলে আবার পূর্ব্ববৎ হইতে থাকে। এই রূপ আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার বৃদ্ধির সময় এবং এই সময়ের মধ্যেই সূত-

করণযোগ্য অধিক পরিমাণে গাছ পাওয়া যাইতে পারে। পরে ক্রমে শীত আসিলে গাছের বৃদ্ধি কমিয়া আইসে তখনও সূতাকরণযোগ্য গাছের অভাব থাকে না। তবে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ও নিস্তেজ হইতে থাকে। প্রথমবারের ন্যায় সূতা হয় না। সূতা বাহিরকরণযোগ্য গাছ আবার একটু চেনা শক্ত, চিনিতে না পারিলে সমস্ত পরিশ্রম বৃথা হয়। এক সময়ে সকল গাছ কর্ত্তনযোগ্য হয় না, যেহেতু একটীর উপর আর একটী এই রূপ পর পর গাছ জন্মিয়া উঠে সুতরাং এক সময়ে অধিক পরিমাণে উপযুক্ত গাছ পাওয়া যায় না। যখন যেটী উপযুক্ত হইবে তখনই তাহার কার্য্য করিতে হইবে, এই জন্যই ইহার কাজ "বারমেসে" বলিয়াছি। এক সময়ে সমুদায় ক্ষেত্রের কর্ম্মযোগ্য গাছ কাটিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না; আজ যাহা উপযুক্ত ৫। ৬ দিন পর তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে, আবার আজ যাহা উপযুক্ত হয় নাই হয়ত ৫। ৬ দিন পরে তাহা কর্ম্মযোগ্য হইবে, এইরূপ নিয়মে ক্ষেত্রের দিকে সর্ব্বদাই মনোযোগ রাখিতে হইবে। গাছগুলি খুব শক্ত হইলে উহার সূতা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, (ইহাকে কৃষকেরা সূতা খাইয়া যাওয়া কহে।) আবার কিঞ্চিৎ কোমল থাকিলেও তাহার সূতা হয় না। সারবান ভূমির গাছ বাহির হইবার তিন মাস পরে সচরাচর উহা কর্ত্তনযোগ্য হয় এবং সূতাও পাওয়া যায়। উহার চিনিবার একটী সহজ উপায় আছে। গাছের কাণ্ডভাগের ত্বকের উপর কতক গুলি নিবিড় সন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম সদৃশ থাকে। কোন কোন বৃক্ষের পত্র কাণ্ডও সেরূপ সুঙা দেখা যায়, কিন্তু উহা তেমন শক্ত নয়, হাতে বেঁধে না বরং ইহার পত্রের তলভাগের ন্যায় সুখস্পর্শ জ্ঞান হয়। গাছ খুব শক্ত হইলে ঐ সুঙা সকল * কিছু মাত্র থাকে না, ত্বকসহ বিশুষ্ক হইয়া যায়। কাণ্ডভাগ শ্যামলরূপ পরিত্যাগ করিয়া দৃষ্টির অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। যখন এই সুঙার কিয়ৎঅল্পতা হইতে আরম্ভ হইবে এবং ত্বক কিছু আর্দ্র এবং

* যে সুঙার কথা বলা হইল উহা বাস্তবিক সুঙা নহে। এক প্রকার সূক্ষ্মরেণু—বিশিষ্ট কোমল পদার্থ ত্বকের উপর বিদ্যমান থাকে, উহাকে সুঙা কহে।

কোমলতা হীন না হইবে (অথচ অত্যন্ত কোমলত্ব না থাকিবে) তখনই জানিতে হইবে উহা কর্ত্তন যোগ্য হইয়াছে। আবার একেবারে কোমল না হয় এ জন্য গাছ নোয়াইয়া দেখিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। এইরূপ উপযুক্ত গাছ অনুসন্ধান পূর্ব্বক একবারে গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া আনিতে হয়, এবং যতবার এইরূপ পাওয়া যায় ততবার কাটিবে এবং ততবার সূতা বাহির করিবে। এইরূপ করিতে করিতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই সকল কাটিয়া ফেলাইয়া সুধু মূলভাগ তুলিয়া তৈয়ারী জমিতে রোপণ করিলেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

সূতা করণ—গাছ কাটিয়া আনিয়া ঝিণুক অথবা বাঁশের চেওয়ারি দ্বারা কর্ত্তিত কাণ্ড ভাগের নীলগুলি চাঁচিয়া ফেলিতে হইবে, তৎপরে রৌদ্রে দিয়া উহার স্বাভাবিক রসটি শুকাইয়া লইতে হয়। তবেই উহার সূতা বাহির করা যায়। কেহ কেহ জলে না ভিজাইয়া অমনি উহার কোন স্থান ভগ্ন করিয়া ছুলিয়া ফেলার মত কাষ্ঠ ভাগ হইতে টান দিয়া আঁশগুলি পৃথক করিয়া লয়। কেহ বা সুবিধার জন্য চাঁচিয়া রস শুকাইবার পর উহা ২৫। ৩০ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া সূতা বাহির করা অনেক সুবিধা বিবেচনা করেন। এরূপ উপায়ে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সত্বরে হইতে পারে। আর সূতার জটিলতা লাগিবার আশঙ্কা কম হয়। ইহার সূতা বাহির করিবার জন্য এতদ্ব্যতীত অন্য কোন সদুপায় অবলম্বন করে না। বোধ হয় এই সূত্রের পরিপাট্য সাধনার্থ যিনি যেরূপ সুবিধা উদ্ভাবন পূর্ব্বক যেরূপ সহজে কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে ততই উত্তম লাভ। ফলকথা, সূতা বাহির যেরূপেই করুন তাহাতে দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে সূতায় যেন কোন ক্রমে জটিলতা না লাগে এবং উহা ছুলিয়া বাহির করিতে সম্পূর্ণ রূপে যেন সকল পাওয়া যায়। পরিষ্কার জন্য হস্ত দ্বারা মার্জ্জন করা বই আর কোন উপায় এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই।

এই সূতার সের এ অঞ্চলে ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমিতে চাষ করিলে ২/০ মন পর্য্যন্ত কুন্‌খুরা সূতা পাওয়া যাইতে পারে। পাঠক! দেখুন এখন ইহাতে আয় কত? যাহারা নিজ হালে আবাদ করে এবং অন্যান্য কৃষি কার্য্যের সঙ্গে

ইহার কাজ করে তাহাদের ত ইহাতে একটীও খরচ বলিয়াই ধরা নাই। যাঁহারা চাকর দ্বারা কাজ করান, আপনি না খাটিতে চাহেন, তাঁহাদেরও ইহাতে যথেষ্ট আয় হইতে পারে। এরূপ লাভজনক কৃষি এক্ষণে আর দেখা যায় না। ইহার চাষ খরচ বেশী লাগিবার কোন কথা নাই। এক বিঘা জমির খাজনা ৩৲ টাকা, রোপণের মজুরি ১৲ টাকা, ক্ষেত ঘেরার খরচ ৩৲ টাকা এবং কর্ত্তন ও সূত্র বাহির করার ব্যয় আনুমানিক ১০৲ টাকা। লিখিত টাকার বেশী প্রায় খরচ লাগিবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। কর্ত্তন ও সূত্র প্রস্তুতের ব্যয় যে ১০৲ টাকা ধরা হইয়াছে, ইহা হিসাবেই, ধরামাত্র যেহেতু কৃষকেরা ঐ ব্যয়টী হিসাবে ধরে না। তবে যাঁহারা স্বহস্তে চাষের কাজ অপমান জ্ঞান করেন এবং মজুর রাখিয়া করাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই এ ১০৲ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে। এক বিঘায় অন্ততঃ দুই মোণ কুণখুরা পাইলে ইহার সেরের মূল্য ৸০ আনা হিসাবে ধরিলেও ৬০৲ টাকা হয়। খরচ ২০৲ টাকা বাদেও ইহাতে ঠিক ৪০৲ টাকা আয় দাঁড়াইবে। আর বিঘা প্রতি দুই মণ কুনখুরা উৎপন্নের যে কথা বলা হইল, উহা খুব সামান্য হিসাবে ধরা হইল।

চেষ্টা করিলে কুনখুরা উৎপন্ন করিয়া লাভ করিতে পারা যায় কিনা বলিতে পারা যায়। যে যে দ্রব্যের যত আবশ্যকতা তাহার তত আদর, সুতরাং মূল্যও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে কুনখুরা অতি সামান্য কাজেই লাগিয়া থাকে। এজন্য ইহার অধিক চাষ হয় না। এদেশে এই সূতার গুণ জানিতে পারিলে অনেকেই উহা ব্যবহার করিতে পারেন। এই চাষের বৃদ্ধি হইলে নূতন একটী আয়ের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।

শুনা যায় আসাম অঞ্চলে ইহার বহুল পরিমাণে আবাদ হইয়া থাকে। রঙ্গপুরের সুন্দরগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে উহার আবাদ হয়। এদেশের সর্ব্ব সাধারণ্য উহার আবাদ প্রচারিত হয় নাই। অনেক চাষাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম তাহারা প্রায় ইহার আবাদ প্রণালীই জানে না; বিশেষতঃ রঙ্গপুরের লোক অধিক পরিশ্রমী এবং কৃষি বিষয়ে অসাধারণ উৎসাহী হইলেও তাহারা ধান্য, কোষ্টা বা পাট প্রভৃতি ২।৪ টী লাভজনক কৃষি ভিন্ন

অপরাপর বিষয়ে অল্পই আদর করিয়া থাকে। কারণ রঙ্গপুরের ভূমি স্বভাবতঃই কিছু উর্ব্বরা তাহাতে আবার গোবরের সার দেওয়ার পদ্ধতিটী খুব উত্তম। গোম, সরিষা, কলাই ইত্যাদি কতিপয় ফসল অল্প পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয়। রঙ্গপুরের সর্ব্বত্রই এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ কোন প্রকার নূতন চাষে প্রবৃত্ত হয় না। রঙ্গপুরের কৃষকদিগের অবস্থা অতি সন্তোষজনক কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা চিরকুসংস্কারাপন্ন। আমি কয়েকজন কৃষককে এই কুনখুরা রোপণের অনুরোধ করায় তাহারা বলিল "যে দ্রব্য যাহার পিতৃ পিতামহ আবাদ করে নাই তাহা চাষ করিলে "পীড়ে" অর্থাৎ অনিষ্টজনক হয়।" এ কুসংস্কার এক জনের নয় এরূপ অসংখ্য লোক রঙ্গপুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ মজুমদার।

ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসের কারণ কি।

কালচক্রের সংঘর্ষণে বঙ্গদেশের যত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, এতদ্দেশীয় জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস তাহার মধ্যে অন্যতর। অধিক দিনের কথা নহে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই এক পুরুষগণের সময়ে কৃষক সম্প্রদায় যে ভূমি হইতে সামান্য পরিশ্রমে প্রচুর পরিমাণে শস্য সংগ্রহ করিতে পারিত, এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ পরিশ্রম করিলেও সে জমিতে আর সেরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় না; তজ্জন্যই অধুনা দেশময় প্রায়ই অন্নকষ্ট সমুপস্থিত হইতেছে—প্রধুমিত দুর্ভিক্ষানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে—অকালে অগণ্য লোক সমন ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দারুণ জঠর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভ করিতেছে—অগণ্য গ্রাম জনপদ জনশূন্য, কোলাহলশূন্য হইতেছে।

কিন্তু পাঠক! এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? শুদ্ধকালের দোষে জমির

উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইতেছে বলিলেই কি আমরা পরিতুষ্ট হইব? অথবা বাস্তবিকই কি কালের দোষে প্রচুর শস্য প্রসবিনী বঙ্গদেশীয় উর্ব্বরা ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া যাইতেছে? আমরা বলি না; আমরা কালের দোষ দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা কালের আয়ত্তাধীন হইলেও স্বীয় চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যাবসায় দ্বারা কালের সদ্ব্যবহার করিতে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, যাঁহারা সেই অধিকার পরিচালনা করেন, তাঁহারা সুফল প্রাপ্ত হইয়া সুখী হন, আর যাঁহারা সে অধিকার পরিচালনে বিমুখ হয়েন, তাঁহারা আপনারাই আপনাদের প্রাণনাশক বিষবৃক্ষমূলে জলসিঞ্চন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করেন এবং অবশেষে আপনারাই আপনাদের সর্ব্বনাশ করিতে সমুদ্যত হন। যে কালে আমরা আলস্য পরতন্ত্র হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে এ জড়প্রকৃতিক জীবনকে অতিবাহিত করিতেছি, সময়ের মূল্য বুঝিয়াও বুঝিতেছিনা অথবা বুঝিয়াও তাহার উপযুক্ত মত ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, যদি আমরা আমাদের চিরআলস্যভাব পরিত্যাগ করিয়া নবউদ্যমে, নবউৎসাহে মাতিয়া উঠি, এবং যত্ন, চেষ্টা, অধ্যাবসায়ের সহিত সময়ের সদ্ব্যবহারে বদ্ধপরিকর হই, তবেই আমরা বুঝিতে পারি যে, যে সময়কে আমরা হেলায় অতিবাহিত করিতেছি, সে সময়ের মহাত্ম্য কত? কিন্তু বঙ্গদেশীয় কৃতবিদ্য যুবক! স্বদেশের একমাত্র আশা ভরসার স্থল! সত্য কথা বল দেখি তুমি কি সময়ের বহুমূল্যতা বুঝিয়া কার্য্য কর? আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে এ প্রশ্নের উত্তরে "না" ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। তুমি মুখে বল, "সময় নাই" "সময় নাই" "সময় থাকিলে অমুক কাজ করিতাম," "অমুক সৎকার্য্যে মন দিতাম," "জননীর দুঃখাশ্রু মোচন করিতাম," "স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতাম।" কিন্তু হরি! হরি!! তোমার মিথ্যা কথা, এগুলি তোমার ভাণ, চাতুরী, প্রতারণা মাত্র, কারণ তুমি নিজেই স্বীকার না করিয়া কদাপি থাকিতে পারিবে না যে, তোমার প্রচুর সময়কে তুমি অকারণে বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত কর, তোমার প্রচুর সময় আছে, যাহার তুমি সদ্ব্যবহার কর না। পণ্ডিত প্রবর সেনেকা যথার্থই বলিয়াছেন যে আমরা যেমন "সময় নাই" "সময় নাই" বলিয়া সময়ের

মহার্ঘ্যতা কীর্ত্তন করি, আমরা সময়ের সেরূপ উপযুক্ত ব্যবহার করিতে অদ্যাপিও শিক্ষা করি নাই; ইহা জ্বলন্ত সত্য, অন্য কোন জাতির পক্ষে হউক বা না হউক বঙ্গবাসীর পক্ষে ইহা অভ্রান্ত সত্য, নতুবা বঙ্গবাসীর এত দুর্দ্দশা কেন? বাঙ্গালী বৃথা আমোদে, বন্ধুবর্গের সহিত অকারণ রসালাপে দিবা রজনী অতিবাহিত করিবে—নাচ, তামাসা, হাসি, ঠাট্টা, ক্রীড়া, কৌতুকে জীবনের অমূল্য সময়ের সমস্তটুকু কাটাইবে, তাহাতে বাঙ্গালীর সময়াভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে যেই কাজের কথা পাড়িবে, যখনই বাঙ্গালী কোন সৎকার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইবে, অমনি বাঙ্গালী স্বীয় করাগ্রভাগ দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ণ করিতে করিতে মধুর কর্ম্ম হইতে পঞ্চমস্বরে ললিত তানে তোতা পাখীর ন্যায় চিরঅভ্যস্ত "সময় নাই" বুলি বাহির করিল। আবার বাঙ্গালী কথায় স্বর্গে উত্তোলন করিতে যেমন মজবুৎ, কার্য্যকালে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে ততোধিক মজবুৎ। আর এই সমস্ত বাঙ্গালী মুখেই স্বদেশানুরাগের কথা, দেশোদ্ধারের কথা, ইঁহারাই সমাজ সংস্কারক—দেশের সর্ব্বস্ব, বাঙ্গালার ম্যাট্‌সিনি, গরিবল্‌ডি, নেপোলিয়ন-বোণাপার্টি, আরবিপাশা। কিন্তু এ সমস্ত কথার আলোচনা করিতে অদ্য আমরা প্রবৃত্ত হই নাই; প্রবন্ধশীর্ষে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে সেইটীর যথাযথ মীমাংসা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে কালের দোষেই জমির উর্ব্বরতা হ্রাস হইতেছে না, তদ্রূপ ইহা রাজার উৎপীড়নের ফলও নহে; তবে কি উহা অনাবৃষ্টি বা সুবৃষ্টির অসদ্ভাবের ফল? আমরা বলি, তাহাও নহে; কারণ বৃষ্টি বা বারি কৃষিকার্য্যের পক্ষে উপকারী ও আবশ্যক হইলেও ইহা উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন নহে; তবে যে সকল জমির প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিকা শক্তি আছে, সুবৃষ্টি সাহায্যে সে সকল জমি অতি উত্তম ও সন্তোষকর ফসল প্রসব করে। বৃষ্টিতে জমি উর্ব্বরা করে না অথবা কেবল বৃষ্টি হইলেই উত্তম ফসল হয় না। তবে ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ আমাদের নিশ্চেষ্টতা ও অমনোযোগ, আমাদের নিশ্চেষ্টতা ও অমনোযোগীতা যেমন আমাদের সকল বিষয়ের উন্নতির অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, কৃষি বিষয়েও সেইরূপ; জমির উৎপাদিকা

শক্তিহ্রাসের কারণও তাহাই। আমাদের অমনোযোগীতা, নিশ্চেষ্টতা বা শিথিল যত্নের ফলে প্রচুর শস্য প্রসবিনী বঙ্গদেশীয় উর্ব্বরা ভূমি কিরূপ অনুর্ব্বরা হইয়া যাইতেছে, এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বোধ হয় কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ক্ষেত্রে প্রথম বৎসর যেরূপ ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে তদ্রূপ হয় না—তদপেক্ষা অল্প হয়; প্রথম বৎসরে জমির যেরূপ উৎপাদিকা শক্তি থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে তদপেক্ষা হ্রাস হয়; এবং এইরূপে হ্রাস হইতে হইতে ক্রমে উৎপাদিকা-শক্তি বিনষ্ট হয়। ইহার কারণ এই যে, জমির যে সারত্ব তাহা উদ্ভিদে পরিণত হইয়া জমি ক্রমে অসার ও তেজহীন হইয়া পড়ে। প্রতি বৎসরের—ফসলে জমি হইতে পটাস্ ও ফস্ফরিক আসিড অপনীত হইয়া জমি ক্রমে কুড়িয়া * যায়। এই কারণ প্রযুক্ত ভূমি হইতে আমরা প্রতি বৎসর যেরূপ উদ্ভিদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, আমাদেরও উচিত আমরা তৎপরিমাণে সার প্রদান করিয়া ভূমির ক্ষতিপূরণ করি। প্রতি বৎসর উদ্ভিদ্ বিতরণ করিয়া জমির যে সারভাগ বিনষ্ট হয় ভূমির যে পরিমাণে তেজ হ্রাস হয়, সারে তাহার ক্ষতিপূরণ হয়। বঙ্গদেশীয় উৎকৃষ্ট জমি বহু বৎসর ধরিয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিয়া ক্রমে অদৃশ্যভাবে তেজোহীন হইয়া পড়িতেছে, এই সময়ে ইহার প্রতিকার না হইলে ভূমি এইরূপ কুড়িয়া যাইবে যে তাহাতে রোপিত বীজ সংখ্যার অধিক শস্য উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু অতীব আক্ষেপের বিষয় যে বঙ্গবাসী সে বিষয়ে উদাসীন—বাঙ্গালীর দৃষ্টি সে দিকে অন্ধ; বঙ্গদেশীয় জমিতে উপযুক্ত মত সার প্রদত্ত হয় না, কাজেই জমিগুলি ক্রমশঃ কুড়িয়া যাইতেছে। যে জমিতে পূর্ব্বে ৬০ মণ ধান্য উৎপন্ন হইত, এখন সে জমিতে ৩৫। ৪০ মণের অধিক শস্য উৎপন্ন হয় না, কালক্রমে তাহাও আর হইবে না।

জমি তেজোহীন ও উৎপাদিকা শক্তি শূন্য হইলে তাহাকে কুড়িয়া যাওয়া কহে। কৃষকমণ্ডলীর মধ্যেই এ শব্দ প্রচলিত।

অতএব বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণ, এই ক্ষণ হইতে সাবধান হউন নতুবা ভবিষ্যতে তোমাদের সমূহ অনিষ্ট হইবে আহার অভাবে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জমি যেমন আমাদের জীবন পোষণ করিতেছে, আমরাও যেন সেই রূপ জমির জীবন পোষণ করি, আর ইহা অতি অল্প আয়াসে অক্লেশে সাধিত হইবে; তবে এ অল্প আয়াস স্বীকার না করিয়া কেন আমরা বিষ তরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণান্ত হইব? আমরা আমাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছি, কিন্তু তাহারা কি খাইয়া সে ধন সম্ভোগ করিবে তাহার উপায় কিছু করিয়া যাইতেছি না বরং সে পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিতেছি, ইহা কি আমাদের বাতুলতা নহে? বঙ্গবাসীগণ! চির আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নবজীবন লাভ কর—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হও। জমির যেরূপ সার আহরণ করিয়া তোমরা সারবান হইতেছ, জমির ঋণ সেইরূপে পরিশোধ করিতে শিক্ষা কর—ইহাতে স্বার্থরক্ষা হইবে; তোমাদের নিজের উপকার হইবে—স্বদেশের উপকার হইবে। সারে যে জমির ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হয়, তাহা নদীতীরস্থ জমির প্রতি লক্ষ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। সে সমস্ত জমী বন্যাপ্লাবিত হইলে তাহাতে পলি জমে, সেই পলিই সারের কার্য্য করে, সে জমিতে অতি উত্তম ফসল উৎপন্ন হয়, অন্যান্য জমিতে সেরূপ হয় না, কারণ তাহাতে পলি পড়ে না—সারও প্রদত্ত হয় না। বাঙ্গালীর এক্ষণে চক্ষু কর্ণ ফুটিয়াছে—আমরা ভরসা করি বাঙ্গালী এক্ষণে নিজ কর্ত্তব্য বুঝিয়া যাহাতে নিজের উপকার হয়, নিজের জীবন পোষিত হয়—ভবিষ্যৎবংশীরগণের জীবন রক্ষা পায়, তদ্বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন—কর্ত্তব্যের গৌরব বুঝিয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিবেন।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল সিংহ।

চোক কলম।

BUDDING.

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৫ পৃষ্ঠার পর দেখ।)

চোক কলমের যে প্রণালী লিখিত হইল, তদ্দ্বারা অধিকাংশ গোলাপের কলম প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যোড় কলম অপেক্ষা চোক কলম কিছু কঠিন। ইহাতে একটু পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক। কিছু দিন এই নিয়মে চোক তুলিয়া অন্য গাছে বসাইলে তাহাতে ডাল গজিয়া উঠে। কলমাদি প্রস্তুত করিতে হইলে কেবল মাত্র পুস্তক পাঠ করিলে শিক্ষা লাভ হয় না। হাতে কাজকর্ম্ম করিলে ভালরূপ জ্ঞান জন্মে না, এজন্য উচিত পুস্তক পাঠ করিয়া স্বহস্তে তাহা সম্পাদন করা। যে কোন গাছে চোক বসাইয়া তাহা সোরু দড়ি কিম্বা সূতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়; কারণ উহা বাঁধিয়া না দিলে ঐ স্থান ফাঁপিয়া উঠিবে। কলমের স্থান ফাঁপিয়া উঠিলে, কলম লাগে না উহা মরিয়া যায়। এ জন্য সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। আর এ স্থলে ইহাও মনে রাখা উচিত কেবল মাত্র চোক বসাইলে যে উহা প্রস্তুত হইল তাহা নহে। চোক বসাইবার পর যাহাতে সেই স্থানে প্রখর রৌদ্র লাগিতে না পায় তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কারণ এই সময় রৌদ্র পাইলে চোক শুকাইয়া যাইবে। চোক সজীব না থাকিলে সমুদায় পরিশ্রমই বৃথা হইবে, এজন্য উহা সজীব রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রৌদ্র নিবারণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রৌদ্র নিবারণ ব্যবস্থা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ যাহাতে সর্ব্বদা কলম বসান স্থান রসাল থাকে তজ্জন্য নিয়মিত রূপ জল দেওয়ারও উপায় করিয়া দিতে হয়। যে ডালে চোক বসান হইয়া থাকে, যাহাতে সেই ডালটী তেজস্কর এবং রসাল থাকে, তদ্‌পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অতএব সেই ডালে যদি মুকুলাদি থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। কারণ শাখায় মুকুলাদি থাকিলে শাখাস্থ সমুদায় রস তাহারা টানিয়া লইয়া পরিপুষ্ট

হইতে থাকে সুতরাং কলমের স্থানে আবশ্যকমত রস সঞ্চার হইতে পারে না। রসের সঞ্চার অল্প হইলে চোক ফুটিয়া অঙ্কুর বাহির হইতে ব্যাঘাত জন্মে। চোক বসাইবার সময় উপযুক্ত ডাল ঠিক করিয়া চোক বসাইলে শীঘ্রই কলম লাগিয়া থাকে। শাখার পত্রগাঁইট স্থানে চোক বসাইলে অল্প দিনের মধ্যে উহা লাগিয়া যায়। উপযুক্ত স্থান ঠিক করিয়া চোক না বসাইলে কলম লাগিতে বিলম্ব হইয়া থাকে। যে শাখা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল তাহাতে চোক বসাইলে উহা শীঘ্র লাগিয়া যাইবে। যখন দেখিবে চোক লাগিয়া বেশ বাড়িতেছে, তখন সেই ডালের উপরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাল গুলি কাটিয়া দিবে; এই রূপ যত্নের সহিত চোক কলম করিলে প্রায়ই সমুদায় চোক লাগিয়া থাকে।

অন্য কলম অপেক্ষা চোক কলম কিছু কঠিন বলিয়া মালিরা ইহাতে তত মনোযোগ দেয় না। গোলাপ প্রভৃতি গাছের চোক কলম করিয়া গাছ প্রস্তুত করা অপেক্ষা অন্যান্য প্রকার কলম অপেক্ষাকৃত সহজ, তজ্জন্য তাহারা তাহাতেই অধিক মনোযোগ দেয়। গোলাপের প্রায়ই যোড় কলম ও খোঁচা কলম দ্বারা চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। চোক কলম প্রস্তুত করিতে জানা থাকিলে বিশেষ লাভ এই যে একটী ডাল হইতে অনেক গুলি চোক পাওয়া যায় সুতরাং তাহা হইতে অধিক পরিমাণে চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যোড় কলমে একটী ডালে অধিক পরিমাণে চারা হয় না। মনে কর একটী ডালে যদি ২৫টী চোক থাকে তবে সেই ২৫টীই চারা হইবার সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য কলমে এত অধিক পরিমাণে চারা হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চোক কলম কেবল যে গাচের ডালে বসাইয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয় তাহা নহে। উহা মাটিতে বসাইলেও চারা হইয়া থাকে। কিন্তু সকল গাছের চোক সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। এক এক শ্রেণীর উদ্ভিদের এক এক নিয়ম। এক নিয়মে কাজ করিতে হইলে সকল স্থানে ফল দেখা যায় না। এ জন্য কলমাদি প্রস্তুত করিতে হইলেও উদ্ভিদাদির প্রকৃতি জানা আবশ্যক। প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষাদির স্বভাবানুসারে পৃথক পৃথক কলম করিবারও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। আবার এস্থলে

ইহাও জানা আবশ্যক কোন কোন জাতীয় গাছাদির চোক মাটিতে বসাইলে যেমন চারা জন্মিয়া থাকে, অন্য কোন গাছে তাহা বসাইলে আদৌ অঙ্কুর জন্মে না। গোল আলুর চোক তুলিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে চারা বাহির হয়। কিন্তু ঐ চোক কোন গাছে বসাইলে আদৌ অঙ্কুরিত হইবে না। এজন্য উহা মাটিতে পুঁতিতে হয়।

গোলাপের চোক কলম যে নিয়মে করিতে হয়, ক্রোটন গাছের কলম করিতে হইলে ঠিক সেই রূপ নিয়মে হয় না। ক্রোটনের চোক কলম করিতে হইলে ডালের যে স্থান হইতে পাতা বাহির হয় সেই পাতার গোড়া কিছু কষ্টাংশের সহিত কাটিয়া লইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিলেই গাছ প্রস্তুত হয়। ক্রোটন বাহুর অংশ বিশিষ্ট মাটিতে ভাল জন্মে। এজন্য পাতার গোড়া কাষ্টাংশের সহিত তুলিয়া বেলে মাটিতে পুঁতিতে হইবে। অন্যান্য গাছ পুঁতিয়া যেরূপ জলাদি দিতে হয়, ক্রোটনের চোক কলম করিতে হইলে সেরূপ জল দেওয়ার আবশ্যকতা হয় না। চোক রোপণের পর তাহা গ্লাসের ফানোস দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ নিয়মে কিছু দিন ঢাকা থকিলে অল্প দিনের মধ্যেই উহা হইতে চারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। চারা বড় হইলে ঐ আবরণ খুলিয়া দিতে হয়। এই রূপ কাচ ঢাকা না দিলেও কলম লাগিয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাতে অধিকাংশ চোক নষ্ট হইবার সম্ভব। কিন্তু গ্লাস ঢাকা দিলে প্রায়ই চোক নষ্ট হয় না। চোক কলমে একটু বিশেষ যত্ন করিতে হয় তাহার কারণ চোক অল্প পরিমিত স্থান মাত্র। সেই অল্প পরিমিত স্থান হইতে চারা নির্গত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা যাহাতে নষ্ট না হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়।

তামাক।*

তামাক সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিয়ানা নামক গাছের শুষ্কপত্র। আমেরিকা, ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডের অধিকাংশ দেশে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ বিচার গ্রন্থে ৪০ জাতীয় তামাকের গাছ আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সমস্ত জাতিই সোলেনেসী মধ্যে গণ্য। তথায় মধ্যে তিন জাতীয় তামাক উৎকৃষ্ট এবং প্রধান। ভর্জ্জিনিয়ন, সিরিয়ান ও সিরাজ।

ভর্জ্জিনিয়ন তামাক।—ভর্জ্জিনিয়ন তামাকের গাছ, প্রথমে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ইউরোপ খণ্ডে আনয়ন করেন। এই জাতীয় তামাকের গাছ সকল কখন কখন প্রায় পাঁচ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বৃক্ষ সকল কঠিন ও বক্রভাব হইয়া থাকে। পাতা সকল এক হস্তেরও কিছু বড় হইয়া থাকে। ইহার পুষ্প মঞ্জরী আকারে হইতে দেখা যায়। ইহা হইতে তিন প্রকার তামাক প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই জাতীয় তামাকের গাছ স্থান বিশেষে বিভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়।

সিরিয়ান তামাক।—এই জাতীয় তামাক গাছের গাত্র হইতে শাখা পল্লবাদি বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্যেক পল্লবের উপরে পৃথক পৃথক সবুজ বর্ণের ফুল হয়। ভর্জ্জিনিয়ন তামাকের পত্র সকল যে প্রকারে উক্ত বৃক্ষের গাত্রে সংলগ্ন থাকে, সিরিয়ান তামাকের পত্র সকল সে প্রকার থাকে না। আমাদের দেশের আম্রবৃক্ষের পত্রাদির ন্যায় শাখায় সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই জাতীয় তামাকের গাছ ভর্জ্জিনিয়ন তামাকের গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় প্রায় এক হস্তেরও কম দৃষ্ট হয়। ইহার গন্ধও তাদৃশ উগ্র নহে। সেই জন্যই ইউরোপীয়েরা ইহার চুরোটকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া থাকেন।

* তামাকের দোষ গুণ ও ইতিহাস দেখ।

ল্যাটাকিয়া সিরিয়ান তামাক ইহা হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমেরিকা দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হয়। এক্ষণে অন্যান্য দেশেও উৎপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ড দেশের উদ্যান সমূহে প্রতি বৎসর ইহা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই জন্যই বোধ হয় ইহার অন্য এক নাম ইংলিশ তামাক হইয়াছে।

সিরাজ তামাক।—পত্রের আকৃতি ও পুষ্পের বর্ণে উক্ত উভয় বিধ তামাক হইতে ইহার পর্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। এই জাতীয় তামাকের পুষ্প শ্বেত বর্ণের হইয়া থাকে। পারস্য দেশে ইহার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। উপর্যুক্ত উভয়বিধ তামাক অপেক্ষা ইহার উগ্রতার লঘুত্ব দৃষ্ট হয়। পারস্য দেশে ইহা মিঠা তামাক বলিয়া প্রসিদ্ধ। লিণ্ডলে নামক সাহেব বলেন এই জাতীয় তামাকে উত্তম চুরোট প্রস্তুত হয় না; তাহার কারণ এই, অগ্নি সংলগ্ন করিলে শীঘ্র ধরে না। অন্যান্য তামাকের ন্যায় ইহা ঔষধার্থে ব্যবহার করিলে তাহার কোন ফল দৃষ্ট হয় না।

তামাক চাষ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন প্রথা পরিদৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশে ফাল্গুন হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তামাকের জমিতে কৃষকেরা উত্তমরূপে চাষ দিয়া রাখে। নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, হুগলী, মুরশিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার লোকেরা জমিতে তামাকের পলিমাটি তুলিয়া ছড়াইয়া দিয়া থাকে। তামাকের জমিতে যদি গোময়, তৃণ, পচা পত্র ও তাহার সহিত প্রতি বিঘায় ৫।৬ সের লবণ বা সোরা একত্র মিশ্রিত করিয়া ছড়াইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উত্তম তামাক উৎপন্ন হইতে পারে। অস্মদ্দেশে তামাক নানা বিধ। পালমুটি, হরিণপালি, হাতিকানী, শিবজটা, কপি, শকুনকানি, কালীজিরে, ছোটনা, ভেলেসি, খটুয়া, চামা, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি বহুবিধ উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা সম্পূর্ণ সসার ভূমিতে উত্তমরূপে চাষ দিয়া তামাকের বীজ বপন করে। পরে যখন চারাগুলিতে ৩।৪টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে, পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ষিত ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া রোপণ করে। যখন গাছগুলির ১২।১৩টী করিয়া পাতা বহির্গত হয়, সেই সময়ে কৃষকেরা গাছের অগ্রভাগটি ভাঙ্গিয়া দেয়। আর প্রত্যেক পাতার গোড়া হইতে

অন্যান্য সকল পত্র বহির্গত হয়, তাহাও প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। এই প্রকার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহার দ্বারা গাছের নির্দ্দিষ্ট পাতা গুলি পাকিয়া উঠিলে অত্যন্ত উগ্র হয় ও কিছু মোটা হয়। পাতা গুলি যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা আর না থাকে তখন গাছের গোড়ার দিক হইতে ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া লয়। এদেশে প্রতি বিঘায় দুই পাটি হইতে ৭।৮ পাটি পর্য্যন্ত তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাজনেরা দুই পাটি তামাককে একছালা কহিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছালা ১৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে ইহার চাষের আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ৫০।৬০ টাকা লাভ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত এইচ, রেহলিং সাহেব রংপুর জিলায় তামাকের চাষ করিয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মেং রেহলিং তামাক চাষের বহুবিধ নূতন নূতন উপায়ও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, এদেশে অনুমান বৎসরে লক্ষ মণ তামাক উৎপন্ন হয়। সেরাজগঞ্জ, পাবনা, কালনা, এবং বাঙ্গলা দেশের নিম্ন প্রদেশের যাবতীয় বন্দর ও গঞ্জের মহাজনেরা তামাকের ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন।

ইউরোপ খণ্ডে সজল ভূমিতে উত্তমরূপ তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে এবং জাতি বিশেষে এই উদ্ভিদের আকার উচ্চ বা অনুচ্চ দৃষ্ট হয়। এমন কি কোন কোন দেশে ইহার গাছ দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা গিয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে দুই হস্তেরও অনধিক উচ্চ দৃষ্ট হয় না। ব্রিটনে যদি গভর্ণমেণ্টের অনুমতি থাকিত তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে সাধারণের তামাক উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কাহারও তামাক চাষ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া করিতে হয়।

প্রেসকট নামক সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত (টোবাকু এণ্ড ইটস্ এডল টারএনস) পুস্তকে পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে তামাক উৎপন্ন হয় এবং কি প্রকারে ব্যবহৃত হয়, তাহা নির্ণয় করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে তাহার তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ইউরোপ জর্ম্মনি, হলণ্ড, ইউরোপীয় তুরস্ক, সালোনিকা, ইটলি।

এসিয়া চীন, পূর্ব্বভারত সাগরীয় দ্বীপ শ্রেণী, ল্যাটাকিয়া, আসিয়াটিক তুরস্কস্থ কোন কোন স্থান, পারস্য, সিরাজ, সুমাত্রা দ্বীপে ম্যানিলা নামক স্থানে এবং ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে।

উত্তর আমেরিকা ভর্জ্জিনিয়ন, কেণ্টকি, মেরিল্যাণ্ড।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কিউবা, হেটি. পেটেরিকো।

দক্ষিণ আমেরিকা ভারিনস, ব্রেজিল, কলম্বিয়া এবং কিউমানা।

কিউবা, হাবিনা, কলম্বিয়া হইতে তামাকের পত্র আইসে। কলম্বিয়া, ভারিনস ও কিউমানার চুরোট অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কিউবা, হাবিনা; কলম্বিয়া, ভারিনস, কিউমানার তামাক পত্র সকল পীতবর্ণের আভাযুক্ত হইয়া থাকে। ভর্জ্জিনিয়ন, কেণ্টকি, ম্যারিল্যাণ্ডের তামাক পাইপে খাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

তুরস্কস্থ ল্যাটাকিয়াতে সিরিয়ান তামাক অতিশয় মিষ্ট এবং পাইপে সেবন কালে সদগন্ধযুক্ত বোধ হয়। হলণ্ডের তামাক অনুগ্র। কিন্তু কাল জাতীয় তামাক কড়া আর উহা ভিজা নস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ম্যানিলা তামাকে উৎকৃষ্ট চুরোট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন উহাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তামাক মিশ্রিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রিয় পাঠকগণ! আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ চুরোট খান, তাহা হইলে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমি ম্যানিলার চুরোট প্রস্তুত সম্বন্ধে একটি গূঢ় রহস্য আপনাদিগকে বলিতে বাধ্য হইলাম।

ম্যানিলার চুরোট, প্রায় সমস্তই তদ্দেশীয় মহিলাগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত। গৌরাঙ্গনাগণ গৃহকার্য্য সমাপনান্তে চুরোট প্রস্তুত করিতে রত হন। চুরোটের আবরক তামাক পত্রটি তাঁহারা আপন আপন মুখামৃত দ্বারা সিক্ত করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।

ডায়ন্থস্।

(DIANTHUS.)

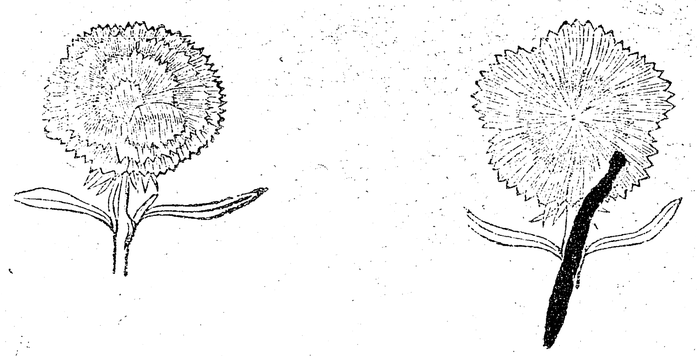

ডায়ন্থস্ এক প্রকার ঋতুপুষ্প; শীত ঋতুতে এই ফুল ফুটিয়া থাকে। যে সময় ডায়ন্থস্ ফুটিতে আরম্ভ হয়, তখন বাগানের অত্যন্ত শোভা হয়। এই ফুল টব ও ভূমি উভয় স্থানেই হইয়া থাকে। টব অপেক্ষা বাগানে একটু ব্যবস্থা করিয়া রোপণ করিলে একটী নূতন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে। ডায়ন্থস্ নানা জাতীয়; প্রত্যেক জাতীয় ফুলের এক একটী পৃথক পৃথক শোভা। কোন জাতীয় ফুল ঘোরলাল, কোন কোন জাতীয় তরল লাল, কোন কোন জাতীয় অল্প কাল আভাযুক্ত লাল, কোন কোন জাতীয় ফুলে নানা বর্ণের ছিটাযুক্ত। নানাবর্ণবিশিষ্ট ডায়ন্থস যে সময় কোন স্থানে ফুটিয়া থাকে, তখন বোধ হয় একখানি যেন গালিচা পাতা রহিয়াছে। কেহ কেহ বাগানের শোভা বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষেত্র মধ্যে যে স্থানে ডায়ন্থস রোপণ করেন, তথায় সমতল ভূমিতে উহা রোপণ না করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা ৯ ইঞ্চ গভীর করিয়া ডায়ন্থসের ক্ষেত প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এবং সেই গর্ত্তে উহার বীজ বপণ করিয়া গাছ প্রস্তুত করান। এরূপ ভাবে গাছ প্রস্তুত করিবার তাৎপর্য্য এই যে গাছ সমূহ উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়া মাথায় মাথায় সমান হয় এবং সেই সমান মাথায় নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিলে, অতীব চমৎকার বাহার

হইয়া থাকে। গালিচা বা কার্পেটের বিছানা পাতিয়া [illegible] হয়।

ডায়ন্থস যে নানা জাতি তাহা উপরিভাগে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের প্রথমে যে দুইটী ছবি আঁকা আছে, ঐ ছবি দুটী দুই জাতীয় ডায়ন্থসের। ডায়ন্থসের অনেক প্রকার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণগত ও আকারগত প্রভেদ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই ফুল বহু জাতি বিশিষ্ট। সিঙ্গেল অপেক্ষা ডবল ডায়ন্থস দেখিতে অতি মনোহর।

অন্যান্য ঋতুপুষ্পের ন্যায় ডায়ন্থসের গাছ প্রস্তুত করা তত কঠিন নহে। অল্প যত্নে ইহার গাছ প্রস্তুত করিয়া শোভা ভোগ করা যাইতে পারে। ডায়ন্থস কেবল মাত্র নয়ন তৃপ্তিকর, উহাতে কোন প্রকার গন্ধ নাই। বাগানে ফুল ফুটিতে আরম্ভ হইলে শীতের কয়েকমাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত শোভা হইতে থাকে। গ্রীষ্মারম্ভে রৌদ্র প্রখর হইলে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। অন্যান্য ঋতুপুষ্প রোপণ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, ইহার রোপণাদি বিষয়ে তাহা অপেক্ষা নূতন নিয়ম কিছুই নাই। তবে ইহাতে তত অধিক পরিমাণে যত্ন না করিলেও বিশেষ কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। বালির অংশযুক্ত মাটিতে ডায়ন্থস ভাল হইয়া থাকে। পাতা পচাই ইহার উপযুক্ত পুষ্টিসাধন পদার্থ। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে ক্ষেত অত্যন্ত পরিষ্কার করিয়া মাটি তৈয়ার করিতে হয়। মাটি যত ঝুরা হয়, ততই ভাল। ক্ষেতের মাটি কঠিন হইলে গাছের শিকড় ভাল করিয়া বিস্তারিত হইতে পারে না। কারণ ডায়ন্থসের শিকড় তত কঠিন নহে। এ সম্বন্ধে একটী কথা মনে করিয়া রাখা উচিৎ যে সকল গাছের শিকড় কোমল এবং মৃত্তিকার অধিক নিম্নে গমন করিতে পারে না, উপরে উপরে চারিদিকে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে হাল্কা মাটিই উত্তম। বীজ বপণের পর সর্ব্বদা মাটি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। মাটি অত্যন্ত শুষ্ক হইলে চারা বাহির হইতে গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। এজন্য জমির অবস্থা বুঝিয়া সর্ব্বদা জলের ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন জল দেওয়ার পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় সেইরূপ মধ্যে মধ্যে পাতলা ধারনিড়ানী দ্বারা ক্ষেত খুসিয়া দিলে এবং সর্ব্বদা জল সেচন করিলে

[illegible] বাড়িয়া উঠে। গাছ ভালরূপ তেজাল থাকিলে ফুলের চেহারা উত্তম হয় এবং অধিক দিন পর্য্যন্ত ফুল ফুটিতে পারে।

এদেশে সচরাচর আশ্বিন মাসের শেষ কার্ত্তিকের মধ্যে ডায়ন্থস রোপিত হইয়া থাকে। সকল বৎসর সমানরূপ ফুল হয় না। কারণ শীত ও শিশিরের ন্যূনাধিক্যে গাছের অবস্থা ভাল মন্দ হইয়া থাকে। যে বৎসর শীত ভালরূপ হয় না সে বৎসর গাছ বাড়িতে বিলম্ব হয়। উপযুক্ত পরিমাণে শিশির পাইলে গাছ বাড়িয়া উঠে। ডায়ন্থসের বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে যে সকল গাছ বেশ তেজাল সেই সকল গাছের বীজ তুলিয়া রাখিতে হয়। আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এদেশের বীজে যে সকল ডায়ন্থস হইয়া থাকে, তাহার আকার বিদেশীয় বীজজাত ডায়ন্থের তুল্য। তবে প্রভেদের মধ্যে এই দেখিতে পাওয়া যায় দেশীয় বীজে অধিক দিন গাছ প্রস্তুত করিলে ক্রমে ক্রমে ফুলের আকারগত অনেকটা শোভা হ্রাস হইয়া আইসে। এজন্য দেশীয় বীজে যখন দেখিবে গাছের ফুল মন্দ হইয়া আসিতেছে, তখন উহা আর বপন না করিয়া বিদেশীয় বীজ দ্বারা গাছ প্রস্তুত করা ভাল। এবং সেই গাছের বীজ ধরিয়া আবার দুই এক বৎসর চারা করিলে চলিতে পারে। শীত কালে বাগান সাজাইতে ডায়ন্থস রোপণ করা উচিৎ। পূর্ব্বে সাহেবেরা এদেশে এই ফুল আনাইয়া রোপণ করিতেন। এক্ষণে ডায়ন্থস অনেকেই রোপণ করিয়া থাকেন। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রতি বৎসর বীজ আনীত হইয়া থাকে। ইহার বীজের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র। অন্যান্য ঋতুপুষ্পের বীজ যে নিয়মে শিশিমধ্যে যত্ন করিয়া রাখিতে হয়, ডায়ন্থসের বীজ রাখিবারও সেইরূপ নিয়ম।

শীতকালের গাছ বর্ষা পর্য্যন্ত রাখিয়া সেই সময় ফুল ফুটাইতে হইলে, টবের গাছে সর্ব্বদা জল দিয়া উহা সজীব রাখিতে হয়। গাছ সজীব থাকিলে বর্ষাকালে তাহা আবার নূতন আকার ধারণ করিয়া ফুল ফুটিতে থাকে। শীতকাল হইলে সর্ব্বদা জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে শীত অন্তে গাছ শুকাইতে আরম্ভ হয় কিন্তু জল সংযোগে তাহার মূল সজীব থাকে। বর্ষা উপস্থিত হইলে ঐ গাছের গোড়ার কতক অংশ রাখিয়া কাটিয়া দিতে

হয়। এবং টবের মাটি খুসিয়া তাহাতে পাতা পচা সার দিয়া তেজ বৃদ্ধি রাখিতে হয়। টবে সার ও জল দেওয়া হইলে গাছের মূল হইতে আবার নূতন অঙ্কুর নির্গত হয়। ইচ্ছা করিলে সেই অঙ্কুর তুলিয়া অন্য টবে রোপণ করিয়া গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। গাছের এই সকল নূতন অঙ্কুর হইতে প্রচুর ফুল ফুটিয়া থাকে। ডায়ন্থস যে প্রকার সহজে রোপণাদি করিয়া ফুলের শোভা ভোগ করিতে পারা যায়, ইচ্ছা করিলে সকলেই তাহা ভোগ করিতে পারেন। উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিদিগের পক্ষে ডায়ন্থস একটী উৎকৃষ্ট বাগান সাজাইবার ফুল। ডায়ন্থসের যেরূপ মনোহর শোভা এবং পৃথক পৃথক বর্ণ তাহা দর্শন করিলে সকলেরই ইচ্ছা হয়, উহা রোপন করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। ডায়ন্থস শীত প্রধান দেশের ফুল, সুতরাং শীতকালে যেরূপ ফুল হইয়া থাকে, বর্ষাকালের ফুল ততদূর সুন্দর হয় না।